"পৃথিবীতে শাদা থাকবে না"—এই তাদের স্বর্গ। গাঁজায় গাঁজায় মশগুল জগতটি এই একটি স্বপ্ন দেখে।

তেমন স্বপ্ন দেখেনি প্রাচীন জাত আরাওয়াকেরা। আদিবাসী। ওরা থাকতো ব্লু মাউণ্টেনে। থাকতো দায়াবোলো পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে মধু-ছন্দা গাঁয়ে বাসা বেঁধে। বাসা, পাখির বাসা, ভালোবাসা,—বাড়ি নয়, সেই বাসা বেঁধে। ওদের প্রতিপক্ষ, আদিবাসীই; কারীব। যুদ্ধ হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। এখন তারা নিশ্চিহ্ন হয়েও রক্তে চিহ্ন রেখে গেছে।

হঠাৎ গেলে ওরা পালিয়ে যেতো; মিথুনে মিথুনে, জড়াজড়ি করে, হারিয়ে যেতো হরিতের গভীরে, লিয়ানার দোলমঞ্চে, পাখির ডাকের আশ্বাসে, মাক্কাও পাখার প্রবাল-চুনী মরকত বৈদুর্য ঘষা বর্ণের বিভ্রমে, জলপ্রপাতের জামায়কাকে আমি পরতে পরতে দেখতে পেয়েছি। ১৯৭২-এ প্রথম যখন সবার বাধা অগ্রাহ্য করে 'ডাঙ্গল্'-এ যাই সব চেয়ে অবাক হয়ে ছিলো দাদলানীর বোন প্রতিমা। ও আমায় স্পর্শ করে বলেছিলো, ছুঁয়ে দেখছি সত্যিই বেঁচে ফিরেছেন কি না।

কিন্তু আমায় যেতে হবে সেই 'লাল'-নদী, 'কালো'-নদী দিয়ে পাহাড়ের ওপর তলায়, যেখানে ছিলো আরাওয়াকেরা পালিয়ে মাথা গুঁজে অনেক দিন, যাবৎ তারা নিশ্চিহ্ন না হয়ে গিয়েছিলো। গায়ানায় ভেনেজুয়েলায় গভীর বনে ওয়াই-ওয়াই, পাতাসেনা, আরুউ প্রভৃতি আরাওয়াক জাতিদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো। হোক আজ জ্যামায়কা শ্মশান। এ নামটাই তো আরাওয়াক নাম। এই নামেই বেঁচে আছে ইতিহাস। Xaymaca—নির্ঝরের দেশ। যাবো ঐ জঙ্গল তল্লাটে যেখানে সে গাঁয়ের স্মৃতি মাটিতে, জলে, আকাশে, বনানীতে আজও গুঞ্জরিত।

নিয়ে গিয়েছিলো আশ্চর্য সেই সিন্ধুললনা প্রতিমা। মনে করিয়ে দেয় সিন্ধু সৌবিরের রাজেন্দ্রানী দুঃশলাকে, অনিরুদ্ধের প্রিয়া উষাকে।

আরাওয়াকদের শান্ত স্বপ্ন ডাঙ্গেলের রাসতাফারিদের মতো পিঙ্গল, কর্কশ, ধূম্র, রুদ্র নয়। প্রাচীন এ জাত ছিলো নিছক নিসর্গের সন্তান। আদিবাসী। ওরা থাকতো ব্লু-মাউণ্টেনের ভাঁজে ভাঁজে ঝর্ণার ধার ঘেঁষে মানুষের চোখের আড়ালে।—খানিকটা গেলাম মোটরে, খানিক ওদের ভেলায়, শেষের দিকটা ঘোড়ায়। প্রতিমা খুবই তৎপর। সঙ্গে দুটি পরিচারক, নিগ্রো। আমাদের খাদ্য আসবাব ইত্যাদি তারা ঘোড়ায় বহন করিয়ে আনছে। কিন্তু আমরা মোটামুটি নিরবচ্ছিন্ন আলাদা হয়েই সেই অপূর্ব শ্যামলী ধরণীর মধুক্ষরা অমৃত পান করতে করতে এসে পড়ি এ উপত্যকায়, ও উপত্যকায়। বড়ো জোর দু বিঘা তিন বিঘার চৌরস জমি। তারই ওপর আঁকাজোখা চিহ্ন। এই ছিল গাঁ।

কিছু নেই। আছে দীর্ঘ মেহগনী, সীডার। আছে পার্বত্য নির্ঝরের কলতান। আছে সতত সঞ্চারি বাতাসের গুঞ্জন অরণ্যের অর্কেস্ট্রার সুরে সুর মিলিয়ে।

সেই কবেকার প্রাচীন মানবায়নের দিনে, বিবর্তনের ফেরে একমুঠো মানুষ ভেলায়

বলেছেন ইতিবৃত্ত কথা মিথ্যাময়ী। কিন্তু সাম্ এবং তার মতো স্বাধীনচেতা পুরুষ জীবন্ত সত্যনারায়ণ। মনে রাখি সাম্‌কে।

প্রতিমা আমাকে পাকড়াও করেছে।

ভারি রাগ ওর আমি ফ্রেঞ্চম্যান কোভ থেকে পালিয়ে এলাম। অথচ মারুন পাহাড়ে কাটিয়ে দিলাম চার দিন।

কিন্তু কী করে প্রতিমাকে বোঝাই ফ্রেঞ্চম্যান কোভের প্লাস্টিক ফুল আমার ভালো লাগে না। কী ভালোই লাগে কিন্তু সাম্ কেলশলের আতিথেয়তায় ফোটা এক থোলো আকাশ-ফুল।

রোম্যাণ্টিক আমি। বাঙালি। কিস্‌সু হবে না আমার! আমি একথা যতো জানি তা না জানে বিড়লা-দালমিয়া, না জানে ডাকের সাজে ছাওয়া প্রতিমারা। সাকসেস্-ফুল ফুটলো না এ মালঞ্চে।

প্রতিমাকে ভালো লাগে।

এতো প্রতিভাধর বোকাকে ভালো না লেগে যায় না। ডানকান হপকিন্সকে পাকড়াও করতে যে ওর দু-কানই কাটা গেছে, এ কথাটা বুঝতে ও নারাজ। রেশমী বিছানায় শুয়ে পমিরেনিয়ান কিম্বা পুড়ল কুকুরের গায়ে আদর বোলানোটাই যারা ঠাট বলে জানলো তাদের গায়ে ডানকানের আদর ভালো তো লাগবেই।

ডানকান কবিতার ধার ধারে না। প্রতিমা ধারে। কার্ডিফ হলে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ কবিতার কথা উঠলো। জ্যামায়কা ক্রমওয়েলেরও আগেকার ইংরেজ উপনিবেশ। এখানে ইংরিজী ঐতিহ্য প্রচুর। টুরিস্টরা এসে ইতিহাস-বিশ্রুত যে সব 'হল', 'কাসল' দেখতে চায় তাদের শখ মেটাবার জন্যে দু-চারটে পুরনো ইমারত এখানেও আছে। কার্ডিফ হল তারই একটা। ইংরেজ রাজা চার্লসের শিরশ্ছেদ অনুজ্ঞায় বহু স্বাক্ষরের একটি স্বাক্ষর ব্লাগ্রোভ্। কার্ডিফ হল ব্লাগ্রোভ্‌দের বাসভবন। ওমনি আরও একটি,—ফণ্টহিল্। কে এক বেক্‌ফোর্ডের বাড়ি। বেকফোর্ড? তবে কি 'ভাতেক্'…এর… অপখ্যাত রচয়িতার কেউ? প্রচণ্ড ঐশ্বর্যের অধিকার পাবার পর স্যর উইলিয়াম চেম্বার্সের কাছে স্থাপত্য শিখেছে বেক্‌ফোর্ড, মোজার্ট-এর কাছে সঙ্গীত! কিন্তু লেডী গর্ডন মারা যাবার পর থেকে একাকী হয়ে যায়। 'ফণ্টহিল এব্যে' বেচে দিয়ে নতুন বাড়ি গড়েন সাত হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে। সেই 'ফণ্টহিল' নাম! এ সম্পত্তি তিনি দিয়ে যান পীটার বেক্‌ফোর্ডকে। ভোলত্যের, স্টার্ণ, রুশোর বন্ধু উইলিয়াম বেক্‌ফোর্ড, 'ভাতেক' যাঁর অপূর্ব কীর্তি। জ্যামায়কায় তাকে মনে পড়ে।

তেমনি আর এক বাড়ি 'রোজহল্'। রোজহলের কাঁটা নাম "মিসেস পামার!"

কিন্তু জ্যামায়কার ইতিহাসে, জ্যামায়কার গাল-গল্পে মিসেস পামারের কুকীর্তি, বন্যতা, নৃশংসতা আজও অক্ষয় কুৎসার খোরাক হয়ে আছে। তাঁকে চরিত্র করে উপন্যাস লেখাও হয়েছে।

থাকে ; এদের দেশে এতো মিষ্টি আলু, রাম ! এ খেলে এদের শান যায়। ত্রিনিদাদীয়রা যদি ত্রিনিদাদের ধারা, কৃষ্টি, কায়দা চালায়, শান যায়।

জর্জটাউনে থাকতে বন্ধু এডগারের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'ফেন্না, তোমার চোখ বেঁধে যদি এসেক্স্ বা ম্যাঞ্চেস্টারের কোনো ইংরেজ-বাড়িতে ছেড়ে দিই, বাঁধন খুলে গায়ানার এই সাংসারিক সজ্জা এবং সেই সজ্জায় কী পার্থক্য পাবে বলো তো ?"

ফেন্না নিগ্রো বুদ্ধিমতী সুদর্শনা বান্ধবী। বললে, 'তফাত ? বাইরেটাকে মিলিয়ে রেখে রেখে আমরা ভেতরটার মিল খুইয়েছি দাদা !—আমরা মূর্তিমান অনুকরণ !'

তবু পথের ধারে গীটারে বাজে মহম্মদ রফীর 'মন তড়পত হরি দরশনকো আজ', হেমন্তকুমারের, 'জিন্দগী কে দেনেওয়ালে'।...নিগ্রো গাইয়ে খঞ্জনী, ঢোলকসহ চৌতাল গাইছে, রামায়ণ সংকীর্তন করছে মন্দিরে, এও দেখেছি।

আবার কোলীন ডুব মেরেছে। আমি অসাধ্য সাধন করেছি, ব্রীটন হলে যাইনি ওর খোঁজে। টেলিফোন না করে পারিনি। পাইনি।

এর মধ্যে বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ পাণ্ডে এসেছে গাড়ি নিয়ে, চলুন ত্রিনিদাদ দেখাই।

উত্তর ত্রিনিদাদ যেন কলকাতা। কেবল বন্দর, ব্যবসায়, শহর এবং হাঁকডাক। হাইকোর্ট, লোকসভা, রাষ্ট্রীয় অনুশাসন গৃহ, দূতাবাস, টি-ভি এবং রেডিওর কেন্দ্র। বন্দরও এটিই।

উত্তর ত্রিনিদাদ যেন বর্ধমান, ধানবাদ, জামসেদপুর, রাউরকেল্লা। যাবতীয় সম্পদ, শিল্প, সমৃদ্ধি, উৎপাদন, চাল-আখ-কোকো-লেবু-পেট্রল-পীচ-পাথর-বন সবই দক্ষিণে। চলেছি ত্রিনিদাদের দক্ষিণে। চিনির কল, অয়েল রিফাইনারি। ব্যারাকপুর, ফৈজাবাদ, লা-ব্রে অঞ্চলে তেলের খনি। সমুদ্রেও তেলের পাম্প বসানো। ত্রিনিদাদের সম্পদ দক্ষিণে। দক্ষিণে শহর সান্-ফার্ণাণ্ডো। একটা পাহাড়কে কেন্দ্র করে শহর। পাহাড়টা কাঁকরের। তাই এই পাহাড় কেটে ত্রিনিদাদের পথঘাট রচনা। সাধারণ লোক পাহাড়টা কাটা হচ্ছে বলে ম্রিয়মান। শেষ হয়ে যাবে সান্-ফার্ণাণ্ডোর সৌন্দর্য। কিন্তু ঠিকেদারেরা দীর্ঘমেয়াদী ঠিকে নিয়েছে। সরকার নিরুপায়। লা-ব্রেতে পীচের 'হ্রদ'। আসলে খেলার মাঠের মতো খটখটে মাঠ। চাঙ্গড় চাঙ্গড় পীচ, শক্ত পীচ কেটে ট্রলি করে ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে। গলিয়ে পিপেবন্দী হয়ে জাহাজে চড়ছে। কোম্পানী আম্রিকী। যেখানে যেখানে চাঙ্গড় কাটছে, দু এক দিনে আবার আপনি থেকে তা ভরে যাচ্ছে। এমনি চলেছে চারশো বছরের ওপর। চারশো বছরে জমিটা নেমেছে দশ কি বারো ফুট।

আরও উত্তরে পয়েণ্ট ফণ্টেন্। তেলের রাজত্ব। রিফাইনারি আছে।

.একটা জায়গায় দেখলাম মস্ত মাচান বেঁধে বৃহৎ জনসভা। হিন্দী বক্তৃতা। ভাগবত পাঠ হচ্ছে। পাণ্ডে তখন দক্ষিণ ত্রিনিদাদের ভারতীয় জীবন-ছন্দ বোঝালেন। সাত দিন ছয় রাত এই পাঠ সকাল থেকে রাত দশটা অবধি চলবে। লাঞ্চে, ডিনারে দুবার এক এক ঘণ্টা বন্ধ। সাতদিন পরে বৃহৎ ভোজ। রবিবারে সমাধা। ত্রিনিদাদের হিন্দু মন্দির মাত্রেই রবিবার প্রাতে খোলা হয় (যদি খোলা আদৌ হয়)। বিয়ে-পৈতে

ইত্যাদি সবই হিন্দু বা মুসলমানিক ক্রিয়াও ঐ রবিবারে এবং দিনে। রাতের বিয়েতে মদ্যপান এবং মারামারি নাকি এতো হতো যে পণ্ডিতেরা রাতের বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। পুরুতমশায়রা লাইসেন্স নেন। রেজিস্ট্রেশন না হলে বিয়ে পাকা হয় না তাই তাঁরাই রেজিস্টারের কাজও করেন। মৃতকে বাক্সে ভরে ২।১ দিন রাখা হয়। রেডিওতে প্রতি রাতে শেষ, প্রতিদিনে প্রথম ঘোষণা মৃতদের। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন এসে মৃতের সমাধিতে যোগদান করেন। আজকাল হিন্দুরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাহ করেন। তবে তার নানা হাঙ্গামা। মৃত যে কয় রাত বাক্সবন্দী থাকে 'ওয়েক' চলে। জেগে থেকে লোকে 'তুলসীদাসী রামায়ণ' পাঠ শোনে। মদও চলে; তাসও চলে। কিন্তু ভগবানের নাম তা বলে বন্ধ হয় না।

তখন জানিনি এই দক্ষিণে, সান-ফার্ণাণ্ডোতে আমায় কুড়ি বছর থাকতে হবে। এদিকে যত্রতত্র ভারতীয় গ্রাম, ভারতীয় সমৃদ্ধি, ভারতীয় আতিথেয়তা। যত্রতত্র হিন্দু-ভবনে 'ঝাণ্ডী'; মস্লেম ভবনের রং সবুজ। লা-ব্রে তেল-পাড়া। প্রায় সবই নিগ্রো। গ্রামগুলো কৃষিপ্রধান, প্রায় সবই ভারতীয়। ভালো ভালো সমুদ্রসৈকত—মায়ারো, গয়াগয়ারী। মাছের আড্ডা।

সবাই খাটছে, তবু কেমন ঢিলেঢালা। এ দ্বীপের বাতাসে আমেজ; গায়ের ঘামে বাতাস দিয়ে ঘুম এনে দেয়। হঠাৎ তরমুজের ক্ষেত দিয়ে গাড়ি চলেছে, পাহাড়ের দিকে। শহরের নাম রায়া ক্লারো, কফি কোকোর আড়ৎ। কফি ফুলের গন্ধ এবং কোকো ফলের বর্ণ, ছায়ানিবিড় পথ, পলাশ-রাঙা ইম্মোরতেল ফুলের বিশাল বিশাল গাছের তলায় কফি বন, কোকো বন। বলে, কফি-মামা ঃ অর্থাৎ এই দীর্ঘ পুষ্পবতী মায়ের ছত্রছায়ায় ছাড়া কফি কোকো হবেই না।

পাহাড়ী পথ এসে গেলো। মোটরের শব্দ কানে ঝিম ধরায়। বুঝছি বন ঘনতর হচ্ছে। উপরে উঠছি। চমৎকার এক নিস্তব্ধ অরণ্য। বিশাল একটা গ্রানাইটের চাঁই। গায়ে ফলক। ফলকে উৎকীর্ণ সৃষ্টির আদিম কীর্তি এই প্রস্তর স্তূপ। বয়স, তেত্রিশ লক্ষ বৎসর। লেখা "আশেপাশে যা দেখছো ভূমিকম্পে, আগ্নেয় বিপ্লবের উৎক্ষিপ্ত মত্ততায় সমুদ্রবক্ষ ভেদ করে এসেছে আদি জননীভূমি। মনে মনে বরাহকল্পের শ্বেত বরাহকে স্মরণ করি; স্মরণ করি মঙ্গলগ্রহের বিসৃষ্টি; মনে করি ধরণীকে সমুদ্র থেকে সবলে দাঁত দিয়ে খনন করে তুলেছিলো এক বিষ্ণুক্রান্ত বরাহ-বিপ্লব। হাত বোলাই পাথরখানায়। গাছগুলোর তলায় বসি। কুল কুল করে নির্ঝর বয়ে যাচ্ছে কোথাও। চার পাঁচটা ফেজাণ্ট বিরক্ত হয়ে আলো-ছায়ায় উড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! 'কাঁও' করে যে ডেকে উঠলো সে একটা মাক্কাও। পাঁড়ে আমায় স্পর্শ করলো। চেয়ে দেখি গাঢ় সবুজ বর্ণ একটা বিরাট ইগুয়ানা সীডারের উঁচু ডালে আটকা পড়েছে। তার পথ আগলে ঝুলে আছে এক শ্লথ্ তার দীর্ঘ নখর বিস্তার করে। শ্লথ নড়বে না; কিন্তু ইগুয়ানার লক্ষ্য তাকে খাবে। ব্যাপার দেখে গোটা কয় স্পাইডার মাঙ্কি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে এ-ডাল থেকে ও-ডাল পাক খাচ্ছে আর খাচ্ছে।

পাণ্ডে আমায় যে পথ দিয়ে অতঃপর নিয়ে এলো সে পথে আমি বিশ বছরে শতাধিক-

ক্যারিবিয়ানের সূর্য

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

CARIBEANER SURYA

by

BRAJAMADHAB BHATTACHARYA

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

চতুর্থ সংস্করণঃ ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ঃ
গৌতম বসু

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

আদরের রেণুকণাকে

লেখকের অন্যান্য বই

কলহনের দেশে
ভাস্বর দিগন্ত
ক্যারিবিয়ানের সূর্য ১ম পর্ব
রূপে রূপান্তরে
মগ্নমায়া
কান্তার কান্তি
স্বর্ণ ভ্রমর
বরফের রং লাল
সাইপ্রাস সূর্য ম্যাকারিয়স
ত্রিভুবনের বাইরে
তিন সাগর
কিন্নর পাহাড়ী
চরের মিথুন
বন্দী যৌবনের দিন
গঙ্গা যমুনার মেয়ে
বলিভারের প্রণয়িনী
শঙ্খদ্বীপের নাও
সূর্যস্নাত মেক্সিকো
পেরুর সূর্য লাল

বেনামী অন্তরীপ
শতরূপা
Alien Corn
Shaivism and the Phallic World
Practical Vedanta (Translation)
Guru Annyas (Translation)

সূচী

জ্যামায়কা	...	১
ত্রিনিদাদ	...	৩৯
গায়ানা	...	৯০
হেইতী	...	১৩৪
সেণ্ট দোমিনিকান রিপাব্লিক	...	২০১
ক্যুরাসাও	...	২১৪

জ্যামায়কা

যাওয়াই হোতো না জ্যামায়কা। বিতৃষ্ণাই ছিলো। সেকালে-একালে মিলিয়ে বদনামী জায়গা ওই জ্যামায়কা।

মাঝে মাঝে হঠাৎ মনের মধ্যে ধাঁধা এসে হাজির হয়। তা-বড়ো তা-বড়ো ধুরন্ধর হুজ্জতী এবং পেল্লায় পেল্লায় বেলেল্লা-হুল্লোড় বাবদ জেল্লাদার নামের মধ্যে পুব দিকের নাম বড়ো পাই না কেন?

সাখালীন থেকে সোরিবায়া, কান্টন্ থেকে কুয়ালালামপুর, এমন কি তোকিও থেকে তুনিশিয়া কাবুল থেকে ক্যাসাব্লাঙ্কাতেও এমন নাম পাই না যা হুরীপ্রিয় জহুরীদের, মদপ্রিয় দুর্মদদের, জুয়াড়ি, খেলাড়ি, নেশাড়িদের এমনতর শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবন।

কথাটা আমাকে প্রায়ই ভাবায়। আজকাল ডাঙ্গর ডাঙ্গর হাঙ্গর-পাড়া পুবে পশ্চিমে পাওয়া যায়, বিশেষ করে গত বিশ্বযুদ্ধের পর ডলার-বিশ্বের প্রপঞ্চে লাস্-ভেগাস্, শিকাগো, আলজিয়ার্স, মোনাকো, ক্যাসাব্লাঙ্কা, ম্যাকাও প্রভৃতি বহুতর নবজাতক ডামর-তন্ত্রাভিষিক্ত শহর পঁচিশ মকারের মালা গেঁথে ধেই ধেই করছে। কিন্তু তা বলে এই যোগ-যাগে সিদ্ধাই মারতে কেউ তো বোম্বাই, কলকাতা, রেঙ্গুন, কলম্বো করে না? মাকাও, হংকং, স্যাংঘাই, সিঙ্গাপুরের নাম করতে যদি বা রাজী, কিন্তু আপত্তি ইতিহাস। ওঁরা সব চন্দ্রিকা-মাধুরীর মতো জাল জোলুষে মাতব্বর। ওঁদের খুবসুরতী এবং খোশবয় অন্যাগ্রহের ধেরো মাল। গোলার্ধ পুর্ব, কিন্তু জ্যোতিঃসম্পাত পশ্চিমের, যেখানে পুবে পশ্চিমে গোল হয়ে যায়!

সেই যবে থেকে ব্যাবিলন, সোডম্ গোমোরা, ক্রীট, কায়রো কনস্তান্তিনোপল্, রোম পেলাম—সেই থেকে অদ্যাবধি কতো কতো বাবেল-স্তম্ভ রচিত হলো, ধূলিসাৎ হলো,—কতো মরদসে মরদ, দরদ-দার মুশা, জন্, ঈশা, এলেন গেলেন;—কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় সুনীল-নির্মল-নীল-নম্র নয়নিকরা,—কনককেশ কলাপীরা নিরবচ্ছিন্ন মেয়ে-বাজার, চাঁদীর-হাট, জুয়া বৃন্দাবন রচনা করেছেন ফলে সাধনায় প্রাচীন। হুরী-হারেমকীর্তিত ওরিএণ্টালও হয়ে গেছে বৈষ্ণব-গোঁসাইদের মতো প্রিমিটিভ। ওখানকার খাস্তা-খেউড়ে ওমরখৈয়াম, গুলেবকাবলী, আলফ্ লায়লা থেকে, গীতগোবিন্দ এবং বাৎস্যায়ন সবই হয়ে পড়েছে X মার্কা ছবির দরবারে U মার্কা। মনে করতে হবে মেরী চ্যাটার্লি থেকে আলবার্তো মোরাভিয়া, ডারেল এবং ভ্লাডিমীর নাবোকফ্ পর্যন্ত নিম্নকাঞ্চিক, উত্তর-নাভিক, বিপাকগুলোও আমরা মাত্র নন্দন শাস্ত্রের বদৌলৎই পরিপাক করেছি।

এ জাতীয় চিন্তা বাবদে রক্ষণশীলতার বদনাম হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং সাবধান করার আশায় বলে রাখি এ প্রপঞ্চে আমার ফুর্তি বই আপত্তি নেই। পুরোপুরি একভুক্ত

শিবভূজ ছাড়া ত্রিভূজ ভোট দিতেও এগিয়ে থাকতে এ বয়সেও রাজী। কিন্তু আমার প্রশ্নটা রয়েই গেলো—এ সব অদ্ভূত সব সামাজিক ক্রমোন্নতি কালাপানী-রাঙ্গাপানীর (Black-sea, Red-sea) এ-পারে হলো না কেন? পশ্চিম-পাড়াটাকেই আমরা কামরূপ না বলে ভুল করছি কেন? সে পাড়ায় অম্বুবাচী নিবৃত্তির ধার কেউ ধারে না। ফলে কামরূপের রূপ যে বোদা-শিবত হয়ে গেলো। সুতরাং নিরন্তর দেহ-সাধনার মহাপীঠ বলতে পশ্চিমের এতো বাড়বাড়ন্ত কেন?

বিপদ একা আসে না। আজকাল স্ফিঙ্ক্‌স্‌ও কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে। স্রেফ পাথর হয়ে গেছে। বোধ করি তা স্মারং স্মারং স্বগৃহ চরিতং-এর ফল। নৈলে কি এ প্রশ্ন খোঁচা দেয়?

ভারি দোষ; অন্য কথায় এসে পড়ি।

জ্যামাযকার প্রতি এ বিতৃষ্ণার অন্য কারণ স্ত্রী তো সঙ্গে ছিলেনই; পুত্র কন্যাও। এছাড়াও সে বিতৃষ্ণার অবচেতনিক ইতিহাস আছে।

জ্যামায়কার সঙ্গে প্রথম পরিচয় বোধকরি সেই ১৯২৩-এ।

কাঁচিরাম মদীয় ভাগ্নে। জাঁদরেল ব্যবসায়ী জামাইবাবুর কারবার যতো বিলিতি কোম্পানীর সঙ্গে। ফলে কাঁচিরাম বিদ্যা সংগ্রহের ঢের আগে ডাকটিকিট সংগ্রহে লেগে যায়।...ও বস্তুটা তখন আমরা সিগারেট খাওয়ার বদলি একটা নেশা বলে মনে করতাম। কেমন বয়স্ক-বয়স্ক বোধ করতাম। অনজান দেশগুলোর নাম জান বার করেও বলতাম যেন মাসী-বাড়ির পিঁড়ের ওপর বসার সরলতার সঙ্গে। "ও কিছু নয় সাপ।"—বলার সুরে শোনাতাম হোয়াইট র‍্যাশা, ইউক্রেন, পের্তোরীকো।

তার সংগ্রহের এক তালেবর নিশান ছিলো সবুজ একখানা বড় স্ট্যাম্প। জ্যামায়কা! ছবিখানায় কী ছিলো? বেড়ার আড়ালে বিশাল জনতা; বেড়ার এ পারে গোটাকয় ঘোড়সওয়ার দৌড়ুচ্ছে।

আমি কাঁচিরামকে শুধাই,—ঘোড়া কেন রে?...কী সুন্দর সবুজ স্ট্যাম্প।

কাঁচিরাম,—বিজ্ঞ-মুদ্রায়,—জ্যামায়কা যে!

—'তার মানে?' (ওঃ! কী বোকা ছিলুম,—থুড়ি, রয়েই গেলুম)

—'রংটা দেখেও বুঝলি না?' (থেমে যায় কাঁচিরাম!)

কাঁচিরাম (ঘেন্না ধরালি—রাই!—সুরে)—সবুজ রং দেখেই তো বুঝছিস ফার্টাইল দেশ (কাঁচিরাম পরতো ব্রীচেস,—চেস্টার ফীল্ড কোট, প্লাস ফোর্স—প্রভৃতি এংলো-স্যাক্সন ব্যাপার; তদীয় বিলাত ফেরত খুল্লতাতদের তা'তে পোড়ে? এবং ইংরেজী বলে বলে বাংলা ভাষাটাকেও অনুরূপভাবে অপরূপ সম-মার্জিত করে ছেড়েছিলো); কাজেই প্রচুর ঘাস; যেমন আমাদের বেনিয়া-বাগ;—রেডউড়ী তালাও, লাক্সা, বড়োগেভী। সুতরাং ঘাস যেখানে ঘোড়াও সেখানে। জ্যামায়কাই হলো ঘোড়ার নেটিভ সয়েল।

কাঁচিরামকে মনে হতো যেন শব্দকল্পদ্রুমের ওপর ছাপা মহারাজা বর্ধমানের মহতাব-

বাহাদুরী ছবির ছেলেবেলা। তবু দুর্বুদ্ধি! বিবাট টিকি আন্দোলিত করে বলি, তবু বলি, তবে বলে তুর্কের ঘোড়া, আরবের টাট্টু!

কচিরাম বললো,—তুর্ক, মানে টার্কি, আরব মানে সৌদী আরাবিয়া; মেসোপটেমিয়া, যেখানে ফুলকাকা ছিলেন,—আর জ্যামায়কা কি আলাদা জায়গা ভাবিস?

পুনশ্চ গোঁত্তা খেলুম। পেটে অতিসিদ্ধ কাঁচকলা এবং আতপ তণ্ডুলের আসন টলেছে। "তবে আলাদা স্ট্যাম্পো কেন?"

আমার হাত থেকে বাঁধানো এ্যালব্যাম কেড়ে নিয়ে কচিবাম বললো,—"আলাদা স্ট্যাম্পো বলেই আলাদা দেশ? ভারতবর্ষে তো নেপাল, গোয়ালিয়র, বার্মা, আফগানিস্তানের টিকিট সব আলাদা! তাই বলে এগুলো ভারতবর্ষ নয়? এই তোমার স্বদেশ ভালোবাসা? ক্ষুদিরামের গান আর তোমাকে গাইতে হবে না!"

সেই জ্যামায়কার ওপরে আমার প্রথম বিরক্তি!

তারপর বিরক্তি হলো জেন-আয়ার পড়ার ফলে। বেচারি জেনের এবং রচে স্টারের দুর্দশাব কারণ হিসেবে জ্যামায়কার ওপরে আমার ভারী রাগ। (অবচেতনে বোধকরি কচিরামের 'জ্যামায়কা'-ও চাগানী মারছিলো।)...এ ছাড়াও যতোবারই রেস্টোরেশন সমাজ থেকে ভিক্টোরিয়ন সমাজেব চিত্রে নৈতিক এবং চারিত্রিক শয়তানদের ভূমিকা দেখেছি, প্রত্যেকবারই তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান পটাবকাশে। বিশেষ করে জ্যামায়কায়।

তৃতীয় দফা যখন পড়লাম প্রাচীন লেখায় জ্যামায়কা সম্বন্ধে উদ্ধৃতি—"Babylon of the West...A gilded Hades where mammon held sway...The wickedest city in Christendom...' এখানকার বিশিষ্ট সুরার নাম ছিলো Golden Green,—a hot, hellish and terrible liquor..." পোর্ট রয়্যাল ছিলো এই জ্যামায়কার প্রধানা নগরী। (এখন কিংস্টন)। ফলে জ্যামায়কা সম্বন্ধে অবচেতনে আমি ছিলাম অনাসক্ত।

...অথচ শান্ত নির্বিবাদী আরাওয়াকরা এই স্বর্গ-বিচিত্র পান্না-দ্বীপটির নামই দিয়েছিলো,—Xamayaca, কি-না ঝর্ণাঝরা-বনছাওয়া দেশ! এন্দ্রেস্ বার্নাল্দেজ্, কলম্বাসের পণ্ডিত সহযাত্রী লিখে গেছেন, the fairest isle that eyes have seen!

তাই হয়। যখন ওরা ঢোকে তখন 'fairest isle' এবং fairest Ind' বলেই ঢোকে। কিন্তু ওরা যখন যায় তখন 'গজভুক্ত কপিত্থবৎ' খোখ্লা করে দিয়ে যায়। তবু অস্মদ্দেশীয় চৌধুরী মশায়রা হাঁকড়ান,—ওঃ! শ্বেতী-য়্যাড্মিন্স্ট্রেশন! তার চেয়ে এফিশ্যেন্ট্ ফাদার গড্-এর মিনস্ট্রেশন-ও নয়!

রাজ্ঞী ইসাবেলা সেভিল্লের দরবারে যখন শুধিয়েছিলেন কলম্বাসকে, দেশটা কেমন? —কলম্বাস একখানা কাগজ হাতে মুড়ে টেবিলে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, "এই এমন!"

তাই বটে। পরতে পরতে পাহাড়; পরতে পরতে উপত্যকা; সে সব মোম-মাটি উপত্যকার মাঝ দিয়ে তরতর করে বয়ে যায় কুল-কুলে নদী। পাহাড়ের গা বওয়া মাটির

ঢলে ফুল আর প্রজাপতি ; পাহাড়ের ওপর দিকে গভীর সবুজ জঙ্গলে দেবদারু, মেহগনী শিশু, পাইন, প্রুস, বরাস, সীডার। শিখরগুলো ৩০০০ থেকে ৬০১০ ফুট খাড়া। ব্লু-মাউণ্টেন ৭৪০২ ফুট। নীচে সমুদ্রের ধারে, উপত্যকার কোলে বসন্ত ছোঁয়া জীবন ; একটু উঁচুতে উত্তরায়ণের আমেজ লাগা ঠাণ্ডা ; তার ওপরে সাহেবী বাড়ির ভেতর আগুন জেবলে বসে মানুষে স্কটল্যাণ্ডের বসন্তের আমোদ কুড়ুচ্ছে। আরও—আরও ওপরে কেউ যায় না ; সেখানে কন-কনে বাতাসের সঙ্গে বরফঝুরি থাকে ; বরফ জমে না বটে,—কিন্তু সেই হাড়-কাঁপুনী কেউ চায়ও না।

এতো সুন্দরকে যারা এতো কুৎসিত করে তোলে তাদের 'মানুষ' বলে মনে করতে চাই না। তাদের মধ্যে যেতে চাই না।

'কী আশ্চর্য ! অ-চাওয়াকে হলো চাইতেই !'—সেই জ্যামায়কায়ই আমায় যেতে হলো বারে বারে।

প্রথমবার সেই ১৯৬২-তে। শেষ এই সেদিন ১৯৭৯-তে।

আমার বন্ধু দাদলানীর ছিলো বিরাট ব্যবসা জ্যামায়কায়,—কিংসটনের সকলেই এক ডাকে বম্বে বাজার চেনে। কিন্তু অনিশ্চিত ভ্রমণের দরুন কোনো খবর দেবার জো ছিলো না।

বন্দর থেকে কিংসটনের সেরা পাড়া হাঁটা পথ, যেমন হাওড়া ব্রীজ থেকে কলেজ স্ট্রীট বা গোলদীঘির মোড় ঘুরে চৌরঙ্গী।

তখন ভোর সাতটা হবে। দোকান পাট, কেউ ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াচ্ছে, কেউ তখনও চোখ বুজে।—১৯৬২-র কিংসটন। ছিমছাম, পরিষ্কার। ফুটপাথগুলো হলদে-খয়েরী টালি দিয়ে সাজানো। কলোনীয়ল গন্ধে জ্যামায়কার অঙ্গ মো মো। স্থাপত্য বলতে ভিক্টোরিয়ন ঠাট গাঁথা চৌকো থামের মাথায় খিলানের সারি। কাঠ আর টিনের ছড়াছড়ি।

দোকান পাট খুললে দাদলানীর সঙ্গে দেখা হবে। তার আগে সামনে প্যারেড গার্ডন্‌সে গেলাম। ভোরের হাওয়া খাওয়ার দল বাগানে ঘুরছে। অনেকে দৌড়ুচ্ছে। মানুষজন দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক এ পার্কটি বাজারের ধার ঘেঁষা পার্ক। এর মধ্যে সম্মানযোগ্যা বিশিষ্টা মাত্র পাথরে কাটা রানী ভিক্টোরিয়া। বাকী সব আমাদেরই মতো। কেবল লীলার শাড়ি এবং সিঁদুর দেখে মাঝে মাঝে একটা হঠাৎ চমকের ধাক্কা।

ইতিমধ্যে 'হাই-লো' সুপার মার্কেটটা খুললো। আরও এগিয়ে পোস্টাফিসটাও। তারই গায়ে গা দিয়ে ছোট্ট একখানা দোকানে নিগ্রোবৃন্ধা কার্ড বেচছে। 'পিকচার পোস্টকার্ড'।

কিছু চিঠিপত্র লিখলুম। কার্ড পাঠানো হলো নানাস্থানে। দেশেতে জগন্নাথের পট-পাঠানোটা হয়ে পড়েছে প্রিমিটিভ্। কিন্তু এটায় ফ্যাশন আছে! মথুরার গলি থেকে কেষ্ট ঠাকুরের বংশীবদন ছবি কিনে মাদাম কার্পালেস তাঁর বোনকে প্যারিসে পাঠান। কিন্তু আমরা পাঠাই পিক্‌চার পোস্টকার্ড কুতুব মিনার কিংবা তাজমহল।

পোর্ট রয়্যালের গির্জা সেণ্ট পীটারের কার্ড পাঠানো হলো। সে গির্জার মাহাত্ম্য

আছে। সেই যে ১৬৯২-তে পোর্ট রয়্যাল ভীষণ ভূমিকম্পে এবং ঝড়ে ধ্বংস হলো। সেই সময়ে ক্রাইস্ট চার্চ গির্জার সলিল সমাধি হয়। ১৭২৫-এ এই গির্জা খাড়া হলো। জলদস্যু মর্গানের দেওয়া রূপোর কোশাকুশী, পুষ্পপাত্র, জলাধার ইত্যাদি আজও দেবতার পুজোয় লাগছে। অবশ্য তা যে কোন্ পানামার কোন্ গির্জা লুঠ করা মাল তা দেবতাই জানে!

দাদলানীর দোকান ততক্ষণে খুললেও দাদলানী আসেনি। ইচ্ছে করেই ফোন না করে একটা স্লিপ লিখে রেখে বাইরে আসতেই দেখি বাস। যাচ্ছে পোর্ট-রয়্যাল্,—জ্যামায়কার প্রাচীন রাজধানী, কুখ্যাত শহর। নাটকে, নভেলে, ডায়েরিতে, চিঠিপত্রে পোর্ট রয়্যালের বদনাম ছিলো ঐতিহাসিক।

চড়ে বসলাম বাসে।

আর ভাবতে লাগলাম পোর্ট রয়্যালের কথা।

আগাগোড়া পথই সমুদ্রের ধার ধরে। শুধু শেষ চার পাঁচ মাইল পথ সমুদ্রের ওপর দিয়ে জল বেঁধে 'কজওয়ে'। দু ধারে নীল শান্ত জল।

অর্থাৎ পুরনো পোর্ট রয়্যালের সলিল সমাধি হয়ে গেছে। তার ওপরে শহরের আবর্জনা ঢেলে এ পথ। পথের শেষে পুরনো শহরের যা একটু রয়ে গেছে তার মধ্যে বাঁচোয়া কেবল দুর্গটি। এখন সেনানিবাস, পুলিস স্কুল, সেনা শিক্ষণের ক্যান্টনমেন্ট।—এবং তার পরে কুখ্যাতির আড়তে ঢাকা কতকগুলি পানাগার এবং সেই বাবদে সারি সারি এক রজনীর নায়িকাদের ঘর।

তারও পরে সমুদ্র ধ্বসে যাওয়া দুর্গের প্রাচীর ছাদ পার হয়ে দিগন্তবিস্তৃত ক্যারাবিয়ান সাগর।

সূর্য উঠেছে তখন দিগন্ত বলয়ের অনেক ওপরে। বেলাভূমিতে স্নান করছে বহু উৎসাহী বেলাচারীরা।

আমরা সেই ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে আকন্দ, বাসক, আসশ্যাওড়ার জঙ্গল ঠেলে এসে পড়লাম ক্রাইস্ট চার্চ গির্জার ধারে। তার সামনেই বাস স্টপ্।

হোক প্রাচীন চার্চ; তবু এরই আশেপাশে গাদি গাদি নোংরামী, গরীবী, বেশ্যালয়, জুয়ার আড্ডা। গা কেমন যেন ছম ছম করে। যে কটা মানুষ সকালের আলো বাতাস অগ্রাহ্য করেও এদিক ওদিক একটু ব্যস্ততায় মগ্ন তাদের চাহনির মধ্যে কেমন যেন দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সন্দেহ, প্রশ্ন। ঠিক যেন মানুষের চাওয়া নয়।

গুণ্ডার আড্ডা হিসেবে পোর্ট রয়্যালের পুরনো খ্যাতি অটুট। গির্জা ডুবেছে; গির্জা উঠেছে। শহর তলিয়েছে; শহর গড়েছে। এ তল্লাটের সব সেরা পাপভূমি, ব্যাবিলোন-সডম্-গমোরার সর্বনাশের মতোই মাত্র বিশ মিনিটের ভূমিকম্পে নেমে গেলো সমুদ্রের জলে। যাও বা বাঁচতো সাইক্লোনিক ঢেউয়ের ঝাপটায় গুঁড়িয়ে গেলো। সর্বগ্রাসী একখানা বিরাট ঢেউ এসে সেই গুঁড়ো ধুয়ে নামিয়ে দিলো জলে। আজও ভাঁটার সময়ে বুদ্ধু-যাত্রীদের পাণ্ডা গাইড্ জলের কিনারে নিয়ে গিয়ে ডুবন্ত শহরের কঙ্কাল তো দেখায়ই,—বলে কান পেতে শোনো,—সেকালের ক্রাইস্ট চার্চের বিপদ-জ্ঞাপক

ঘণ্টার ধ্বনি এখনও শুনতে পাবে।...এবং বহু আমেরিকান যাত্রী কেতাবে লিখে ধন্য যে সে ঘণ্টার শব্দ সত্যই স্বকর্ণে শুনেছে! তবে জলের তলায় পুরনো শহর দেখার ডুবুরি ব্যবস্থা আজও চালু আছে।...অনেকে সেই সেকালের প্রাসাদ, ব্যবসার-গদি, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির মধ্যে প্রবেশ করেন Lost Treasures-এর তল্লাসে! টাকার জোরে আমেরিকা যাচ্ছে চাঁদে, নামছে মর্গানের ট্রেজার হাণ্টে; শুনছে জলের তলার ঘণ্টা; এখন কেবল বাকী, আকাশকুসুমের চাষ করে কাটিং দিয়ে মায়ামীতে Miss World Contest-এর বেদী সাজানো!

কিন্তু আজও কিংসটনের পশ্চিমে স্পানিশ টাউনে দেখতে পাওয়া যায় কী অসম্ভব নোংরা এবং দুর্দশায় থাকতে অভ্যস্ত জ্যামায়কার নিগ্রো। এই স্পানিশ টাউনের তুলনা না মেলে মেটেবুরুজে না মৌলালি-তালতলায়, না চীনাপটীতে, না সেকালের কলাবাগান বস্তিতে। এ অনবদ্য। এই নোংরামী এবং দৈন্য চাপা দিতে গেলে Golden Green-এর তীব্র মাদকতার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

কলোনিয়ালিজমের জীবন্ত উদাহরণ জ্যামায়কা, ক্যুবা, হেতী, গায়ানা ইত্যাদি। এই দুর্দশার ঘাড়ে চেপেই য়োরোপের "প্রগ্রেস", আমেরিকার "যক্ষলোকে"র সৃষ্টি সম্ভব হতে পেরেছে। ভারতবর্ষ দুর্ভাগা। সে তার অতীতের গরিমা ভুলতে পারে না, এবং বর্তমানের দুর্দশাকে আমল দিতে চায় না। একেবারে রসাতল হয়তো স্বর্গের মতো সুস্থ। কিন্তু যে দেশের ইতিহাসই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছে তার মুক্তি কোথায়? জ্যামায়কায় এসে অনিবার্যভাবে ধাক্কা দেয় এ দেশের চরম দুর্দশা, 'মিজারি' বলে ইংরেজী ভাষায়। এবং জ্যামায়কার গরীবিই জ্যামায়কার মুক্তি সংগ্রামের জমাট বারুদ।

আজ জ্যামায়কায় রাস-তাফারি সম্প্রদায়ের গাঁজা খাওয়া বন্ধ করার জন্য সরকারকে মাঝে মাঝেই খণ্ডযুদ্ধে নামতে হয়। এই গাঁজাখোর, চরসখোর, গুলীখোর, মাতাল, লম্পট, ডাকাত, খুনের দলকে চাগিয়ে রেখে রাজনৈতিক দলাদলি জবর নাগরদোলায় ঝাঁপাই ছুঁড়ছে। বুস্টামাণ্টে এবং ম্যানলী এঁরা জ্যামায়কার রাজনীতিতে লোহিয়া এবং নেহরু, না-কি নাম্বুদ্রীপাদ এবং জয়পুরের মহারানী। একজন সর্বহারাদের ক্ষেপিয়ে তুলে সর্বহারাদের সর্বতরহারা করে তুলতে বিচক্ষণ; অন্যজন সর্বহারাদের দিকে আদৌ না ফিরে ক্রমবিবর্তনের বুলি ছাড়েন রোলস্ রয়েসে চেপে। একজন ঝাঁকড়া মাথা ঝাঁকড়ে 'কচ্চী জবান্'-এর বদ্‌গন্ধ ভরতি বিষ ভাষার পিচকিরি দিয়ে মগজে চালিয়ে দেন; অন্যজন ইংরিজী বলেন উচ্চাঙ্গের, সুট-টাই পরেন আগুন; চালালেন একেবারে রয়্যাল ডিগনিটি। একজন যদি ন্যাংটা গান্ধীর ফকিরি বয়েদে ভ্যাদভেদে, অন্যজন ওয়েল-ড্রেসড জনাব জিন্নার পার্ফেক্ট্ ইংরিজী শানে খরোতর।

আসলে জ্যামায়কার রোগ-হাকিমীর বাইরে। ৪৪০০ বর্গ মাইলে থাকে ১,৬০,৬০০ (১৯৬০) লোক। এবং এই ৪৪০০ বর্গ মাইলের অর্ধেক এতো পাহাড়ী যে মনুষ্য-বাসের অযোগ্য। জ্যামায়কার বাসিন্দাদের উপজীব্য কৃষি। কৃষিজ-পণ্য যা আছে সবই ছিলো অ-জ্যামায়কীয় বণিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খনিজ পণ্যও যথেষ্ট। সবই বিদেশীদের। তাঁরা খনিজ মাল স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছেন; এবং জ্যামায়কায় কারখানা

করতে অনিচ্ছুক। ফলে যেমন একধারে প্রতি দুই লক্ষ ডলারের মৌলিক মাল রপ্তানীর পরিবর্তে তিন লক্ষ ডলারের শিল্পজাত ভোগ্যবস্তুর আমদানী হচ্ছে, তেমনি অন্যধারে লোকসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তুমুল বেগে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে ৩০% লোক বেড়েছে। জন্ম-মৃত্যু বিচার করে দেখা যায় ৫৪৯০০ লোক নীট জীবন্ত থাকছে, মরতেই পারছে না। বছরে জন্ম ৬৯,২০০, মৃত্যু ১৪,৩০০ ; অমর হয়ে আছে ৫৪,৯০০ ! ১৯৬০-তে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড় লক্ষ! কাজেই শাদা দেশ ইংলণ্ডে আমেরিকায় জ্যামায়কান ইম্মীগ্রাণ্টস একটা প্রথম-ধাপের সমস্যা।

এরা পালায়। ব্রিটেনে জ্যামায়কানদের আসা এমন বেড়েছে যে ইংরেজরা এখন দ্রুত নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা এবং কানাডায় ধাবমান। বর্তমান ইংলণ্ড সরকার রং-দার বসতি নিয়ে পয়লা নম্বরের সমস্যায় পড়েছেন। একদিকে E. C. M.-এ না ঢুকলে পাউণ্ড যায় যায়, ব্যবসা লোপাট হয় হয় ; অন্যদিকে কমনওয়েলথের রাজ-সভাটি চাগিয়ে রাখা যেন বেড়ালের গলায় কাঁটা। প্রতি বছরে ৩০,৪০০ জ্যামায়কান যাচ্ছেন বিলেতে। পথে ঘাটে মাঠে সাদা রং ক্রমশঃ যেন বাদামী হয়ে যাচ্ছে। তাকড়া জ্যামায়কান মরদের বিক্রম দেখে ইংরেজ তরুণও লম্বাচুল রং করছে, ঠোঁটে রং দিচ্ছে, কানে মাকড়ী দুলিয়ে ঘাগ্‌রা পরে ঘুরছে !! ইংরেজ ললনারা বলছে, কী গরম গরম টুইস্ট খেলে জ্যামায়কানরা! পুরুষ হয়তো হতে হয় জ্যামায়কান!

সেকালে হাতে কাজ করতে হতো। তাই শ্রমিক যোগাড় করতে হতো। শ্রমশীল শ্বেতবর্ণদের দরকার হতো ঘোড়া, জ্যামায়কান, ইণ্ডিয়ান। এখন শ্রম, শ্রমিক, শ্রমিক-আন্দোলন ইত্যাদি ঝামেলা সাবড়ে দেবার প্রত্যাশায় শিল্পপতিরা শ্রমসাধ্য ব্যাপারে "নিয়োগ" ব্যবস্থা মেনে নিচ্ছেন ; কায়িক শ্রমকে যান্ত্রিক কৃতিত্ব দ্বারা লঘু করছেন। ফলে যে টাকা বাঁচছে তা জ্যামায়কানদের ভাতে নুন জোগাচ্ছে না। চলে যাচ্ছে ম্যানহাটান ব্যাঙ্ক কি সিটি ব্যাঙ্কে। জ্যামায়কার মানুষগুলো স্পানিশ টাউনে, কিংসটাউনের বাইরে, গলিতে ঘুঁজিতে অন্ধকারে নেশা, ভাঙ, লুঠ, গুণ্ডামী করছে। স্বপ্ন দেখছে আবিসিনিয়ার। সেখানে নিগ্রোরাজা ছিলো, নাম তার হেইলে সেলাসী। সেই রাজার নামে পুজো আজও চড়াচ্ছে। বিরাট তান্ত্রিক জগৎ গড়ে উঠেছে ঃ রাসতাফারী। দরিদ্রের স্বর্গ ঃ কোনোদিন, কোনো পরিত্রাণায় সাধুনাম্, বিনাশায় দুষ্কৃতাম্, কেউ 'কল্কি' অবতার নিয়ে আসবেন। বাঁচবে নিগ্রো জাতি।

এই রাসতাফারীরাই ১৯৬০-তে রাজ্ঞী এলিজাবেথের অভ্যর্থনাকে জটিল পরিস্থিতি করে তুলেছিলো ; আবিসিনিয়ার হেইলে সেলাসী যখন ১৯৬০-তে জ্যামায়কায় এলেন তখন একটা খণ্ড বিদ্রোহে এরাই সরকারি ব্যবস্থা তচনচ করে দিয়েছিলো। সর্বশ্রী পাতিল, রাম, গান্ধী, পটনায়ক, গুপ্তাদের মতো এখানকার গণতান্ত্রিক-গবেষকাচার্যেরাও জানেন যস্য গৃহে রাসতাফারী ভোট, তস্য মাথায় সরকারি তাজ। বর্তমান জ্যামায়কায় রাসতাফারী দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দল। ভারতবর্ষের গুরু দায় যেমন হরিজন,

সর্বহারা, আদিবাসী, বাস্তুহারাদের কোটি কোটি, তেমনি। এই গণতন্ত্রের গণেশের শুঁড়টি বহুৎ লম্বা। গণতন্ত্রে হয়েছে মাইনরিটিই মেজর জেনারেল। মেজরিটি হয়ে পড়েছে 'এহ বাহ্য'।

পোর্ট রয়্যালের পথে পাহাড়ী গাঁয়ে রাসতাফারীদের ঘনা-আড্ডা। স্পানিশ-টাউনে রাতে যাওয়া, আমার হাড্ডীতেও ঠকঠকানী লাগিয়েছে। ও কম্মো আর করতে চাইবো না। প্রথমবারই শেষবার। প্রকাশ্যে বর্বর পশ্বাচার দেখেছি ত্রিনিদাদে কার্নিভ্যালে; ত্রিনিদাদ উন্নত দেশ। পশ্বাচার এবং বর্বরদের জন্য ওরা বছরে দুটো দিন ঠিক করে দেয়। কিন্তু যা দেখেছি জ্যামায়কার স্পানিশ-টাউনে! "দিন কী হোলী, রাত দিউআলী, রোজ মনাতী (স্পানিশ টাউনের) মধুশালা।"

এই পোর্ট রয়্যাল ছিলো ক্যাপটেন মর্গানের ক্রীড়াভূমি। সেই বোম্বেটের সর্দারকে মহামান্য ইংলণ্ডাধিপতি জ্যামায়কার গবর্ণর করে পাঠান। স্যর হেনরী মর্গানের ইতিহাস না বললে জ্যামায়কার ইতিহাস অসম্পূর্ণ। জ্যামায়কা ঘুরবো, হেনরী মর্গানকে জানবো না, ঠিক জ্যামায়কা দেখবো, রাসতাফারীদের জানবো না-র মতো ফুস—স!

পোর্ট রয়্যাল ফেরত কিংসটাউন তখন গমগম করছে। 'হাই-লো' সুপার মার্কেট এবং পার্কের মাঝে এক 'সোপ-বকস' বক্তাকে ঘিরে একটা দল হৈ হৈ করছে। আমরা বেছে একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নিচ্ছি।

খাওয়া জমছে না। গোরার মনঃপুত হচ্ছে না বাবা তাকে একটা ক্যামেরা কিনে দিচ্ছে না। নিজের ক্যামেরায় নিজে ছবি না তুললে আবাব দেশ দেখা কী?

বাবারও মনঃপুত হচ্ছে না। পুত যদি খুঁৎ খুঁৎ করে মন কী করে পুত হয়? পুতের মাও যখন সঙ্গে। কিন্তু বাবার বিপদ ঘনা। ছোটো কন্যা আতুও বাড় বাড়ন্ত চোখে ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে।

'কোডাক' ডাকছে। সামনে ক্যামেরার গাদি। নাও গোরা, যা ইচ্ছে।—দিলাম ঢালাও হুকুম।

তখন গোরাই বা কে, রথস্চাইল্ড টু-দি-পাওয়ার আইফেল টাওয়ারই বা কে! গোরা তখন জবর বয়স্ক। টপাটপ্ বোল ছাড়ছে। বাক্রা (চীন=চিং, ভারতীয়=কুলী; আফ্রিকান=নিগার; শাদা=বাক্রা; এ-দেশী শাদা=ক্রিওল্) দোকানদার দপা-দপ্ মাল ছাড়ছে; ঝপা-ঝপ দাম হাঁকছে। অবশেষে মডারেট গোরা তার ক্যামেরাস্থ হলো।

বলি, ওটায় ব্যাকালাইটের কভার। হাত থেকে পড়বে এবং ভাঙবে। নিও না। অন্য একটা নাও।

ব্যাকালাইটের শানদার মর্যাদা সাহেবজাদার মাথা বিগ্ড়ে দিয়েছে। ডোণ্ট্ ব্যাক-আউট। বলেছিলো, মাই চয়েস। তুমি বলেছো মাই চয়েস্।

বেশ!

সামনেই ট্যাক্সি। গোরারা ক্যামেরাসহ বেরিয়ে গেলো। আমিও দাম মিটিয়ে

বার হয়েছি। ট্যাক্সিতেও চড়েছি। দেখি হাপুস নয়নে গোরা মহাগুরু নিপাতের কান্না কাঁদছে।

লীলা পতির সম্ভাব্য ক্রোধ এবং পুত্রের বিপুল শোকের মধ্যবর্তিনী হবার ফলে মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ…ন যযৌ ন তস্থৌ।

আতু হাঁ।

সেই যে আমি দাম গুনছিলুম,—ইতোমধ্যে ব্যাকেলাইটের হস্তচ্যুতি, পতন, ভাঙন সব শেষ। উপস্থিত বেদন, ক্রন্দন, আলোড়ন।

আমি বললাম, দেখি।

দেখলাম।

হেসে বললাম, বাবারা সব সময় ঠিক বলেন না এটাই যদি সত্যি, সব সময় বেঠিক বলেন না এটাও। বেশীর ভাগটা সত্যি বলেন এটাই সম্ভাব্য। কাজেই বাবাদের চান্স দেওয়া উচিত, অথবা না কেঁদে জোয়ান মরদের মতো সব কিছু সহ্য করা উচিত।

প্লাস্টিসিনের পুলটিশ বেঁধে ক্যামেরার খাঁচা মেরামত করে দিলাম। তবে গোরার তোলা ছবিগুলো আমার গুলোর চেয়ে ভালোই এসেছিলো।

অবশেষে দাদলানীর সঙ্গে দেখা। দাদলানী তো মহাখাপ্পা। আজ আমার দোকানে ভীড়। তিন তিনখানা বিদেশী জাহাজ এসেছে। আর এক দিনের বেশী আপনি থাকছেন না। হিন্দু সভাকে অবধি খবর দিতে পারবো না। বিশ্বনাথন্, কুলপতি এরা সব কী বলবে?

জ্যামায়কার দোরে বিদেশী, মানে কালীবাড়ির দোরে পাঁঠা। একচোপে সাবাড় না করলেই অশুভ। মিসেস ইন্দুমতী দাদলানী আমাদের ভাড়া করা ট্যাক্সি HP11095-কে দেখলেন, তস্য মালিককে চিনলেন, পুরো রাউট-টা (route এখানে রাউট্) বারংবার কচ্‌লে কব্‌লে দিলেন। বললেন পণ্ডিতজী আমার বড়া ভাই (অর্থাৎ দাদলানীর শালা হয়ে গেলাম !!); ঠিক ঠিক পৌঁছে দিবি (অর্থাৎ জেরবার করে ছাড়বি না; কুপিয়ে এক চোপে কাটবি না)। পীটার হক্ থলথলে নাদুসনুদুস্ লোক; সাধারণ জ্যামায়কানের মতো দুশমনি এবং দুশো-মনি চেহারা নয়।

তারই কাছে শোনা গেলো স্যর হেনরি মর্গানের গল্প। বাজার ইত্যাদি ঘুরিয়ে জ্যামায়কার অবশ্য করণীয় এবং দর্শনীয় স্থান হোপ্ বট্যানিকাল গার্ডেনস-এ এনে ফেললো। দুশো একর জমির ওপর এই বট্যানিকাল গার্ডেন দেখা যদিও যেতো হঠাৎ সামনের পাহাড় ডিঙিয়ে ভ্রূ-কুঞ্চন করে উঠলো একখণ্ড মেঘ। ম্লান হয়ে গেলো গার্ডেনের মুখ। আমরা আশ্রয় নিলুম অর্কিড ভবনে। লণ্ডনের কীউ গাডেনসের অর্কিড ভবন দেখেছি, দেখেছি তার তাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রপিকাল-ফ্লরার কাঁচঘরগুলো। কিন্তু শকুন্তলাকে দেখতে হলে কণ্বাশ্রম চাই; ওমরখৈয়াম চাখতে গেলে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সুরা, সাকী সব চাই। জ্যামায়কায় যা দেখেছিলাম অতুলনীয়।

১৫০০০ রকমের অর্কিড উদ্ভাবিত হয়েছে; এখনও হয়ে চলেছে। ব্রাজিলের বন অর্কিডের রাজত্ব। কী করে যে এই পরভৃতিক স্বর্গ-খণ্ডগুলো স্বপ্নে-ভয়ে-নেশায়-

লাস্যে বহুরূপী বেশ ধারণ করে, ভাবতে অবাক লাগে। কী যে অপরূপ এদের বেশ-বিন্যাস! এই প্রজাপতি, এই ফড়িং, এই শামুক, এই পতঙ্গ, এই সাপ; অবিকল পাখির ঠোঁট, ব্যাঙের মাথা; জ্বলন্ত চোখ; ফুটে ওঠা হাসি। যেন সারা আকাশের নীল রং আর সারাবলাকার পাখার ঝলক ধরে রেখেছে একটুখানি বুকে। অর্কিড জগৎ যেন সৃষ্টিকর্তার খেলাঘরে রংদার, মজাদার কার্টুন রঙ। সবাই সং, সবাই রং, সবাই হেসে হাসাচ্ছে।

স্পারোস্থিস, অদ্রিস, হ্যাবেনেরিয়া প্রভৃতি য়োরোপীয় অর্কিডের সঙ্গে আছে সাইপ্রেডিয়ামের পুরো পরিবার, এপিডেনড্রাস, সাইকোডস, পোগোনিয়া, সিলিয়া, রিস। অর্কিড কালচার হয় এখানে। নতুন নতুন সাজ পরে মরশুমে মরশুমে নতুন নতুন অর্কিড দেখা দেবে। মহাজনেরা লম্বা লম্বা দাম দিয়ে কিনবেন।

যে যতই করুক, সেই যে নারকাণ্ডা থেকে নামার পথে বাস-রুটের ধারে সন্ধ্যেবেলায় দেখেছিলাম একগোছা অর্কিড হাতে করে দীনাতিদীন পোশাকে উজ্জ্বল চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো পার্বতী-কিশোরী না দেখলাম তেমন সন্ধ্যা, তেমন মেয়ে, আর তেমন এক-গোছা অর্কিড!

> গন্ধ তারি স্বপ্ন সম
> লাগিছে মনে, যেন সে মম বিগত জনমেরি।

জ্যামায়কা সরকার গড়েছেন ক্যাসলটন্ গার্ডেনস্! সেখান থেকে অর্কিড বেচার একটা ব্যবস্থা আছে। জ্যামায়কা সরকারের মস্ত একটা আয় বিদেশী ভুলিয়ে পয়সা বার করে নেওয়া। আরও বড় আয় বৈদেশিক বাজারে অর্কিড রপ্তানী করে।

কিং-স্ট্রীটের পুরনো বাজারে নতুন নতুন দোকান দিব্যি সেজেগুজে বসে থাকে পথিকের জেব কাটতে! দফায় দফায় চীন থেকে পেরু, কামাচাট্কা থেকে কুম্ভকোনমের মাল পাবেন। পাবেন অর্কিডও,—প্লাস্টিকের; ওগুলো হলো আমেরিকান অর্কিড।

এই হোপ গার্ডেনসের সঙ্গে একটি বিধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ১৯৭৯-তে আমি শেষ ক্যুরাসাও (ভেনেজুয়েলার উত্তরে ডাচ অধিকৃত দ্বীপ) যাই। ইচ্ছে পানামার পথে দক্ষিণ থেকে মেক্সিকোয় যাবো। পানামায় এসে এগুনো গেলো না। নিকারাগুয়া-গুয়াতেমালার পথ ভারতীয়দের জন্য বন্ধ। অগত্যা জ্যামায়কার পথে মায়ামী হয়ে যাত্রা।

সেবার চার দিনের জন্য কটেজ ভাড়া করে আছি। কটেজের অন্য অংশে একটি বিলকুল সবুজ উচ্ছল একজোড়া তরুণ-তরুণী। খাচ্ছে, নাচছে, গাইছে, সুইমিং পুলে পানকৌড়ি খেল খেলছে। ওদের খুশীতে সমগ্র পরিবেশটা খুশী।

দুপুরটা এধারে নিঃঝুম সবুজের দোলায় দুলে দুলে মুহ্যমান। আমি ক্যামেরা নিয়ে ছবির সন্ধানে মগ্ন। মেক্সিকান লিলির গায়ে গিরগিটি ধরেছে ঢাউস একটা 'মথ্'; কালাবাস ফলের সবুজ ছালে গা ঢেকে একটা লাউডগা সাপ। একটা কাঠঠোকরা নিপুণ অভিনিবেশে কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়ে গর্ত করতে লেগেছে। মাইক্রো-

স্কপিক লেন্সের মধ্য দিয়ে মনে হলো ছেলেটি আমগাছে চড়েছে। মেয়েটি কটেজের রক্ষক তরুণ নিগ্রোটিকে কী যেন বোঝাচ্ছে। দু-জনেই হাসছে।

আমি একটা হ্যামকে দোল খেতে খেতে অক্তাভিও পাজের কবিতা পড়ছি।

হঠাৎ মেয়েটি এসে দাঁড়ালো। "খাবেন ?...খুব ভালো।"

"মনে হচ্ছে ও ভালোর বয়স পেরিয়ে এসেছি।—তোমার মুখ চোখ তো ঝালে লাল হয়ে উঠেছে।"

হাসলো সেই তরুণী, যে হাসি তরুণীদেরই মানায়। কাঁচা আম, লঙ্কা, নুন একটু সর্ষের তেলের ছিটে!

এ সব পেলে কোথায়? আম তো তোমার বন্ধু পাড়ছিলেন, দেখলাম।

ওঃ! কী হাসি।...

ওই স্টিফেন (নিগ্রো রক্ষক) এসব যোগাড় করে দিলো।

চুরির মালে বেশী স্বাদ। তাই নয়?

আঃ! বড়ো কথা বলেন। নেবেন? নিন। একটা ব্রেডফ্রুটের পাতায় এক খাবলা জ্বলন্ত আগুন আমায় দিয়ে গেলো।

পরদিন সকালে হোপ গার্ডেনে বার বার মেয়েটিকে দেখতে পাই, কিন্তু ও কাছে আসে না। কেবল এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওর সঙ্গী নেই। একা।

চিড়িয়াখানায় যথারীতি নানাবিধ দ্রষ্টব্য। সেরা দ্রষ্টব্য প্রফুল্লিত শিশুগুলি। তাদের উৎফুল্লতা সব পরিবেশ ছাড়িয়ে উঠেছে।

কিন্তু মনটায় সেই বিষণ্ণ মুখখানা। সেই একাকীত্বের অভিশাপ।

খানিক পরে ছেলেটিকে দেখলাম অতি সুন্দরী এক তরুণীর সাথে ঘনসন্নিবিষ্ট। সন্নিবিষ্ট ছাড়াও আরও উদ্দীপনাময় কিছু।

আমি অবাক। পাহাড়ের গায়ে থাক থাক বাগানের মধ্যে হোপ-গার্ডেন। বিশিষ্ট গাছে সাজানো সুপরিকল্পিত মণ্ডলটি। কিন্তু প্রথম প্রভাতে সেই সুস্মিত পরিবেশ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেলো। মনে ছবি এঁটে রইলো বিশাল এই বাগানটার মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুগুলির মতো একটি কচি মন পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে একাকী তপ্ত নিরস গহনে ছটফট করছে।

কাঁদছে। কাছে গেলাম। বসলাম। বললাম, সারা পৃথিবী খান-খান হয়ে ভেঙে ভেসে যাবে মাত্র একজনার অবিমৃষ্যকারিতায় এমন আকাশ ধরা ছাপানো মহাজনটা কে? তুচ্ছ হয়ে যাবে ত্রিভুবনের রস মাত্র একটি নগণ্যের গণনায়?

ডাগর অশ্রুময় চোখে তাকিয়ে উঠলো সে।

দাঁড়ালো আমার পাশে। বললো, চলো, ছুটবে? খানিকটা দৌড়ুই।

আমি বলি, তুমি দৌড়োও; আমি নয়নভরে দেখি! হরিণী দৌড়োয়। আমি বুড়ো কচ্ছপ। কুৎকুতে চোখে দেখলেও আনন্দ তো হবেই।

সেবার বটানিকাল গার্ডেন্‌স, সুপ্রসিদ্ধ সেই অর্কিড বাগান, সেই তরুণীর সঙ্গে

দেখলাম, এবং আনন্দ পেলাম ভেবে যে আকাশ থেকে টেনে একখানা মেঘ সরিয়ে দিয়েছিলাম জ্যোৎস্নার কান্না দেখে।

ট্যাক্সি ব্লু মাউণ্টেনের অবজার্ভেটরি রকে এসে ছেড়ে দিলে সকলকে। পোর্ট রয়্যালের কথা সবার মনে। সারা শহর জলের তলায়। সে কথা শুনতে চায়। শুনতে চায় হেনরি মর্গ্যানের কথা। আমি পীটর হককে বলি, তোমার দেশের কথা তুমি বলো। বই তো কত কিছু বলে। তবু দেশের কথা দেশের মুখে শোনার মধ্যে একটা চারণী সুর আছে।

তা গল্প শোনাবার জায়গা ব্লু-মাউন্টেনের অবজার্ভেটরি রক। থরে থরে বাগান। টিনে ছাওয়া একটা গোল বসার জায়গা। এ ছাড়া পাহাড়ে গা এলিয়েও বসা চলে। পীটর হক বলতে লাগলো মর্গ্যান-কথা ঃ

আপনারা ভারতীয়। বুঝবেন না বুকানীয়র কী মাল। আরব জল-দস্যুদের কাহিনী এই সব স্পানিশ ফরাসী ইংরেজ পর্তুগীজ বুকানীয়রদের কাছে কিছু নয়। গোল্‌ডেন গ্রীন আর সাবুদানা; গরুর ঠ্যাং আর সেদ্ধ পেঁপে। এ দেশের নাম করা বুকানীয়রদের মধ্যে ফ্রান্সিস্‌ লো'ক্লোনেই, বার্থোলোমীউ পর্তুগেজ, রক ব্রাসিল্লানো, কাপ্তেন ড্রেক, কাপ্তেন হপকিন্স্‌, হক্‌ এবং বুকানীয়রদের রাজা এই হেনরী মর্গ্যান। কেবলমাত্র রাহাজানি করায়ই তো নিপুণ নয়; বোম্বেটেপনায় ওস্তাদ। মান, ধর্ম, ইজ্জৎ, সত্য সব কিছু সে ধুলো মনে করতো অর্থ এবং কামের কাছে,—এই গুণাবলির জন্য, হ্যাঁ মাত্র এই গুণের গরিমাতেই জ্যামায়কার লেফটানেণ্ট গবর্নর হলেন,—কে? না হেনরী মর্গ্যান।

কিন্তু কী ছিলিস, তুই হেনরী মর্গান, তা বল্‌। কার না কার পুত? ব্রিস্টল থেকে তোকে কে ছেলেবেলায় বাগিয়ে আনে চড়া দামে বারবাডোজে বেচবে বলে। ওয়েল্‌শ্‌-ম্যান তুই। জি-ও-ডি গড্‌ লিখতে গেলে তুই বারোটা কলম ভাঙিস। মর্গানের বাপ নাকি মস্ত জোতদার ছিলো। সেকালে ব্রিস্টলে ছেলেধরা ব্যবসায়ী ছিঁচকে অনেক ছিলো। তারাই কেউ ভুলিয়ে বার্বাডোজে এনে ওকে ঝেড়ে দেয় মোটা টাকায়। কিন্তু দাস হয়ে থাকার বাচ্ছাই বটে সে ছেলে! পালালো জ্যামায়কায়। জ্যামায়কাতেও ওকে পাকড়াও করার ভয়। কে কবে ওকে ফের-সে বার্বাডোজের মালিকের খপ্পরে গুঁজে দেয়। তখন ও ঠিক করে নিলো বোম্বেটে হয়ে যাবে। বোম্বেটেরাও জানতো পালিয়ে-আসা দাসের মতো পোখ্‌তো মাল সহজলভ্য নয়। বছর দুই বোম্বেটেদের সঙ্গে থেকে দেখে দেখেই মর্গ্যান জাহাজ, লড়াই এবং বোম্বেটেপনার বেবাক বিদ্যে মগজে চালান দিলো। রক্ত থেকে গর্মীর লেশও মুছে ফেললো। ঠাণ্ডা মগজ, ঠাণ্ডা কলেজা, ঠাণ্ডা রক্ত,—কিন্তু গরম গরম কাজ, চটপট,—ত্বরিৎ ঘড়িৎ—এই তখন মর্গ্যান। তারপরেই কয়েকজন খালাসী বোম্বেটেদের বুঝিয়ে, টাকা যোগাড় করে কিনে ফেললো জাহাজ। জাহাজ কিনতেই একবাক্যে মর্গ্যান হলো কাপ্তেন। প্রথম দফায়ই পরপর কয়েকখানা জাহাজ লুঠে মর্গ্যান লাল হয়ে গেলো।

ক্যারাবিয়ানের সূর্য বার বার লাল হয়ে গেছে স্থলে মর্গ্যানের তলওয়ারের ডগা থেকে

ফিনকে ওঠা রক্তে, জলে শত শত জাহাজ-চোয়ানো বীভৎসতায়, আর অন্তরীক্ষে মর্গ্যানের মশালে জ্বালানো নগরী, গ্রাম, জনপদের লেলিহান শিখায়। ইতিহাস লাল করে দিলো মর্গ্যান। ব্যবসায়ে মুনাফা এলে ইংরাজ বাচ্চা নীতিবিবেককে বাইবেলের মধ্যে গুঁজে তুলে রাখতে ওস্তাদ। এটা ভারতবর্ষ দেখেছে ক্লাইভের জালিয়াতি, ও'ডায়ারের নৃশংসতার ব্যাপারে। মর্গ্যানের বেলায়ও তাই। মর্গ্যানকে ইংরেজের হয়ে স্পানিশ বসতি ধ্বংস এবং দখল করার ঢালাও ফরমান দিলেন রানী সাহেবা। ফলে পানামা অবধি মর্গ্যানের প্রতিপত্তিরও ফৈলাও হলো। এর পরে ইংরেজ সরকারই স্যার হেনরী মর্গ্যানকে ক্যারাবিয়ানের ইংরেজ বহরের 'এ্যাডমিরাল' করে দিলেন। স্মরণ করুন ক্লাইভ! ওয়েল্‌সের চাষীর ছেলে, দাস-বাজারে বিক্রী হওয়া ছেলে, পলাতক দাস মর্গ্যান হলো ইংরেজ নৌ-সেনাপতি!

কিন্তু হেন যে হেনরী মর্গ্যান জব্দ হয়েছিলো একবার। তাভোগা এবং তাভোগিলা দ্বীপ থেকে পাইরেটরা ধরে এনেছিলো পরমা সুন্দরী কন্যা। বহু কন্যার মধ্যে এই কন্যাটিকে মর্গ্যান আলাদা করে রাখলো। স্বামী বণিক। জাহাজ নিয়ে ব্রাজিলে গেছে। ইতিমধ্যে এই কাণ্ড। মর্গ্যান সব পোড়াতো, চার্চ পোড়াতো না। ধর্ম(?) ভীরু শয়তান। মেয়েটির কাছে যখনই আসতো মেয়েটিকে দেখতো হাঁটু গেড়ে উপাসনা করছে। যখনই যায় ঐ উপাসনা!···দিনরাত সমানে কেউ উপাসনা করতে পারে? মর্গ্যান তাকে নিজের ঘরের পাশে স্যাঁৎসেতে দুর্গন্ধময় ঘরে রেখে দিলো। নিজে দেখবে কী করে দিনরাত কাটায় মেয়ে।

পরমা সুন্দরী মেয়ে।

পর পর চারদিন পাঁচদিন, সতেরো দিন! স্রেফ হাঁটু গেড়ে নিখাদ উপাসনা। হেরে গেলো মর্গ্যান।···বলেছিলো মর্গ্যান,—ভগবানে যার বিশ্বাস শিথিল হয়ে যায়,—তার কাছেই ভগবান এ্যয়সা রামসাক্ষী পাঠান।

আমি জিজ্ঞাসা করি,—HP11095 পীটার হক্‌-কে—হক্‌-কথা বলো তো সই, এ গপ্‌পো।···

কপাল চোখে নামিয়ে এনে পীটার বলে,—গপ্‌পো? গপ্‌পো বললেন কর্তা? এঃ, আপনার দেখছি ঈশ্বরের চেয়ে বেশী বিশ্বাস মর্গ্যানে; বাইবেলের চেয়ে নারীতে। বেশ বেশ, পড়বেন তাহলে,—Jhon Esquemelling-এর কড়চা, 'দি বাকানীয়ার্স অব আমেরিকা'। শ্মেলিং নিজে বোম্বেটেদের দলে ছিলো। পড়ে দেখবেন।

এখানেই হয়েছিলো সেই 'অপারেশন আপলিফ্‌ট্‌'!

মজার ব্যাপার। সেরে নিই। এটি খাঁটি জ্যামায়কান কেচ্ছা।

কুবায় জিদনে, অর্থাৎ ১৯৫৯-এর ১লা জানুয়ারীর প্রথম ঘণ্টাগুলো যখন নিদ্রিত কানে শোনা যাচ্ছিলো না, সেই ঘুমধরা সকালে ফীডেল ক্যাস্ত্রো হাভানায় প্রবেশ করলেন। বছর দুই আগে সীয়েরা মেস্ত্রীর সঙ্কুল চূড়ার গহিনে গহ্বরে ফীডেল ক্যাস্ত্রোর সঙ্গে ৮১ জন দুর্ধর্ষ বীর এসে পৌঁছুলো মেক্সিকো থেকে ছোট্টো একটা

বোটে। সেই আরম্ভ হলো গেরিলা যুদ্ধ। যথারীতি আমেরিকাও ঠেক্‌নো দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় য়ুনিফর্ম-পরা এক বাতিল মালকে, যার মান কাড়াতে থাকার মধ্যে আছে ঐ য়ুনীফর্মটিই। প্যাকিস্তানে, কঙ্গোয়, কোরিয়ায়, সেকালের মিশরে, সাঙ্গো,-দোমিঙ্গায়, ইন্দোনেশিয়ায়, ভিয়েৎনামে, লাওসে—সর্বত্র এটি এক খেল্‌। এই তো ‚সিদ্‌নেব আলজিরিয়ায, তুনিশিয়ায়, ঘানায়—তথৈবচ। বাতিস্তা ছিলেন সার্জেণ্ট। তাঁকে ঠেক্‌নো দিয়ে চাগিয়ে রাখা গিসলো ১৯৩৩ থেকে। পালালেন কাঠপুতলীর দেশে, আশ্রয় নিলেন সাঙ্গো দমিঙ্গোয় তাঁর সাঙ্গ্যাৎ লিওনা-দো ত্রুহিলোর কাছে। তখন কি জানতো বাতিস্তা ১৯৬০-৬১-তেই সাঙ্গো দোমিঙ্গোয় ত্রুহিলোর লীলাও সাঙ্গ হবে ?

থাক, ফীডেল কাস্ট্রো দেশের অবস্থা চটপট শুধরে ফেলাব জন্য এক একটা 'প্রজেক্‌ট' করেন। মিলিটাবী ব্যাপার তো। প্রজেক্‌ট না বলে বলেন অপারেশন। যথা—অপারেশন ফ্যামিলি।—অর্থাৎ জন্ম নিয়ন্ত্রণ। অপারেশন সুগার ; অর্থাৎ যেত্তা ভোট দেনেঅলা তেত্তা চলো মাঠে—আখ কাটতে চলো। পৃথিবীর বৃহত্তম চিনি সবববাহক ক্যুবা।

৮১ জন অগ্নিঋষি সংশপ্তক নেমেছিলো সেই প্রাতে। নামলো যেখানে সে তল্লাট মানুষের অসাধ্য, অগম্য। তবু তারা নেমেছিলো। হাঁটু অবধি জলা ঠেলে বাদাড় কেটে তারা যখন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়, দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগে দুর্ঘটনায় না-খেয়ে মবে মরেও ১২ জন বেঁচে থাকে। মাত্র দু বছরের মধ্যে সেই বারো জনই হটিয়ে দেয় একটা জমাট শাসনযন্ত্রকে।

কাস্ট্রোরা এ ঝক্কি নেয় কেন ? কোন মানসিক বলে বলীয়ান হয়ে নবজীবনের ধারক তরুণ এবং যুবকেবা মাত্র ১২ জনায় খেদিয়ে দিতে পাবে আমেরিকার পুষ্ট একটা শাসন-তন্ত্রকে ? ভিয়েৎনাম এরই দ্বিতীয় পাঠ।

বেশী বলার অবকাশ নেই। আমেরিকার হাতে ক্যুবা ছিলো বারবিলাসিনীদের (উভয়ার্থে—Bar-এর বিলাসিনী, এবং বারো জনের বিলাসিনী)—বৃন্দাবন। ফ্লরিডা পার হলেই শ্রীক্ষেত্র। জারজতা ক্যুবার অনপনেয় চরিত্র। পারিবারিকতার চিহ্নমাত্র নেই। একবার একজন আমেরিকান জন ল্যাংলীকে শুধিয়েছিলুম, ক্যুবা কুব্যার হলো ; তোমরা রাগো কেন ? ছোট্টো ক্যুবা কি আমেরিকাকে জিতবে নাকি ? সে ভয়টা কি আমেরিকান-শান-সুলভ ?

বারে ! চেঁচালো আমেরিকান। ক্যুবা ছিলো কোলে পোষা মিনি-পুষি। হঠাৎ যদি সেটা কেউ কেড়ে নেয়—রাগ হবারই কথা। আবার বেড়ালে যদি বাঘের ডাক ছাড়ে ভয়ও তো লাগে।

কেউ কেড়ে নেয় কী গো ? ক্যুবা তো কেনেডীর চেয়ে কাস্ট্রোরই বেশী।

আর ক্যুবার বাণিজ্য ? টাকা ?

বিদেশে বাণিজ্য ফয়লাও করার প্রবৃত্তিটা কি খুব শুভ ? বেয়নেটের হুড়োর ওপর নির্ভর করে গোঁ বজায় রাখাটাকে কি দেমক্র্যাসী বলবে ? ইংরেজদের শাসনে রানী আছেন। ওরা যদি জুলুম করে, মানায়। ওরা ওদের ব্যবসার ইজারাগুলো ছাড়ছে। তোমরা

আঁকড়াচ্ছো। মুসাদ্দীকের ঘটনা স্মরণ করো। লোকে কি বলবে না রানী-দার দেমক্র্যাসীতে প্রেসিডেণ্ট-দার দেমক্র্যাসীর চেয়ে বেশী স্বাধীনতা? আমেরিকার দেমক্র্যাসীতে কজন 'মানুষ' ভোট দেয়? ওদের শাসনটা মানুষের না ব্যবসাদারের?

ল্যাংলী সাহেব জোরের সঙ্গে বীয়ারের গেলাসটা টেবিলে রেখে বলেছিলেন, ঘরের মেয়ে যদি বর ছেড়ে বর্বরকে বিয়ে করতে চায় তাতে বাধা দেওয়া কি দেমক্র্যাসীর বিরুদ্ধে?

বিরুদ্ধে কি-না তুমিই বলো। মেয়েকে গড়তে গিয়ে যদি তার আক্কেল বুদ্ধি গড়তেই ভুল করে থাকো খেসারৎ দেবে কে?—মেয়ে যখন বর্বরকে চায়, তখন বর্বরতাই তার বরণীয় গো। মেয়েকে সাজিয়ে বারবনিতা করার মৎলব যাদের, তাদেরই বাপ মা বলে কবুল দিতে কোন মেয়ে রাজী হবে?

ল্যাংলীর ফ্যাকাশে মুখ লাল। ডাম এই ভারতবর্ষ। ক্যাংলা ভুখামড়কের দেশ। আমেরিকার খাবে আর আমেরিকার মাথায়ই কুকর্ম করবে। অকৃতজ্ঞ।

পারি কৈ ভাই। চাই তো। আইনে বাধে। আমেরিকাও মাথা পেতে দেবার বান্দা নয়। কিন্তু ভিখিরী ভারতবর্ষকে চেনা যায়। ক্যুবার বুকে চেপে তাকে ধর্ষণ করবে, তার পকেট মারবে, তাকে দিলে হয়তো এক রাতের পেট ভরা খেতে। কিন্তু ন'মাস পরেই যে তার এক মুখ বেড়ে দুই। যদি সে ঐভাবে তোমাকে আর না বুকে ধরতে চায় —তার কি খুব অন্যায়? তুমি সাজসজ্জা দিয়েছো ঠিকই; কিন্তু হে দেমক্র্যাসী-নন্দন সে তোমাকে কী দিয়েছে ভাই?

ল্যাংলী সদ্য সদ্য ক্যুবা থেকে ফিরেছে। ক্যুবার ওপর বই লিখবে। মালমশালা যোগাড় করছে।

বলে, জানো সারা আমেরিকার ডাক-সাইটে নাইট ক্লাব ছিলো ঐ ক্যুবা।

হাভানা ছিলো ক্যুবার মঁমার্ত। 'হাভানা হিলটন' নামে ছিলো একটা স্বর্গ। আর এক নাইট ক্লাব ছিলো পল-গগাঁ। এসব ছিলো নাইট ক্লাব জগতে ধুরন্ধর। সব বন্ধ। সারা দেশের অবস্থাই ওই।—নেই, নেই, নেই—কিসসু নেই। মেয়ে বলে সাবান নেই; ছেলেরা বলবে—সাইকেল নেই; বে-পাড়ায় যাও তারাও বলছে বাবু নেই। বাজার ফাঁকা। মনে হলে হুতাশ হয়।

ঐটাই যা বলেছো। কাস্ত্রো ওটা বন্ধ করেছে। করবে। হ্যাভানাকে তোমাদের লালবাতি পাড়া করবে না সে। ক্যুবায় সে মা-বোন-স্ত্রীকে মা-বোন-স্ত্রী করবেই।—এইটাই কাস্ত্রোর প্রধান কথা। হোক না কেন তা ফ্যাসিস্ট মনোভাব।

জানি হে জানি। ওখানে হাফ প্যাণ্ট পরে মেয়ে হাঁটলে সেটা বেআইনী; আর মায়ামীতে ট্রান্সপারেণ্ট প্লাস্টিকের বর্ষাতির বিজ্ঞপ্তি জাহির করেন ক্যুবান মেয়ে, পরনে খালি হিল তোলা জুতো এবং সেই বর্ষাতিটা—মাত্র বর্ষাতিটিই। খানিকটা হৈ হল্লা রগড় হয়। কিন্তু বর্ষাতি কোম্পানীর লাভ হয়। ক্যুবা মেয়ে বেচে, আমেরিকা কেনে।

হাসি আমি। ওদের দুঃখ বুঝবে না ল্যাংলী। বুঝবে যেদিন আমেরিকান মেয়েরা, কেনেডী রক ফেলারের মেয়েরা, পোর্ট অব স্পেনের পথে ঐ পোশাকে ঘুরবে এবং ঘুরবে লিমিটেডের ব্যবসার সমৃদ্ধির জন্য।

অসহ্য চিত্রটি গলাধঃকরণ করতে না পেরে ল্যাংলী বলে ওঠে, বোকো না তো। থামাও—

হেসে বলি, তবু তোমরা দেমক্র্যাটিক।

কাস্ত্রো তাই প্রত্যেক বিবাহিতা চল্লিশোত্তরাকে বিবাহ করায় বাধ্য করেন। অপারেশন ফ্যামিলী। প্রত্যেকে বর পায়। ছেলেরা মেয়েরা এক হয়ে একটা সিদ্ধান্ত করে। দলে দলে এক সাথে বিয়ে হয়। ৭৯৭ দফার আইন।

তেমনি অপারেশন নিউ হোম। আগাপাশতলা অর্থনীতিকে ব্যক্তিগত নিয়মানুবর্তিতা, ব্যক্তিগত ত্যাগ ও ব্যক্তিগত ব্যয়সঙ্কুলতা দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। কতো কম ব্যয়ে কতো বেশী সমৃদ্ধি উৎপাদন করা যায়; কতো কম আয়ে সংসার চালানো যায়।

ক্যুবা যেন বদলে গেলো।

সেই সুরে সুর মিলিয়ে নকলনবীশ জ্যামায়কায় "অপারেশন শোলডার স্ট্রাপস্" চালু হোলো। জ্যামায়কানরা রসিক।—বক্ষবন্ধনীর কারখানা ফৈলাও করার জন্য নাম করে দিলো 'অপারেশন শোলডার স্ট্রাপ্স্'।

পোর্টোরিকা করেছিলো অপারেশন বুট স্ট্রাপ। ফলে ক্যানাডা থেকে আমেরিকা থেকে টাকা এসে পোর্টোরিকার শিল্প বাণিজ্য চম্ চম্ করে বাড়িয়ে দিয়েছে।

জ্যামায়কায় আমেরিকানরা এসে ব্রাশিয়াব ফ্যাক্টরি খুলেছে। জ্যামায়কানরা বলে উঠলো অপারেশন শোলডার স্ট্রাপ্স্।...মিঃ হক্ হাসে আর বলে,—বাজারে বাজারে যদি যান কর্তা, অপারেশন শোলডার স্ট্রাপ্স্-এর পাহাড় দেখে বলবেন এটা অপারেশন আপ-লিফট্।...

আমি জোরে হেসে বলি—জ্যামায়কানরা সত্যিই রসিক।

তা যাই বলুন কর্তা,—জ্যামায়কায় যে হারে আমরা রাজনীতি চালাচ্ছি আপলিফট্ হচ্চেই বলতে হবে। চারধারে চেয়ে দেখলেই দিব্যি মালুম হবে এ আপলিফট্ জ্যামায়কার রূপ বাড়িয়েছে! মানতেই হবে কর্তা। দেখুন না চেয়ে।...

জ্যামায়কায় রাজনীতি ভারী বেভ্রাট-দার, তাই মজাদার। এদেশে সাদা-কালো তত্ত্ব নেই; রংদার রাজনীতিও নেই। চীনী, ভারতীয়, আফ্রিকান জোট-গোল, বা হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টান গণ্ডগোলও নেই। তবে রাজনীতি পাকে কিসে? সেটা পাকার একমাত্র উপায় তা হলে রয়ে গেলো পবিত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামে,—অর্থাৎ সর্বজোড়া এবং সর্বহারার লড়াই। ক্যারাবিয়ানে এ লড়াই সর্বনেশে লড়াই। এ লড়াই ক্যারাবিয়ানে যে মাথা চাগাবে, সেটা দাঁড়াবে আম্রিকী জীবনধারা এবং অনামিকী জীবনধারার সংগ্রাম। এবং ক্যারিবিয়ানে থেকে, অনামিকী জীবনধারার সঙ্গে বাদ করলে সেটা হয়ে দাঁড়ায় জলে থেকে আর্দ্রতার সঙ্গে বাদ। অর্থ হয় না তার।

বাকী রয়ে গেল তবে কুরু-পাণ্ডবের বাদ। অথাৎ জাতি শত্রুতা, ভায়ে ভায়ে লড়াই। মণ্টেগু এবং ক্যাপুলেটদের লড়াই।...এবং ঠিক সেইটাই ঘটেছে। জ্যামায়কায় মণ্টেগু বলতে বুস্টামাণ্টে, এবং ক্যাপুলেট বলতে নর্মান ম্যানলী। রক্তের সম্পর্কে দু-জনে মামাতো পিসতুতো ভাই! মাণিকজোড় বললে যেমন অনুরূপতা বোঝায়, মণিকাঞ্চন

বলতে বোঝায় অপরূপতা। আদায়-কাঁচকলায় কেন যে লোকে বৈরূপ্য দেখে জানি না; রাঁধতে জানলে উত্তম। তেলে-জলে মিশবে না। সাপে-বেজীতে দেখা হলেই নিত্য বৈরী। বুস্টামাণ্টে এবং ম্যানলী জ্যামায়কা পাউণ্ডের এ-পিঠ ও-পিঠ। বৈরূপ্য সত্ত্বেও অনিবার্য এবং এক। এককে বাদ দিয়ে অন্যটিকে চালাতে গেলেই জ্যামেকী রাজনীতির মেকীত্ব ধরা পড়ে যাবে।

বুস্টামাণ্টের চেহারা, উস্কো-খুস্কো গোয়টে, বেঠোফেন মার্কা মার্কসবাদী চুল; ঢিলে ঢালা রুশীয় দর্জিত্বে অতিকায় সাজ-পোশাক; কথায় কথায় আগুনের ফুলকী, গুলি-গালা (দুটিরই) দুম-দাম, মঞ্চের ওপর গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গের সর্বনাশা হানা; সাঙ্গোপাঙ্গোরা সবাই সর্বহারা সর্বনেশের দল। মানুষটার সাক্ষাৎ হবে ক্যুবার ক্যাস্ট্রো, গায়ানার ছেদী জগন, ঘানার এন-ক্রুমা কিংবা যুগোশ্লাভিয়ার টীটো। দেখলে তাই মনে হবে। ভাষণ শুনলেও। কিন্তু মানুষটা এসবের আড়ালে আসলে বুনিয়াদ প্রিয়! যেন সাপ্রু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, রাজাজী।—আমেরিকার দোস্ত এবং ধীর-প্রগতি। বাণিজ্য-রাসায়নিক। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি, এবং তন্নিবন্ধন আমেরিকার সঙ্গে প্রীতি বন্ধন, এই সবই এঁর লক্ষ্য। লোকটার জন-আবেদনতা অবিসম্বাদী। শোনা যায় শ্রীমান হিটলার এবং নেপোলিয়ানেরও ঐ গুণটি ছিলো। গুণ-বিচারে যাই হোন, মানুষটার জনপ্রিয়তা অসাধারণ।

ঠিক বিপরীত ঐ নর্মান ম্যানলী। রোড্স্ স্কলার; চুস্ত্ ইংরিজী শিক্ষায় মোড়া একখানি স্বাস্থ্যবান জিন্না সাহেব। সুট টাই, সু হ্যাট—প্রত্যেকটি বণ্ড-স্ট্রীটের স্বাক্ষর করা।—কিংগস কাউন্সেল। মার্জিত রুচি। মর্যাদা পুরুষোত্তম।—বামপন্থী। কত বাম? যতটা পারা যায় দক্ষিণকে বাম না করে। তাঁর ভাষায় '...as far left as possible without reaching violence or revolution but entirely un-connected with the Communist party.'

ম্যানলী বিবাহিত। পত্নী ইংরেজ। বুস্টা চিরকুমার; বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়ে এই সিদনে জ্যামায়কা স্বাধীন হবার পর, বিয়ে করলেন বৃদ্ধা সেক্রেটরী গৃহকর্ত্রীটিকে। তিনি জ্যামায়কান। স্মরণে রাখতে হবে যখনই জ্যামায়কায় 'রেস-রায়ট' হয় শ্রীমতী ম্যানলী প্রমাণ করেন যে তাঁর রক্তে আফ্রিকানধারা প্রবহমান। [...ম্যানলীর ছেলে মেয়ে আছে। সুতরাং কথাটা অর্থগতভাবে খুব অস্পষ্ট নয়]। চার্চিলও তো প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি রুজভেল্টের 'কাজিন'; প্রায় আমেরিকানই বলা চলে।—'কার্যকালে সমুৎপন্নে অর্থং' যাঁরা তাজাতি তাঁরাই গুণীজন।

রেস-রায়ট জ্যামায়কার এক নৈমিত্তিক আচরণ। নিমিত্ত পেলেই চড় চড় করে চাগিয়ে ওঠে। পোর্ট রয়্যাল যবে থেকে ডুবে গেলো, কিংসটন হলো রাজধানী। কিন্তু অতি-কুখ্যাত পোর্ট রয়্যালের মাধুকরী রসবাহিরীরা, রস ব্যবসায়ীরা, রসিক জনেরা, বিনোদিনী-পাড়ার খেল-তামাশার জুয়ার ভাঁটী লাগানেওলারা—সকলেই লেগে রইলো ডুবো পোর্ট রয়্যালের আঁচল ঘিরে। সেই পোর্ট রয়্যাল থেকে কিংসটনের

এবং কিংসটনের পাড় ঘেঁষে, পশ্চিমে, স্পানিশ-টাউন ভরতি সমাজের উপচে পড়া মাল ঘনবসতি করে আছে।

এ ঘনবসতি তাদের, যাদের স্থান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল যুগের আগে ছিলো জোন্দারদের খামারে; এবং ইনডাস্ট্রিয়াল যুগের পরে এসে বর্তেছে বস্তি নামক গুলজার নরকে। জ্যামায়কায় বস্তি-জাত প্রকট। কলকাতায় বম্বেতে বস্তি-জীবীরা বস্তি ছাড়তে নারাজ। এখন সরকার অনুধাবন করতে পেরেছেন বস্তি-বাসের মাধ্যমে বহু ধরনের ব্যবসায় এমন ভাবে চলে যে বস্তিজীবন উঠিয়ে দেওয়া চলে না। পুঁজিবাদ বাঁচিয়ে রাখতে গেলে বস্তিবাদ বজায় রাখতেই হবে। তাই ওটা সরাবার গা নেই। বস্তিতে থাকাটাই কোনো পাকা ব্যবসায়ের পক্ষে অনিবার্য উপকরণ; কোনো কোনো পাকা জীবীকার জন্যও এ জগৎটি এক অনবহেলনীয় আয়ুধ। শোনা যায় উগ্র সমাজকর্মী, রাজনৈতিকরা সচিন্ত যদি বস্তি উঠে যায়, তাঁদের সেবার ক্ষেত্র কোথায় থাকবে? গঙ্গা শুকিয়ে গেলে পাপ ধোবো কোথায়? শোনা যায় বহু সমাজকর্মী বেশ্যার টিয়া পোশার মতো, বিড়াল-রসিকা বৈষ্ণবীর মাছ জিউনোর মতো বস্তি বসিয়ে দয়া এবং সেবার হাট খুলে দেন। সমাজ-সেবাকে রাজনীতির সদর দরওয়ান কবে রাখেন।

যত্র ভোট তত্র স্লাম, বস্তি। জ্যামায়কায়ও বস্তি পালন রাজনীতি লালনের অপরিহার্য অঙ্গ। পোর্ট রয়্যাল স্পানিশ টাউন ছাড়াও পাহাড়ের আশেপাশে এ সব পাওয়া যাবে। এদের চিরন্তন জীবনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দুটি আরও দল। রাসতাফারী এবং মারুন। ১৯৮০-তে জ্যামায়কায় গিয়ে দেখলাম সারা জ্যামায়কা বস্তি হয়ে গেছে।

রাস—কথাটা আবিসিনিয়ার কথা। ইতালী যখন আবিসিনিয়ায় হামলা হানলো (অক্টোবর ১৯৩৫) তখন আনন্দবাজারে রাস দেস্তা, বাস-কাসা-রাস সীয়ুম-এর নাম চড় চড় করে উঠেছে। প্রায় খালি হাতে লড়েও আবিসিনিয়া সভ্য ইতালীকে বাধ্য করেছিলো মাস্টার্ড গ্যাস দিয়ে যুদ্ধ করতে।

সে কথা পরে, রাসতাফারীর কথার সময়ে বলা যাবে।

বলা হচ্ছিলো জ্যামায়কা রেস-রায়টের আড়ৎ, সুতরাং এক ধরনের রাজনীতির রাস-তলা, পঞ্চবটী যা বলা যায়। সে রাসতলার জগাই মাধাই বুস্টা এবং ম্যানলী। সে পঞ্চবটীর তাল-বেতাল বুস্টা এবং ম্যানলী।

দুনিয়ার তাবৎ গুণ্ডাকল্প প্রখ্যাত প্রখ্যাত পালের মধ্যে রাঙা রাঙা রক্তঝরা নাম বেদুঈন, মারুন, গোচো, কসাক্,— ভারতের পুর, আফ্রিদী, মেয়ো। নামকরা ব্যেদ্‌ড়া নেশাখোর আলজিরিয়ার হাশীস্-নবীশ, প্রাক্ মাও যুগের চীনের চণ্ডুনবীশ, বর্তমান আমেরিকার L S D-নবীশ, মেক্সিকোর কোকেননবীশ, সভ্য য়োরোপে মার্ফিয়া-মেথিল-বেঞ্জিন-ইকোডাইন-নবীশের দল। হে পাঠক, শ্রীমান জ্যামায়কা এই সব পতিতপাবন নামাবলীর সহস্রদল কমলের মধ্যস্থ একটি অখণ্ড বৈকুণ্ঠ নাম। লাপরোয়া পোকাম্যানিয়াক্, প্যারিস গলিবাসী গারভীষ্ট দরবেশ, পঞ্চরং-উপাসক তাবীজ-মাদুলী-কবচ তান্ত্রিকের দল,

চোখ চেয়ে বশীকরণের দল, বেদুঈনপন্থী দুমদাম লুটেরার দল, মারুন, রাসতাফারী—যে কোনো একটা, যে কোনো একটি দেশের সভ্য দেহে গ্যাং-গ্রীণ।—একা জ্যামায়কায় এ গ্যাংগ্রীণের গ্যাং কে গ্যাং। সেখানে রায়ট কেন হবে না?

ড্যাঙ্গা জায়গার নাম ডাঙ্গেল। পূর্বে নাম ছিলো ডাঙ্গহীল্ অর্থাৎ আস্তাকুঁড়, হেগোড্যাঙ্গা। অংরেজরা রেললাইন কবার অজুহাতে পাহাড়টিকে চষে পালেস্তারা করে দিয়েছে। তবু সেই গাঁয়ের নাম আজও ডাঙ্গহিল্। লোকে বলে ডাঙ্গেল্।

১৯৫৭-তে তখন পরিবার সাথে। দাদলানীর বন্ধু সুরজপ্রসাদ বললেন, ভশ্চাজ্ স্যার পোর্ট রয়্যালে গেছেন, খুব। স্পানিশ টাউনে গেছেন, সো-ভী বহুৎ খুব। কিন্তু ভাবীজীর কসম্, খবরদার ডাঙ্গেলেও নয়, মারুন পাহাড়েও নয়। ওরা খুনে। ও পাড়ায় কাবুককে ঢুকতে দেয় না। সে বাবদে হর রোজ গোলাগুলি লেগেই আছে। খয়াল রাখবেন।

তা সত্য। গত দশ বছরে একত্রিশ বার ধুন্ধুমার রাসতাফারি হামলা হয়ে গেছে জ্যামায়কায়। অর্থাৎ নেহাৎ সর্বহারারা রে-রে-রে-রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পুলিশি ফৌজ এবং ফৌজী পুলিশের ওপর। ওদের দুশমন 'অর্গানাইজেশন', যার মিথ্যে নাম 'সরকার' বা 'গবর্মেণ্ট'। ওরা বলে "অর্গানাইশেন অব (সত্য বিশ্বাস) ফেইথ্ এগেন্স্ট্ অর্গানাইজেশন অব (ধোখাবাজ হাম্বাগ্) ট্রিজ্ন্"।

সেই ডাঙ্গেলে আমি যাবো না তো দিল্লীর তক্ত-এ-তায়ুশ ছেড়ে এলাম কেন? মৌকা মিলেছিলো ১৯৭২-৫। কেনী টপ্স জিন্দাবাদ। সে আমার নরক দর্শনে প্রতিহারী।

কদিন ধরে কেনী টপ্স্কে টিপস্ দিচ্ছিলাম। সর্বাঙ্গে ওর চুলকোনা। আমারই দেওয়া ছেঁড়া শার্টটাকে দুরাতেই শতবৎসরিত করেছে। পরনের খাকী হাফ প্যাণ্টটা কোয়ার্টার প্যাণ্ট অবস্থায়ই পেয়েছিলো। উপস্থিত দুটি জানলা হয়েছে সেই কোয়ার্টারে। জানালা দুটিতে 'ডেলী-গ্লীনার'-এর পর্দা লেবুর কাঁটা দিয়ে গাঁথা। মাথায় একটা আলুমিনিয়াম রংয়ের লোহার শিরস্ত্রাণ। প্রচুর মদ্য খায়। নিত্য রাতে সঙ্গিনী যোগাড় করে নেয়। কিছু বললে বলে, ও তুমি বুঝবে না। ভণ্ডরা সত্যকথা বোঝে না। শরীরের গঠনে ইস্পাতের বল। আমাকে 'কুলী-সার' বলে। কী অর্থে বলে জানি না। কারণ কেনীর ভাষা যখন যা ইচ্ছে। খুব মনোযোগ করলে ইংরিজী জানা লোক কিছু কিছু বুঝতে পারে।

কেনী বল্লে, নে যাবো। তবে ফিরিয়ে আনবো না।

জীবনে এই প্রথম গুরু পেলুম যে মোক্ষ কবুল করে পথ দেখাতে চায়। এ মৌকা হাত ছাড়া করি, এতো পাপ আমিও করে উঠতে পারিনি।

দুপুর। ভরা দুপুর। কিংসটনের পশ্চিম নরকের রেললাইন পার করে কয়েকটা সামঙ্গ গাছে ঢাকা টিবি পার করতেই মস্ত চত্বর। রাজ্যের নোংরার ঢেরি। সব চেয়ে আগে মনে হয় ভাঙা মোটরের কবরস্থান নাকি? অতঃপর বোঝা যায় মোটর, বাস, ট্রাকের বদৌলত একটা বসতি গড়া। মাটিতে ঢোকানো বডীর পর বডী। ছাদ কেটে

চোঙ্গ-চিমনী; কাঁচ ভেঙে দরজা। গোটা দুই তিন বড়ী মেলালে পুরো বাড়ি। প্রতি দরজায় খবরের কাগজের, প্যাকিং বাক্সের ঝোলাপর্দা। "ডেঞ্জর জোন"; "হেলস্ গেট্"; "ডেথস্ হেড"; "ডুমস্ গ্রেভ্"; "হেক্যুবা"—প্রভৃতি লোভনীয় নাম প্রাসাদগুলোর। বুকের রক্ত জল করা "সত্যি তোমায় খাবো না!"—সুরে ডাক। বাঁশের পর বাঁশ পোঁতা। পতাকার পর পতাকা। তিন রং—সবুজ হলদে লাল। হেইলে সেলাসীর পতাকা। রাসতফারীর পতাকা। নীগাস-এর আবিসিনিয়ার পতাকা। "এটা আবিসিনিয়া; জ্যোমায়কা নয়।" বলেছিলো রাসতাফারী-মেমেল্যাক। জোনাথান মেমেল্যাক।

আমি বললুম, তবে যে জ্যামায়কার ম্যাপে দেখি—

শেষ করতে দেয়নি আমার কথা। বলেছিলো, ও সব ইংরেজদের ষড়যন্ত্র। শাদারা কালোদের ভয়েই শাদা। তাও জানো না?—জানবে কোত্থেকে! তাড়িয়েছে তো ইংরেজ।

জোনাথান মেমেল্যাক সেদিন কোথা থেকে ধরে এনেছিলো দুটো পাঁঠা। চুরি করেনি। ওরা চুরি করে না। কেবল না বলে নিয়ে আসে। যাদের নেই তারা নিয়ে আসে যাদের আছে তাদের কাছ থেকে। নৈলে যাদের নেই তাদের চলে কী করে? সহজ হিসেব। থাকতেও যারা আরও নেয় তারাই যথার্থ চোর। এ ডেফিনিশানে শান যথেষ্ট। তাবৎ আপত্তি কুচ করে কেটে যায়।

আগে আগে লোকে বাধা দিতো। ভাবতো পুলিশ কিছু করবে। পুলিশ বলে কি আর জানের ভয় নেই? সুতরাং তারাও পুলিশ-তদন্ত চালাতো। খবরও আনতো। কিন্তু যাকে খবর দেবে সেই হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ। অতঃপর রাসতাফারী না 'বলিয়াই' জিনিস আনে কিন্তু চুরি করে না।

পাঁঠার ঠ্যাং কেটে টুকরো করে করে কলাপাতার ওপর মাংসের চাঁই করে রাখছিলো।

কেনীকে দেখেই বললো, ও কেন? ও কে?

আশ্চর্য, কেনী পালটা প্রশ্ন করলো, কে?

জোনাথান কাটলাসখানার ডগা দিয়ে দেখিয়ে বললো, কুলী ম্যান্।

আমি ভাবি, সর্বনাশ! অথচ নির্বিকার কেনী বললো, কে? কার কথা বলছো? সঙ্গে তো কেউ নেই।

আমি যে 'নেই' এ কথা শোনার পর নিজের গা নিজে চিমটি কেটে দেখতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু তখনকার মতো চুপ। যা চলছে চলুক।

এই তল্লাটে আসবো বলে দাড়ি খোঁচা খোঁচা করেছি। ছেঁড়া চপ্পল দড়ি দিয়ে বেঁধে পরেছি। যে প্যান্ট পরেছি তাতে আগা ছিলো না, পাছাও ছিলো না—যদিও দেখা যাচ্ছে না। তলাটাই আব্রু রাখছিলো, তবে নিজেকে রাখতে ভারি বেগ পেতে হচ্ছিলো। —গায়ে আমি বিছানার চাদর জড়িয়ে, নেওয়ারের ফিতে দিয়ে বেঁধেছি। মাথায় নৌকো মতো করে খবরের কাগজের টুপী।

সঙ্গে সঙ্গে কাটলাসখানা মারলো ছুঁড়ে জোনাথান। আশ্চর্য ক্ষিপ্রহাতে কেনী ধরে ফেললো। বললো,—কার গায়ে কাটলাস মারিস? ও গাঁজার দেশের লোক। হিমালয়ের

লোক! রাসতাফারির গপ্পো শোনবার জন্য আনলুম। সঙ্গের নয় ও। এক শরীরে অনেক জায়গায় একসঙ্গে থাকে।

আমি বলি, আমার দেশে আমরা গাঁজা টানি লম্বা চিল্‌হমে। তোমরা খাও কাগজে মুড়ে। সিগারেটে ভরে। ওতে শিবঠাকুর রাগ করেন। খাবো তো 'পট্'।

আবিসিনিয়া এবং শিবঠাকুর, চড়ক এবং নাথপন্থের গল্প বলতে বলতে জোনাথানকে আমি প্রায় হালুয়া করে ফেলেছি।

জোনাথান কিন্তু অবাক, আমি গাঁজা খাই না শুনে। মদও না'। আমি বিয়ে করেছি শোনার পর আমি পাঁঠা কিনা ভাবলো। কিন্তু পেঁঠো গন্ধ না পেয়েই বোধকরি কাটলো না। বললো, কী করা হয় শুনি?

করতুম মাস্টারি। উপস্থিত কিসসু না।

মাস্টারি করা আর কিসসু না করার মধ্যে সহজ কোনটা?

মাস্টারি।—দ্বিধা না করেই জবাব দিলুম।

কিসসু না করার চেয়েও—

ওরে বাবা। কিসসু না করা ভারি কঠিন। স্বয়ং রাসতাফারি ছাড়া—

রাসতাফারিকে দেখেছো?

নিশ্চয়। তবে সে আজকে নয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে। মে মাস। এন্‌তোতো পাহাড়ের গির্জায়। তখন অজ্ঞাতবাসে মগ্ন ছিলেন। পাঁচ বছরের মাথায় আদ্দিস আবাবায় ফিরবেন বলেছিলেন এবং ঠিক ফিরেছিলেন।

কেন গিস্‌লেন আদ্দিস আবাবা ছেড়ে?

সেই যে ইতালিয়নরা--

সর্বনাশ। জোনাথান কাটলাস ঘুরিয়ে দাঁড়ালো।—তুমিও? চোখে দেখেও তুমি এই বলছো? ইতালী হেইলে সেলাসীকে তাড়িয়েছিলো তুমি বিশ্বাস করো? তা হলে তো এও বিশ্বাস করো যে তার দেশবাসীরা তাকে বন্দী করে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। সে মরে গেছে। খবরের কাগজগুলো আজকাল ছাগলেও খায় না। আর তুমি সেণ্ট কুলিস্বামী, তুমি বিশ্বাস করো?

ছোঃ! তা হলে কি দেখা করি? বিশ্বাস কেন করবো?

তাই বলো; আমি ভাবলুম বুঝি শাদাদের বলা মিথ্যে কথাগুলো তুমিও বিশ্বাস করো। তুমি হলে কুলি-সোয়ামী।

করলে তো আমিই শাদা হতুম। তবে কি জানো ইংরেজরা কেবল বলে ওরা নাকি হেইলে সেলাসীকে সাহায্য করেছিলো।

সে তো ওরা এও বলে যে আমরা নাকি জ্যামায়কায় আছি। ওরা এও বলে যে এই ডাঙ্গেল ওদেরই তল্লাট। শাদাদের বিশ্বাস কোরো না। ওরা সব কিছু বলবে। তাই বলে মানতে হবে? ওই দেখো ঝাণ্ডা। হলদে-কালো। হেইলে সেলাসীর ঝাণ্ডা। লায়ন অব জুডা। ওঁর ঝাণ্ডা বলেই তো উড়ছে। ওঁর মুল্লুক নৈলে ঝাণ্ডা উড়তো

কী? ইংরেজ বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস করবে পি-এন-পি-র ম্যান্‌লীকে। আমরা ম্যান্‌লীকে জানি।

আমি সেদিন সারা সন্ধ্যা ছিলুম ওদের সঙ্গে। আমার দেশের মতো করে মাংস রেঁধেছিলুম। ওরা খেয়ে বিশ্বাস করলো আমি সত্যিই সোয়ামী অব দি ঈস্ট।

টিনের কানাস্ত্রার ওপরে বসে, কেরোসিনের 'ফ্লাম্‌বো' (কাঁচের বোতলের মাথায় পলতে গুঁজে আলো) জ্বালিয়ে কেবল মাংস। সঙ্গে ক্যাসাভা এবং ব্রেডফ্রুট সেদ্ধ।

ঘরে ঘরে হেইলে সেলাসীর ছবি। আজও। হেইলে সেলাসী বন্দী হয়ে আছেন··· ওরা বলে প্রপাগাণ্ডা। তিনি ঋষি। সাধনে বসেছেন। হেইলে সেলাসী মৃত। ওরা বলে শাদাদের ষড়যন্ত্র। বিশ্বাস করাও পাপ।

আমি বলি তোমরা তো আবিসিনিয়ান বলে বোধ হচ্ছে না। তোমরা তো আফ্রিকান। ইথিয়োপিয়ানরা তো সেমেটিক।

ঐ আর এক পর্ব! শাদাদের কীর্তি। নৈলে কি আমরা গড সেভ দি কুইন্‌ বলতুম না? বলি কি? কোনো শালা বলাতে পেরেছে? এই যেখানে এই থুথু ফেলছি, পবিত্র ইথিওপিয়া। তোমাকে বলছি আমি এই ইথিওপিয়ায় নেগাস নিজে আসবেন। একবার এসেছেন। বার বার আসবেন। তাঁর দেশ তিনি নেবেন। আমরা তাঁর শ্রীচরণতলে বসে গান শোনাবো। আমরা কম্যুনিস্ট। আমরা হেইলে সেলাসীকে রাজা করবো।

প্রত্যেকের দাড়ি। কেন? হেইলে সেলাসীর আছে।

প্রত্যেকের পিছনে ক্লোক ঝোলে কেন? হেইলে সেলাসীর ঝোলে।

প্রত্যেকে কুকুর পোষে। কেন? হেইলে সেলাসী পোষে।

লায়ন্‌ অব জুডার এমন অনুগত শিষ্য সহজে হয় না।

১৯৬৬ সনে হেইলে সেলাসী এলেন ক্যারাবিয়ান পরিদর্শন করতে। স্বাধীন জ্যামায়কায় তখন বুস্টামান্টের রাজত্ব। তিনিই প্রধানমন্ত্রী· হেইলে সেলাসীর অভ্যর্থনাতে ম্যান্‌লী-প্রিয় রাসতাফারিদের কিন্তু ডাকা হয়নি। না হোক। বিরাট দল এসে যখন দাঙ্গা বাধিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিল, সে যেন দক্ষযজ্ঞে গণেদের হুল্লোড়; এবং আবিসিনিয়া শিব ঠাকুরের আপন দেশ। হেইলে সেলাসী স্বাধীন আবিসিনিয়ায় আসবেন; জ্যামায়কায় স্বাধীন আবিসিনিয়া আছে। তার নাম ডেঙ্গেল। হেইলে সেলাসী এসে প্রমাণ করে গেলেন, ডেঙ্গেলই আবিসিনিয়া।

রাসতাফারিয়ানরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের আটকে রেখে একটা আত্মকেন্দ্রিক উপলব্ধি চায়। সেটা বৈকুণ্ঠ হতে পারতো, সহস্রার হতে পারতো, কৈবল্য হতে পারতো। Wisdom weed-এর প্রাসাদে তারা অবক্ষয় থেকে অবক্ষয়ে যতো নেমে যায়, ততো জ্যামোগা হয়ে ওঠে অনুভূতির একটি চরম উপলব্ধি,—আমরা স্বাধীন। 'স্বাধীন' কথাটার কী মোহ। কী লোভ। যুগ যুগ ধরে গাঁজাপিয়াসী একটা দল স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখলো।

ভেসে আমেরিকার মহাদেশ থেকে এসে এই সব দ্বীপে বাসা বেঁধেছিলো। তাদের বাধলো দারুণ সংঘাত নরখাদক কারিবদের সঙ্গে। তারা ছিলো আরাওয়াকদেরও আগেকার বাসিন্দা।

মানুষ যারা খায় মানুষই তাদের খেয়ে ফেলে। কারীব এই নীতির ফেরেই নিঃশেষ হয়ে গেলো। এলো পর্তুগীজ দস্যু। এরা বিনা বিচারে নিরীহ আরাওয়াক ধ্বংসে মন দিলো। অবশ্য এরা ছিলো সভ্য। মানুষ খায়নি। শুধু মেরে ফেলেছিলো। কিছু অস্ত্রে, কিছু বসন্তে, কলেরায়, উপদংশে, যক্ষ্মায়—মানে সভ্য সভ্য রোগে। আরাওয়াকরা অসভ্যভাবে মরেনি। মরার আগে এমন কি খ্রীস্টধর্মও গ্রহণ করেছিলো কেউ কেউ। পৃথিবীর বাস শেষ হয়ে গেলেও স্বর্গে অবশ্যই গিয়েছিলো তারা।

বলছিলো প্রতিমা। মন আমার উধাও হয়ে যায়।

ওরা থাকতো ব্লু-মাউণ্টেনে। দায়াবোলা পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে। মধুছন্দা গাঁয়ে বাসা বেঁধে। প্রতিপক্ষ কারীবদের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও সভ্য বোম্বেটেদের হাতে ওরা হয়ে গেলো নিশ্চিহ্ন।

সে সব গাঁয়ের বাসা ছিলো পাখির বাসা, বাঁধা বাসা, ভালো বাসা,—বাড়ি নয়। বাসার মতো বাসা। কারীবের রক্তে তখন ওদের রক্ত ঠাসা। এখন যারা আছে, থাকে, আধবুনো, সভ্য, খ্রীস্টান, তারা হয়ে গেছে জ্যামায়কান। তবু আরাওয়াক রক্ত।

তখন হঠাৎ গিয়ে পড়লে ওরা অনাবৃত দেহ নিয়ে পালিয়ে যেতো। এখন পালায় না। দেহেও আবরণ জুটেছে। মিথুনে মিথুনে জড়াজড়ি করে হারিয়ে যেতো হরীতের গভীরে, লিয়ানো-লতার দোলমঞ্চে, পাখির ডাকের আশ্বাসে; মাক্কাও পাখার প্রবাল-চুনী-মরকত-বৈদূর্য ঘষা বর্ণের বিভ্রমে; জলপ্রপাতের নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুল আর্ত-গুঞ্জনে,—হারিয়ে যেতো পালিয়ে যেতো মিশে যেতো! কিন্তু সব ঘুচে গেলো। আর তাদের দেখা যায় না।…যেমন দেখা যায় না "কুমারসম্ভবের" অপ্সরা-কিন্নরদের, যক্ষ-গন্ধর্বদের।

পা টিপে টিপে, মনের গলির পথ বেয়ে বেয়ে, অল্পে অল্পে, থেমে থেমে, ইতিহাসের পাতার পর পাতায় চিহ্ন রেখে রেখে এগিয়ে যেতে হবে; গহনে, কান্তারে, অরণ্যে, উপত্যকায়,—ঘুমোনো বালির বুকে, তন্দ্রালু কল্লোলিনীর গভীর কেশে আঙুল বুলিয়ে, ছ্যাংলা ধরা পাথরের মখমল গায়ের মৃদুতায় স্পর্শ রেখে, আলো-ছায়া দোলা বনের মনখানিকে ভালবাসায় রাতুল করে দিয়ে—একটু একটু করে পদাতিক মনকে নিয়ে যেতে হবে কন্দরে কন্দরে।… কালের কন্দরে; ইতিহাসের স্তব্ধতায়; অতীতের অন্ধকার মসৃণ অবচেতনে।

তবে দেখা যাবে হ্যামকের দোলা। বাঁশে-কালাবাসে গড়া, আঁতের তাঁত বাঁধা একতারা পিড়িং পিড়িং করে। কুন্ কুন্ ক্কাঁও ক্কাঁও করে আরাওয়াক তরুণ শুয়ে শুয়ে বাজিয়ে চলেছে সেই সুর যা তার তরুণী সহচরী শিখেছে অরণ্যের তাল-তমাল-পিয়াল-ঘোরা ওরিওলের কাছ থেকে। দেখা যাবে সামঙ্গগাছের তলায় পাথর নুড়ির ওপর শিংয়ের-শামুকের-ঝিনুকের-হাড়ের-প্রবালের ঘুঁটি দিয়ে আরাওয়াক যুবক যুবতী খেলছে দশ-

পঁচিশ—দেখা যাবে কোনো মধুর অপরাহ্নে অরণ্যের বুকে লুটিয়ে পড়া এক ঝলক সূর্য-অবকাশের চত্বরে বালাতা-আঠার বল নিয়ে খেলা করছে আনন্দবিহ্বল এক ঝাঁক সদা-বিহ্বল মৃদু মন।

…ওরা কাজ করতো না। শুধু বাঁচতো। ওরা খাটতো না। ফুর্তি করতো। ওরা মৃত্যুকে মেনে নিতো তীর ফুরুলে সমুদ্রের মতো। ওদের পরিশ্রম ধুয়ে যেতো মধু-চোয়ানো মদ্যে; ওদের ক্ষুধা মিটে যেতো ফলে, মূলে, মাছে, মাংসে। ওদের ছিলো না সঞ্চয়, ভয়, আড়ম্বর, হিংসে; ছিলো না বিবাহ; ছিলো না বিচ্ছেদ। ওদের ভালোবাসায় ছিলো খাদের বদলি স্বাদ। ওদের পরাক্রমে ছিলো রুদ্রতার বদলি ভদ্রতা। বিজয় ওরা আস্বাদ করেছে ক্ষমার পাত্রে; উপার্জন ওরা ভোগ করেছে বাঁটোয়ারার সদর দরজায় বসে। ওরা আলস্যকে মধুর করেছে উৎকণ্ঠাবিহীন করে; প্রেমকে বিধুর করেছে সন্দেহবিহীন করে; বনবাসকে অখণ্ড স্বাধীনতায় উন্মত্ত করেছে অধিকারবিহীন করে। কোথায় তারা হারিয়ে গেলো উপনিবেশের, বাণিজ্যে বিরুদ্ধ সংগ্রাম-রক্তিম অরণ্যে?

…পামের পাতায় ঢাকা নিকুনো মেঝের চারধারে বেতে কোকোরীতের পাতায় দেয়াল ঘেরা সংকুঞ্জ স্বপ্ন। ওখানে ওরা শুতো যখন ভীষণ ঝড়ে জলে তামাটে চামড়াখানা বাঁচানো দরকার। নৈলে শিবা, পিসেন্তো, শিমুল, বালাতা গাছের ডালে ঝোলানো হ্যামকে দোল খেতে খেতে গল্প করবে মনের সাধে পোষা বনের পিয়া টিয়ার সাথে, মাত্র ভালোবাসার শেকলে, সোহাগের খাঁচায় যে টিয়া বাঁধা। বনের পাখি বন ভুলে জনের কাছে দুজনের বিজন চাইছে। মুখে গোঁজা দুহাত লম্বা পাইপের ডগায় রগরগে তামাক পুড়ছে; মাথার ধারে বসে আছে ওপোসাম একটা, চুল ঘোলাচ্ছে প্রিয় সাথী বনচর কিশোরটির। নদীর ধারে তীর ধনুক নিয়ে শিকার করছে মাছ। সমুদ্রের বুকে ডুঙ্গা নিয়ে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে আছে তিন ফুট লম্বা পোষা রীমোরা মাছ (Echenis Naucrates); নাকে তার সুতো বাঁধা। পেটের গায়ে চুষে ধরবার চাকতি। যেমন অক্টোপাশের থাকে। ডুঙ্গা থেকে ছেড়ে দেবে গোটা তিন-চার মাছ। সঙ্গে সঙ্গে তারা গিয়ে বসবে বড়ো মাছের গায়ে, বিশাল বিশাল কূর্মাবতারের গায়ে। রাক্ষুসে সেই শত-জোঁকের চোষণ-ময় চাকতির সারি দিয়ে সে জমে বসতো শত্রুর বুকে পেটে। তখন সুতোটি টেনে বড়ো মাছটিকে ধরা এমন কোনো কষ্টের ব্যাপার নয়।

পাখি শিকার করার সময়েও অযথা পীড়ন করেনি আরাওয়াক। শান্ত, নির্বিরোধী আরাওয়াক। ওদের ভাষায় 'ঝগড়া' কথাটার প্রতিশব্দ নেই; ওদের ভাষায় লোহা, তলওয়ার, ছুরি, ফলা-র প্রতিশব্দ নেই। ওরা চাষবাসের ধার ধারে নি। ওপোসাম, পেকেরী, আগুতি, রাকুন, মেছো-কুমীর, ইগুয়োনা, আর্মাডিলো—ওদের জঙ্গলময় ঠাসা। ধরে খায়। সে শিকার শিকারই নয়। খেলা।

…হাঁসের দল আসবে উইনিপেগ থেকে ব্রাজিলের দিকে যাবে চলে, বা ব্রাজিল থেকে যাবে নায়াগ্রার দিকে। এসে বাসা নেবে জ্যামায়কার জলায়, নদীতে, হ্রদে। আরাওয়াকরা জলে ভাসিয়ে রাখবে রাশি রাশি তিত্-কুমড়োর 'তুম্বা'র মতো 'কালাবাস'। হাঁসেরা নির্বিবাদী ক্যালাবাসদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাস করবে। তখন ক্যালাবাসে মাথা ঢেকে,

সারা গা জলে ডুবিয়ে, খোলের গায়ের দুটি গর্তে দুটি চোখ রেখে আরাওয়াক তরুণ হাঁসের দলের মধ্যে ঢুকে যাবে অজানতে। ত্বরিতে ভাসমান হাঁসের ঠ্যাং ধরে জলের মধ্যে সে ডুবিয়ে রেখে নিজের কোমরে হাঁসের পা দুটি গুঁজে রাখবে। কয়েক মিনিটেই যখন পাঁচটি পুরুষ্টু হাঁস সঙ্গে নিয়ে সে চলে যাবে তার গাঁয়ে,—হাঁসের দলে একটুও শিহরণ জাগবে না।

এমনিই শান্তভাবে ওদের জীবন চলেছিলো মানব-বিবর্তনের সেই আদিমকাল থেকে। কোন্ কুক্ষণে মহর্ষি পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার বুর্গীয়া ফতোয়া দিলেন, কাতারে কাতারে খ্রীস্টিয় সেনানী ঘোড়ায় চড়ে হানা দিলো এই নন্দন কাননে,—বিশ লক্ষ আরাওয়াক শেষ হয়ে গেলো এই সভ্য পদক্ষেপে মথিত ইতিহাসের পাকা গৌরবময় পাতাগুলো ভরাতে।

আজ সভ্য জ্যামায়কায় আরাওয়াক দেখাই যায় না। নেই-ই বলতে গেলে।

আছে সেই নীল-পাহাড়, দায়াবোলোর রমণীয় শৈলকান্তার, বুড়ো-খোকাদের যৌন বিলাসের জন্য শৈল-চূড়ার নীড়,—ধনীদের গড়া কামকল্পিত রস্যস্থলী বতাতুরা 'ভিলেজিয়াতুরা,'—আছে দেবদারু বন-চেরা বাতাসের দীর্ঘ শ্বাস, উত্তর তীরের গিরিপঞ্জর বিদীর্ণ-করা প্রস্রবণের পর প্রস্রবণের শত লহরীতোলা, ঝাঁপিয়ে পড়া রুপালী বিদ্রোহ তরঙ্গ; আছে বনেমাক্কাও; কুঞ্জে কুঞ্জে পারাকিৎ, তোতা, ঘুঘুর ডাক; নদীতে মাছ; মাটিতে ওপোসাম; গাছে গাছে দোলানো লিয়ানা লতা,—নেই একটিও আরাওয়াক। একটিও নেই। যারা আছে তারা মিশ্র। তবুও বলে আমরা আরাওয়াক।

হঠাৎ যে জঙ্গলটায় ঢুকে পড়লাম, সেখানে দেখি কোনো গাছ আর খাড়া নেই। সব শুয়ে আছে। কেবল মাঝে মাঝে "বিশালঃ শাল্মলী তরুঃ"। শিমুলের অতিকায় গুঁড়ি কুরে তৈরী হতো সাগর পার করা বড়ো বড়ো আরাওয়াক ডিঙ্গি। দাদলানীর বোন বলে,—"এবারকার হারিকেনে জ্যামায়কার অর্ধেকের বেশী গাছ গেছে।"—ঝড়ের পর ক্যারাবিয়ানের জঙ্গল দেখা একটা অভিজ্ঞতা।

মিস্ দাদলানীর কথা বলতে মনে পড়ে যায় ওরাকাবেসায় ওকোরিওস্ বীচে সমুদ্রের তলায় কোরাল-বনে সাঁতার কাটা। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বর্ণের ঝিলিমিলি; সমুদ্রের জল ভেদ করে আলো ঝিলিমিলি; বর্ণে বর্ণে প্লাবিত নানা মাছের নানা খেলার চমক লাগানো ঝিলিমিলি,—জ্যামায়কার এই কোরাল বন জ্যামায়কার ফ্যাশন মহালের কুলীন বৈদগ্ধ্য।

প্রথমবারে সব দেখা যায়নি। সেবার প্রতিমা আমায় নিয়ে ঘুরলেন। যতো বলি নায়পালের বিষে সিক্ত সেই 'একান্তাবাস' নরকটির কথা, ততো প্রতিমা বলে, জ্যামায়কার নরকই শুধু নেই পণ্ডিতমশায়। স্বর্গেও আছে।

হ্যাঁ আছে। প্রতিমাই আমায় চড়ালো 'রায়ো গ্রান্দে'র উন্মত্ত স্রোতে ভাসানো ভেলায়।

রায়ো গ্রান্দে—অর্থাৎ 'জবর-নদী'র আঁকা-বাঁকা প্রবাহটি জ্যামায়কার নীচের তলার গলিপথ বেয়ে অনেক 'র‍্যাপিড্স্,' অনেক জলা, অনেক বাঁশের বনে ছাওয়া, বেতের বাঁধনে বাঁধা, জঙ্গলের আবেশে ঘুমিয়ে পড়া, শিমুলের ছাতায় ঢাকা স্বপ্নলোক অতিক্রম

করে সমুদ্রে মেশে। সামান্য একটা ভেলায় চড়ে একটি সুঠাম নিগ্রোর নিরাবরণ দেহের পেশীর পিচ্ছিলতার ওপর নির্ভর করে সেই পথটি সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে পার করা এক রোমাঞ্চিত অথচ স্নিগ্ধ অনুভূতি।

সারা জ্যামায়কার অজস্র নদী এমনই দুরন্ত। যেন নদী সমাজের অনাবৃতা আদিবাসিনীর উদ্দাম লোল। অজস্র পাহাড়ের ভাঁজে অজস্র উপসাগরিক নিভৃত কোল। বালু সৈকতে অজস্র অবকাশ, অজস্র স্বাধীনতা।

এবং এ সবের পরিচয় পেলাম প্রতিমার দৌলতে। মেয়েটি মিতবাক, কারণ ওর দেহের ছন্দে ছন্দে মূক বাক্ চাতুরী। সব কিছু অস্পষ্টকে স্পষ্ট করে দেবার ক্ষমতা এবং যাদু ওর আছে।

তবুও তো মিস্ দাদলানী এ বয়সেও 'মিস্'-ই।

প্রতিমা শুনে জবর টিপ্পনী ছাড়েন ;—তাই নাকি ? আমি ভোজ্য হতে তবু রাজী। ভূরিভোজের পাত্রে আচার হতে রাজী নই। যে গোগ্রাসে আপনি বন-জঙ্গল, নদী-নালা, পাখি-প্রজাপতি গিলছিলেন তাতে আমি যে অবান্তর হয়ে গেলুম এটুকু বোধ আছে।

'ওঃ, কী আফসোস ; কী আফসোস !" মিসেস্ দাদলানী হালুয়ার রেকাব নামিয়ে দিতে দিতে টিপ্পনী ছাড়লেন।

"তবু তো মণ্টেগু-বে-তে যান নি মশায়"—বললেন মিসেস্ দাদলানী।

যাবার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু নাইপালের বর্ণন পড়ার পর থেকে মণ্টেগু-বে বাদ দিয়ে মনটিকে হালুয়ায় এনে ফেলাই মিষ্টতর অভিজ্ঞতা বলে মনে করি।

"আঙুর তেতো লাগলেই তখন সিন্ধী হালুয়া মিষ্টি গো ঠাকুর মশাই !"

কিন্তু তা নয়। মণ্টেগু-বে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাড়া যদি মাদাম তুস্যো-র মেরিলবোন রোডস্থ প্রদর্শনী শ্রেষ্ঠ কীর্তিমান পাড়া হয় ; এবং মণ্টেগু-বে পৃথিবীর মধ্যে প্রাণহীন শীতলতম পোশাকী পৌত্তলিকতা, যদি মাদাম তুস্যোর লণ্ডনস্থ প্রদর্শনী শ্রেষ্ঠ পুতুল-পাড়া হয়।

মণ্টেগু-বে ! Falmouth !!

কেনীর সাঙাৎ জোনাথান বলেছিলো তার গপ্পোর মধ্যে—শাদা বালিওলা সব সৈকতগুলোই শাদাদের একচেটে। তোরা জ্যামায়কান মরগে যা কালো বালিওলা সৈকতে।

কিন্তু উত্তর জ্যামায়কার নানান অখ্যাতি সত্ত্বেও এ বাক্য সত্য নয়। সব সুন্দর সুন্দর বীচ্গুলোই টাকার কুমীরের পেটে পড়েনি। সমুদ্রতীরেও হোটেলে হোটেলে ফ্যাশ গাঁথা হয়নি। বালির উপর দরজন দরজন কুৎসিত চর্বি-হিন্দোল জঙ্ঘা এবং গণেশ হোন্দোল ভুঁড়ি জাপটা জাপটি লটকা-লটকি করছে না।

প্রথম এই উত্তর তীরের কথা উঠলো দাদলানীর মনোরম বাগানখানার মধ্যমণি ইতালিয়ান মার্বেল বাঁধানো চত্বরের বুকে গভীর করে গাঁথা সুইমীং পুলে গা ভাসিয়ে দিয়ে। ভাসমান টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম জলে ভাসছে। আমরা আকণ্ঠ ডুবে বসে আছি

গাঁথা পাটাতনে। চা খেতে খেতে গল্প ওঠে বড়োমানুষী নিয়ে। দাদলানী শুধু কী একটা কথার জবাবে প্রতিমাকে বললেন, হ্যাঁ মাসে হাজার পাউণ্ড তো বটেই। কিন্তু সঠিক কেউ জানে না।

যারা দেয়, তারা তো জানে।—প্রতিমা দাদলানী বলেন।

প্রতিমার বন্ধু ডানকান হপকিন্স্ সেদিন সুইমীং পুলেই ভাসছিলো (ভাসছিলো না ডুবছিলো,—বা ডুবে ডুবে ভাসছিলো সঠিক বলা যায় না)। প্রতিমা কিন্তু খুব খুশী। ডানকান পাক্কা আমেরিকান। ডেট্রয়েটে এয়ার কোম্পানী আছে; টেক্সাসে তেল; ফার্ম আছে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলার আধখানা জুড়ে। ডানকান বাহামায় একটা দ্বীপে বাড়ি গড়ছে। শেষ হলেই প্রতিমাকে নিয়ে সে উধাও পৃথিবীতে যাত্রা শুরু করবে।—এই ধরনের একটা ছবির আস্তর দেয়া আছে।

ডানকানই বললো, তারাও জানে না প্রীটি!

কিন্তু তা কি করে হয়! বিল তো দেয়!

দাঁত চুষে আমেরিকান শব্দ করলো ডানকান।

বিল যারা করে তারা বিল পাঠায় কর্তাদের সেক্রেটারি-পাড়ায়। সেক্রেটারি সেটা ব্যাঙ্কের গর্ভে সঁপে দেয়। সে গর্ভে কতো পড়ছে, কতো বেরুচ্ছে;—সে মহামোহ কটাহের তল্লাস কে করছে?

দাদলানী বললো,—জায়গাটা কিন্তু মজার। যেন স্বপ্নপুরী। যেন অতিকায় একটা কম্প্যুটার। বোতাম টিপলেই লস্করী কুক-ওপ্নার থেকে নিয়ে লাক্সারী ইয়েস্ট পর্যন্ত, বা সদ্য উনুন থেকে বেরুনো কেক থেকে নিয়ে সদ্য সদ্য উরু থেকে বেরুনো উর্বশী পর্যন্ত, সব চার পায়ে হাজির। অথচ পাশ দিয়ে যাও শব্দটি পর্যন্ত নেই।—বিবেক পর্যন্ত কাঁপে না।

কথাটা যে কতখানি নির্মম সত্য কদিন পরে বুঝেছিলাম। ডানকান হপকিন্সের বন্ধু স্টীফান ম্যাক্রোভিশ। দুর্দান্ত পোলিশ রক্ত। আমেরিকার অতিখ্যাত ক্যাসিনো-কুবের। তিনি আছেন ফ্রেঞ্চম্যান্স্ কোভ্-এ। ডানকান এবং প্রতিমার আমন্ত্রণ মাছ ধরার ফূর্তিবাবদ। প্রতিমা আমাকে সঙ্গে নিলো। মানা শুনলো না।

বিরাট ভারী ক্রাইস্লারখানা যে পথ দিয়ে চলতে লাগলো তা মণ্টেগো-বে যাবার নৈমিত্তিক ট্যুরিস্ট-সহ রাজকীয় পথ নয়! সে পথে কখনও কোনো ক্রাইসলার চলেছে বলেও বোধ হয় না। আমি যখন বললাম এ পথেই যখন আসা তখন ক্রাইসলারখানা না এনে জাগুয়ারখানা আনলেই হতো।

পুনশ্চ সেই দাঁত-চোষার চুচুৎকৃতি!

তখন লক্ষ্য করলুম। পথ তৈরী আরও আরও অনেক বেশী খরচায়। ইচ্ছে করেই ওপরে ওপরে গ্রাম্যতা বজায় রাখা হয়েছে দামী গ্রাভেল এবং বিশিষ্ট ঘাসের মিশ্রণে। আরও লক্ষ্য করলাম দু ধারে জঙ্গল পাহাড়ের ঢল বেয়ে ওঠানামা করলেও জঙ্গলটা 'সাজানো' এবং 'পাতানো' জঙ্গল।

প্রতিমা বলে, ঠাকুর্দা সেবার জাপান থেকে এলেন। ফিরে গেলেন ট্যারা হয়ে। এ

জায়গা যার নাম কিনা ফ্রেঞ্চম্যান কোভ, জ্যামাইকা। এখানকার এক ফুট জমির দামে কিংসটনে একখানা বাড়ি হয়ে যায়। ডিনার ন' গিনি ; লাঞ্চ ছ' গিনি ; একটা ব্রেকফাস্ট চার গিনি। এক মাস ভিলা নিয়ে থাকার খরচ, মাত্র ভাড়া—হাজার পাউণ্ড।

কিন্তু মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এক খোঁচা রাঙ্গাপাথুরে পাহাড়ের নাক ঢোকানো রঙ্গও দেখা হাচ্ছে। সমুদ্রের ওপরে আকাশে গাঙচিলের পাক দেখা যাচ্ছে। ...আর দেখা যাচ্ছে ঘুমন্ত পথের পাশে দীর্ঘদেহ পাইন, মেহগনী, রাবার,—গাছের বনের আড়ালে ভাঙা-চোরা পল্লীর কঙ্কাল।...

...আর ভেসে যায় আমার অতীত-মন্থনী মনের পাখা ভর করে আমার সহজাত ব্যাদড়া গোমরাপনা। মানুষের প্রতি মানুষের নিছক অসূয়া, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি মানুষের নীরস অনীহা—এ যেন আমাব পেট্রলভরা স্নায়ুকোষে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার সর্বস্ব দাউ দাউ করে জ্বলে, আমার অন্তঃকরণ চিৎকার করে ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আমি যেন রাজপথের ধুলোর শরীক হয়ে যাই।

...এই ফ্রেঞ্চম্যান কোভ্, গায়না-কোভ, ডাচ-ডিম্পল্স, হানিমুন কোভ—এরা যতই গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকুক পাহাড়ের প্রচ্ছন্নে,—প্রকাশ্যে এরা বুলডোজ করেছে পব পর বহু মৌ-কোষ গাঁ। সেখানে গত বসন্তেও ফুল কুড়িয়েছে নিগ্রো কিশোর-কিশোরী ; গত বর্ষার শেষে রাঙা আকাশের পানে হাত ছুঁড়ে হেসে উঠেছে হ্যামকে টাঙানো অধীর শিশু। রাবার, পামজিটে, পামারাক, ব্রেডফুট গাছের ঘন পাতা ভেদ করে বারবাকিউ সেঁকা ধোঁয়া উঠেছে নীল আকাশের গায়ে প্রাণের লিপি প্রণয়ের ভাষায় লিখে দিতো। হারিয়ে গেলো, তারা হারিয়ে গেলো।

এই কি প্রগ্রেস ?

তার চেয়ে কি রাসতাফারি জোনাথান্, কেনী, হেইগ্, কুজোঁ এরাই বেশী প্রগ্রেসিভ নয় ? জীবন যদি অন্তহীন বিচ্ছেদহীন নিরন্তর চক্রমান সংঘাত এবং উত্তেজনার পাক, তবে কি উত্তর কালের ভাবী চেতনা রাসতাফারিদের উত্তেজক রসে মাদক হয়ে উঠবে না ? জীবন থিতিয়ে যাবে প্রাচুর্যের অভেদ্য ঠাসাঠাসি জঙ্গলে, যেখানে আলো ঢুকলেও সঙ্গে সঙ্গে গলা টিপে মেরে ফেলাই হয়। ভবিষ্যৎ কালের সমাজ কি কুবেরদের ? যক্ষ সভ্যতাই কি দেবত্ব পাবে ? অমরতা হবে কুকুরের মুখে শুকনো হাড় ?

গাড়ি থেমে গেলো। প্রকাণ্ড পাথুরে পাঁচিলের দ্যালে ভীমাক্ষরে উৎকীর্ণ 'ফ্রেঞ্চম্যান কোভ'। জাঁদরেল গেট পার হয়ে একটা অদ্ভুত নিঃশব্দতার মৃত্যুলোক। চাকায় আর শাদা-পাটকিলে রংয়ের গ্রাভেলে মিশে একটা দামী অতিসভ্য শব্দ। শাদা সাজানো বাড়িখানা অবধি পেঁাছে আমাদের গাড়ি ছাড়তে হলো। অন্য গাড়ি, শাদা একখানা রোলস্ এলো। রক্তহীন আকাশ, বাড়ি, গাড়ি,—শাদা-শাদা-শাদা !

আর আমি যেন পারলাম না ; শব্দহীন, প্রাণহীন, মমতাহীন একটা দর্পের বুদ্বুদে ঢোকার আগে একটি ভয় আমাকে পেয়ে বসলো ! এ বুদ্বুদ তো ফাটবেই। অন্য কোনো কারণে নয়,—মেকী বলেই। প্রকৃতি জারজকে স্থান দিলেও মেকীকে স্থান দেয় না। যদি এ বুদ্বুদটা আমার থাকাকালীন ফেটে যায়, তখন এদের সেই নাড়িভুঁড়ি

বারকরা বীভৎসরূপ, ভীতগ্রস্ত আতঙ্কবিহ্বল আর্তনাদের চিৎকার সহন করবো কিসের বলে ?

কিন্তু পারিনি। ফ্রেঞ্চম্যান কোভে আর ঢুকতে পারিনি। কেন পারিনি প্রতিমা বুঝেছিলো। ডানকান বোঝেনি।

মনকে ভাবাক্রান্ত করে ফিরছি। কিংসটনের সীমারেখার প্রান্তে গাড়ি থেমে গেলো। বিরাট একটা ভীড়। কে একজন দরাজ গলায় রাজনৈতিক ভাষণ দিচ্ছেন। ভাষণ কোনো তত্ত্ব নিয়ে নয়। ভাষণ হলো ব্যক্তির কেচ্ছা। এবং সেই কেচ্ছা যখন খেউড়ের ভাষায় রগরগে হয়ে উঠছে, জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

গাড়ি ভীড়টাকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো কেনী। আমি বললাম, গাড়ি থামান। এই বক্তৃতাটা শোনা আমার চাই।

ডানকান তো অবাক ! এ চিড়িয়াখানায় নামলে আস্ত ফিরতে হবে না।…মাথা খারাপ নাকি ? চলুন।

আমি নাছোড়বান্দা।

কেনীর ঘাড়ে হাত দিতেই ও বললো, খবর পেয়েছি এসেছো। গিয়েছিলে ফ্রেঞ্চম্যান্স কোভ-এ ! তোমার মিস দাদলানীকে বোলো ডানকান্স্ দারুণ জাহাবাজ। কনে ভাবছেন ওর ঘাড় মটকাবে ; ডানকান্স্ তেমন ঘাড় রাখে না। কনের ঘাড় ইত্যাদি মটকেই তার খ্যাতি এবং পয়সা। মতলব কি ?

এই বক্তৃতা শোনা।

বক্তৃতা ? হাঃ হাঃ হাঃ বিকট হেসে উঠলো কেনী। বক্তৃতা কোথায় দেখলে ? এ তামাশা, তামাশা। রোড-সাইড এন্টারটেন্মেন্ট।

কথাটা যে কতো ঠিক বুঝতে আমার সময় লেগেছিল।

একটি মাত্র নেতার কথা আজ মনে করতে পারছি। সেই ছেদী জগন, গায়ানার ডঃ ছেদী জগন ছাড়া আমি আভিধানিক অর্থে কোনো নেতা ওয়েস্ট ইন্ডিজে দেখিনি।

দেখেছি তাড়াতাড়ি ডিনার খেয়ে নিয়ে চেয়ার বেঞ্চি ঘাড়ে করে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পরিবার 'ভাষণ' শুনতে গেছেন, হাসতে হাসতে। বেড়ে বলে দাদা। মজার !

কেনী সত্য বলে, রোডসাইড এন্টারটেন্মেন্ট !

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমাজে পাকাপাকি দুটি স্তর। আভিজাত্য— তা হোক না কেন রক্তের, হোক না কেন মনীষার, হোক না কেন ব্যক্তিত্বের,—কোনোটাই নেই। এ না থাকার কোনো ত্রিগুণাত্মক কারণ নেই ; কারণটা নিতান্ত ঐতিহাসিক, অনিবার্য এবং সঙ্গত। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই আভিজাত্য নেই, ছিলো না। ভবিষ্যতে হবে কিনা,—এ তত্ত্বের কথা থাক। আছে বৈশ্য অর্থগৃধ্নুতা এবং ব্রাত্য নিরক্ষর দারিদ্র্য। মাঝামাঝি এখন যারা, তারা ব্রাত্য দল থেকে সবে মাথাচাড়া দিচ্ছে ; —কেউ ডাক্তার, কেউ আইনজীবী এবং কেউ এ-কালের রাজনৈতিক। মুখ্যত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সমাজ—উপেক্ষিতদের সমাজ। এখনও 'জো-হুজুর' যথেষ্ট। বম্বেটেপনা প্রচুর।

লুট, রাহাজানি, বলাৎকার, অগ্নিকাণ্ড লেগেই আছে। মদ, জুয়া, যৌন ব্যভিচার, হত্যা, হাঙ্গামা লেগেই আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফৌজদারী মামলার হার পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে জারজ জন্ম পৃথিবীতে অদ্বিতীয়—৮২%।

এ সমাজের নেতা হবে কে?

যারা হঠাৎ নরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে উপেক্ষিতদের; যারা আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে রক্তের অণুতে শুয়ে থাকা বারুদের গুঁড়োয়। দমকা বক্তৃতার ফলে দমকা ভীড়, দমকা মিছিল, দমকা স্ট্রাইক, দমকা বিপ্লব, দমকা মারপিট, রাহাজানি, লুঠতরাজ,—এই সব কৃতিত্বে যেমন হাঙ্গামার একটা নোংরা প্রকাশ আছে, তেমনি আছে একচ্ছন্দা জীবনের মধ্যে হাঁপ নেবার মতো একটু উত্তেজক তামাশাপ্রিয়তা।

তামাশা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রক্তের ঘুণ। হবেই। চিরকাল যারা শাদা ম্যানেজার-ওভারশিয়ার, পরদেশী 'রাজার জাত'-এর সুঠাম বাংলোর কেয়ারীকাটা বাগানের বেড়ার মধ্যে স্থান পেয়েছে, দোরের পা-পোষ, ঘরের ঝাড়ন, জুতোর পালিশ হিসেবে; চিরকাল যাদের স্বর্গ, একখানা ঘর; মোক্ষ, একমুঠো শিলিং; কাম, শয্যাহীন রতিসঙ্গের নিত্য নবত্ব,—চিরকাল যারা খোঁজ করে এ ক্ষেতের মজদুরী বিলোবার মালিককে, এ ফলের স্বাদ গ্রহণের অধিকার তার সাব্যস্ত কি-না; এ হপ্তার প্রাপ্য 'চিঠ্‌ঠা' থেকে ছড়িদার কতো নেবে; আজকের রাতে ওভারসীয়ার কার বোনকে, স্ত্রীকে হঠাৎ ডেকে বসবে নিজের ঘরের কাজের জন্য; এ গর্ভের সন্তানের জনক কোন জন;—তারা কোন্ আশায়, কোন্ লজ্জায়, কোন্ সাহসে মাথা তুলবে? কাজেই দল না পাকিয়ে ওদের ফূর্তি নেই, দল না পাকিয়ে ওদের ঝগড়া নেই, দল না পাকিয়ে ওরা জীবনকে ভোগ করতে জানেনি। কাজেই যে কোনো ঘটনা হয়ে যায় দল; দল হয় তামাশা। তামাশা লেগেই আছে ওদের জীবনে। শাদা-'মুনিব'দের কড়চা বলে,—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান 'গে' (আমুদে) জাত। রংদার রংপিয়াসী জাত। এই তামাশার প্রকাশ স্টীল ব্যাণ্ডে, কার্নিভ্যালে, 'ফেট্'-এ, ড্যান্সে, লাইমীং-এ। রাজনৈতিক আন্দোলনেও, গুণ্ডামী, হুল্লোড়ী এ রাজনীতির আবশ্যিক অঙ্গ। একদল নেতা এই গুণ্ডামী বাজিয়ে নেতৃত্ব করছে। এবং তাদের মধ্যে যদি একটু-আধটু বিদেশ-বাস, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ধ থাকে,—সে নেতা দারুণ নেতা; অভিনেতা। মোহগ্রস্ত করে রাখে কথার ফুলঝুরি দিয়ে, শাঁসালো ঝাঁঝালো রুধিরাক্ত পুরুষ্টু পুরুষ্টু কথা দিয়ে।

নেতা আজও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসেনি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নেতারা এখনও যজ্ঞবাড়ির বাইরে রাশীকৃত ফেলে দেওয়া পাতার জঞ্জালের সরিকদার হবার তাড়ায় আপোষে গুঁতোগুঁতি এবং কামড়াকামড়ি নিয়ে ব্যস্ত। সার্কাস দেখানেওলা করিৎকর্মা দেশগুলো, যারা খাসা খাসা বাছা জানোয়ার সাজিয়ে বিশ্বসভার প্রাঙ্গণে খেল-তামাশা রচনা করে দুনিয়াকে তটস্থ করে রেখেছে,—তারা এই সব জঞ্জালস্তূপের তীরে তীরে বিবদমান জীবগুলোর গায়ে জল ছিটিয়ে রগড় জমিয়ে রাখার খেলায় মত্ত। তারা কাজ গুছুচ্ছে।

সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একখানা সংবাদপত্র নেই যা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের। মাঝে মাঝে পচা পুকুরে বুড়-বুড়ির মতো গ্যাস-চালিত দিশী পত্র জন্মায়, সূতিকাগারেই মরেও। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের ব্যাঙ্ক নেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বই ছাপা ব্যবসা নেই। বাইরে থেকে বই ছেপে এলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পড়ে। বাইরে থেকে খাতা এনে কাগজ এলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ লেখে। কালি-কলম-কাটালাস-হাতুড়ি-কাস্তে-কোদাল-গাড়ি-কাপড় সব—সব—সব বাইরে থেকে এলে তবে বজায় রাখা যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্বাধীনতা নামক তামাশার আঙ্গিক। যে পতাকা এক এক দ্বীপে স্বাধীনতার তিলক পরে উড়ছে, সে পতাকা ওড়ানোর মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নিজস্ব দান হাওয়াটুকু। পেতলের ডাণ্ডা, লোহার কপিকল, সেলাইয়ের যন্ত্র, কাপড়ের থান,—সব ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আনতে হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রাজনীতির রাজা ছিলো বিদেশী; নীতিও স্বদেশী নয়।

কেনীকে ধরে পড়েছি· মারুনল্যাণ্ডে নিয়ে যেতেই হবে। জ্যামায়কায় ঐ একটাই গন্তব্য স্থান।

—সে তো তুমি কবে থেকেই বলছো। কিন্তু বোঝো না কেন যে সে সব করতে হলে এক নয় আমাকে তোমার পোশাক পবতে হবে, নৈলে তোমায় পরতে হবে আমার পোশাক।

হেসে বলি, কেনী তোমার পোশাক তো ঘুনসীতে এক আঁটি শাক বাঁধলেই খতম। পুরো পোশাক কেন, আশাক পর্যন্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ভাই শাক বেঁধে ছাগলের দলে নামা, আর বিকীনি পরে জলে নামা, ও তো বটম্‌লেস টপ্‌লেসের ভূতকে ঘাড়ে ডাকা। সে পারবো না। বরং তুমিই,—নাও শার্ট প্যাণ্ট। চলো দোকানে।

সেলাই করনেওয়ালাদের গলি থেকে যখন পোশাকী কেনীকে নিয়ে বার হচ্ছি তখনও হাত পা ছুঁড়ছে। আক্কেল তোমার কী বলে তো হে? আমাকে নয়া কাপড়ের মধ্যে বন্দী করতে চাও। তস্য পরে ক্যা হোঙ্গা সমঝতা?

শ্বাস রে! অস্‌লী জ্যামায়কান যখন অস্‌লী অংরেজী বলে, কোথায় লাগে 'মাই ফেয়ার লেডী'র 'কক্‌নি', কোথায় লাগে ঢাকার কুট্টি! ও সময়ে সমুখে দাঁড়ালে গঙ্গাজীর প্রথম পতনের মুখে ঐরাবতের দশা হবে। মাথা নেড়ে যেন সব বুঝে বেদনায় কাতর এমনি ভাব দেখালুম।

বলেই চলছে কেনী,—উইসডম উঈড্ (গাঁজা)-এর কিংডমে ঢুকলে ট্যাক্সও বাড়াবে ওরা পোশাকী দরেই। গত দেড়শো বছরে যতো জামা কাপড় পরিনি একদিনে হঠাৎ ততো জামা কাপড়ে ঢুকে পড়লে আমাকে কোথায় পাবে হে মাস্টার? পোশাকেরও বদহজম হয়।

পরের রোববার। রওনা হয়েছিলাম ভোর চারটেয়। প্রতিমা বাইরে এসে কেনী

এবং তস্য কার দেখে বললো, সেফ রীটার্ন। টেক কেয়ার অব ইওরসেল্‌ফ (বেঁচে ফিরে এলে হরির লুট দেবো)।

সেই কোয়ার্টার প্যাণ্টে ঢাকা পা লম্বা লম্বা ফেলে পরম কৈবল্যে অভিষিক্ত কেনী রক্তাক্ত চোখে আমাকে নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিয়ে চললো। 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে' শুধোবার হিম্মৎও জিভের ডগায় শুকিয়ে আছে যেন গত বসন্তের আঙুর এ বসন্তের কিসমিসটি হয়ে।

কিন্তু কেনী আমায় ঠিকই নিয়ে এলো পাহাড়ে। তখন হবে বেলা সাতটা।

দুটো পাহাড়ের মাঝে খাঁজ। ওপরের ঘন জঙ্গল প্রায় ঢেকে রেখেছে। পাহাড়ের একটা ধার ঘেঁষে জলধারা। অন্য ধারটা দিয়ে আমরা চলছি। মাঝে দুটো বাঁশের সাঁকো পার হলাম। অবশেষে পথ অবরুদ্ধ। গাছে চড়তে হলো। লিয়ানার জাল ডিঙিয়ে পাহাড়ের গায়ে পা রেখে সন্তর্পণে নামতে নামতে গলদ্‌ঘর্ম। হঠাৎ যে জায়গাটায় এসে পড়লুম,—ঠিক যেন সিমলার "গ্লেন"। বড় বড় গাছ। প্রায় প্রত্যেক গাছের শিকড় ছাওয়া গুঁড়ির খাঁজের ফাঁক দিয়ে পাথরের চাঁই মাথা চাড়া দিয়ে আছে। বোঝা যায় মানুষ বসেছে তাতে বহুবার। জায়গাটায় পদাতিক মসৃণতা। এইখানে অভিচার চলে। জ্যামায়কার 'হুম্‌ফর'! জ্যামায়কার মোরগ-যুদ্ধ-ক্ষেত্র। জ্যামায়কার নিশি-নৃত্য-বাসর।

তখন সব নিস্তব্ধ। হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কেনী কী একটা মন্ত্রে। দুটো পাহাড়ের দেয়ালে ঘা খেতে খেতে শব্দটা মিলিয়ে যায়। শেষ অবধিও সে শব্দটাও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো।

পর পর, পর পর এক একটা মোড় ফিরি ; এক এক চত্বর পার হলেই এমনি রহস্যসঙ্কুল অবকাশ। কতো চলি ; কতো পার হই।—মনে হলো এ-ই হলো মারুনদের দেশ! আপোষে এদের কথ্য ভাষা কোরোমান্তী। কিন্তু এদের কথাবার্তা চেহারা—সবই যেন দাহোমী এবং গোল্‌ড কোস্টের। আপনাদের মধ্যে যখন এরা বসে প্রার্থনা করে বলে, 'লা-ইলাহা'। বাকী ভুলে গেছে। ধর্মে এরা স্বতন্ত্র।

কেনী একটা গাছের ধারে দাঁড়িয়ে কাটলাসখানা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলো। দেখেই বুঝলাম অনন্ত মূল। কিন্তু গাছটাকে কাটলো না কেনী। গভীরে নেমে যেতে লাগলো। তলার দিক থেকে অনেকটা কেটে আবার মাটি চাপা দিয়ে রাখলো। বুঝলাম তখন। আমাদের খাবার মতো অংশ কেটে নিলো মূল গাছটা যেমন বাড়ার বেড়েই যাবে।

সারাদিন কেটে গেলো পথ চলতে চলতে।

সন্ধ্যার বেশ আগে লক্ষ্য করলাম পাহাড়ের মাথায় দীর্ঘদেহ কেউ দাঁড়িয়ে আছে। লাফাতে লাফাতে সেই অদ্ভুত দীর্ঘ মূর্তি নেমে আসছে।

এই মারুনদের দেশ। এ দেশ জয় করা যুগের পর যুগ দুঃসাধ্য হয়েছে। নেমে এলো সেই মূর্তি। ছায়া রূপ নিলো শরীরে। সাম্‌ কেলশল। বয়স হয়েছে।

কেনীকে বললো, তোমার ডাক শুনেছিলাম। কিন্তু একি! এবারে তুমি এতো পোশাক পরেছো কেন?

বলেই আমার দিকে হাসতে হাসতে চেয়ে বললো,—কেনী যে য়াম্। যতো ছাড়াও ততো মিষ্টি। যতো গভীরে ততো বৃহৎ।

কেলশলের গাঁয়ে এগারো ধরে মারুন থাকে। কিন্তু কেলশল সব মারুনদের 'রাজা'; কেলশল নিজে পরে আছে খাকী প্যাণ্ট। গায়ে চামড়ার জামা। , কিন্তু গাঁয়ে ফিরে যখন ডিনারে বসলো তখন অন্য চেহারা।

ডিনারে কেলশল পুরোনো সাজ পরেছে। যুদ্ধের পোশাক। লাল প্যাণ্টে কালো ফিতে। কোমরে শ্যাস্। দুই কাঁধে এপ্যুলেতে। ডিম, বন্যবরাহ, মুল, সব্জী, ক্যাসাভা, আভোকাদো—প্রচুর খেয়ে ওদের টেকে-টেকে নাচ এবং য়াম-য়াম নাচের সঙ্গে বেশীক্ষণ পাল্লা দিতে পারিনি।

ওরা অবসন্ন হয়ে গান গাইলো—সেই বাংলার নরম সুর—বহু যুগের ওপার থেকে আষাঢ় এলো আমার মনে—

When the rain came
So I thought
You too might soon appear
When the clouds rushed
So I thought
I could trace dark shocks of hair...
And to go by
The years, the years,—
Life's a lullaby
Of songs and tears
If you come to go, to go ;—
Must you never return ?
If go, you must ; come again,
With the next shock of clouds,
With the next beat of rain...

সাম্ কেলশল জ্ঞানী ব্যক্তি। মিলটনের জ্ঞান নয়; ডক্টর জন্সনের জ্ঞান; সার্টর রিসার্টাসের জ্ঞান নয়, ওয়েলডেন্-এর জ্ঞান।

'শিক্কে' (শিক্ষা) খুব ভালো জিনিস! কিন্তু সেটা যে কেবল শুকনো পাতা পাওয়া যায় তা আমি মানিনে। এই সব ভিজে পাতায়ও শিক্কে যথেষ্ট।...ছাপাপাতা পোকায় কাটে, বোকায় পড়ে। ফলে, থেকেও যায় বোকা। আর এই যে জঙ্গলে-পাহাড়ে-সমুদ্রে-নদীতে বাস,—এর সুখ, এর শিক্কে,—বুঝবে না। ভয় নেই! আতঙ্ক

নেই…হ্যাঁ হ্যাঁ! তা কি? রোগ তো কি? যতো বাড়ছে ততো বাড়াচ্ছো। কে জিতছে? রোগও কম, ভয়ও কম।…এখন আমাদের মৃত্যুর হার তোমাদের চেয়ে কম। মৃত্যু এলেই বা কী?…বেঁচে থাকতে পারাই কি একটা বড়ো কিছু? যে পাঠালো সে যদি ডাকে,—কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। নালিশয় কেন? লড়াই কার সাথে?…না-না; সুখ মানে শান্তি, শান্তি মানে সুখ। সুখ শান্তি যার আছে তার তরে অনেক জন্ম নেই। …ওটা উলটো কথা। অনেক জন্ম তার তরে, ঘরেই যার দুঃখ।

"ভাবি কবে মানুষ হবে তোমরা।…চার্চ? না, নেই! ও মানি নে। পুজো, ভগবান ও সব আবার কী?…যখন তখন আকাশের দিকে চাই; ভয় আকাশকে, ভালো-বাসা আকাশকে। আকাশ বেয়ে আসে প্রাচুর্য, দাক্ষিণ্য, সংহার, ভয়। আকাশই দেবতা। দেবতার কোলেই বাস। ডাকি যখন আকাশকে ডাকি। রাগি যখন আকাশকে গাল পাড়ি। যা প্রত্যক্ষ। তা নয়, কে এক দেবতা; তার কে সব সমঝানেওলা; তাকে ডাকার কতো সব বিধি; তাই নিয়ে কী মারামারি…"

বলে, হাসে।

আর এগোয়নি সাম্। আমরা ও তল্লাট ছেড়ে যখন পাহাড়ের ভাঁজে নদীর ধারে এসেছি তখন চূড়ার মাথায় সামের দীর্ঘ দেহ খাড়া আছে। তার পিছনে দুস্তর নীল আকাশ,—সামের দেবতা সাম্‌কে ঘিরে আছে। শাদা শাদা পেঁজা মেঘের পাল গঙ্গার বুকে মালার মতো ভেসে যাচ্ছে।

অভিজ্ঞতার নেশায় জীবনে বহু অগম্য অসাধ্যে অঙ্কুশিত পদক্ষেপ করেছি। দেখেছি কতো বিচিত্র চরিত্র কতো অনাবিল অন্তর। মধুর মৈত্রীর স্বাদের পাশে তিক্ত ভর্ৎসিত অবজ্ঞা। তবু দাগ কেটে বসে গেছে সম্পূর্ণ অভাবিতের গহ্বর থেকে বেরুনো অকস্মাতের আলেখ্য। তাদের আজ স্মরণ করি। কেউ বা ধোঁয়ায়, কেউ বা দীপ্ত হয়ে ওঠে; কেউ ভেসে যায় দিগন্তের আলোর মতো অস্ত-চক্রবালের অন্তস্তলের অন্তরালে, কেউ অন্ধকারের নৈরাশ্য ভেদ করে ঝিকিমিকি দোলায় দুলিয়ে যায় জোনাকীর মতো। আর কেউ বা একা রাতের আকাশে অবধারিত তারার মতো চিরকালের সহচর হয়ে দূরে থেকে হাতছানি দেয়, 'আছি বন্ধু, আছি!'

এমনই একটি তারা, নিরক্ষর, নিরাসক্ত বীরাগ্রগণ্য সাম্। তার কাছে যা শুনেছিলাম ইতিহাসের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখেছি। মারুনদের, অর্থাৎ বিদ্রোহী মনমাথ-চার্লির জয়ধ্বজার বাহক মুষ্টিমেয় এই বৃটিশ সম্প্রদায় (মারুন নামে যারা জ্যামায়কার ইতিহাসে চিহ্নিত) যুগ যুগ ধরে তাদের ঘৃণিত ইংরেজ শাসনকে মানেনি, মানতে চায়নি। ধ্বংস হয়ে হয়েও আজও মানে না। মারুন ধর্ষণের ইতিহাস জ্যামায়কার রক্তাক্ত ইতিহাস। এবং শাদা শাসনের শোষণ নীতির প্রতিপক্ষী প্রত্যেকটি কালো বিদ্রোহের আশা-ভরসার স্থল ছিলো এই মারুনরা। আজও সেই বিপ্লবী জয়ধ্বজার তলায় বসে বসে স্কটল্যাণ্ডের গান গায় মারুনরা। নিরক্ষর সাম্ যার দলপতি। ভাবি হায় স্বাক্ষরতা, তোমার কালো আঁচড়ের তলায় তুমি পোষো কতো মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, লোভ, তস্করতা, বর্বরতা। কবি

এই থেকেই গল্প ওঠে কবি-কাহিনীর। এড্‌ওয়ার্ড ব্যারেট-ম্যুলটন ব্যারেট-এলিজাবেথ ব্রাউনিংয়ের পিতা। ব্যারেট হল, সিনামোন হিল্—এলিজাবেথের নাম গুন গুন করে। উইম্পোল স্ট্রীটের বন্দিনী মেয়েকে এই সূর্যস্নাত দেশে মনে করতে গেলেই কাব্য জাগে। সেই জেগে ওঠা কাব্যে মনে পড়ে যায় শেরিডান্, মেকলে,—এবং স্বয়ং বায়রণকেও। লেডী হল্যাণ্ড,—ইংলণ্ডে সালোঁ-নেত্রীর প্রাধান্য—হল্যাণ্ড-হাউসে যিনি য়োরোপের-গণ্যমান্য মনীষীদের জন্য অবারিত করে রাখতেন তাঁর বদান্যতা এবং দাক্ষিণ্য,—তিনি ছিলেন শেরিডান প্রেয়সী, বায়রণের অনুরাগিণী। সেই লেডী হল্যাণ্ডের জমিদারী জ্যামায়কায়। বায়রণের অন্যতম মিষ্ট বন্ধু মঙ্ক লিউইস-ও জ্যামায়কায় প্রসিদ্ধ। বায়রণের মতো ভবঘুরে ছিলো গ্রেগরী লিউইস্ যাঁর কীর্তি "দি মঙ্ক্" এবং যে বইয়ের খ্যাতি থেকে তাঁর নাম হলো মঙ্ক লিউইস্। হোরেস্ ওয়ালপোল, মাদাম দ্য স্তেইল্, শেবায়্ঠে, ল্যাণ্ডর বহু লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ এই সদাখুশী লোকটি সেকালের জ্যামায়কা সম্বন্ধে অনেক তথ্য রেখে গেছেন। মঙ্ক লিউইস্ ছিলেন উদার, বদান্য, বন্ধুবৎসল, জীবন-রসের সমঝদার।

সন্ধ্যার অন্ধকারে পাহাড় পথে নামছি। নীচে গাড়ি। দূরে দূরে আলো। আরও দূরে আকাশে চকচকে শুক্র চেয়ে আছে নীল তপস্যায় প্রোজ্জ্বল। গহন কান্তার ভেদ করে শব্দ আসছে ধিনাক-ধিন্, ধিনাক্-ধিন্। এখানকার 'গুম্ফর' জেগেছে। মাইয়াল নাচে মেতে উঠেছে মন। ভূড়ুর মতো সে নাচ। পোকো মানিয়ার মতো।

মঙ্ক লিউইসের ডায়েরীতেও এই নাচের মজলিশী এবং সবিস্তার বর্ণন আছে। আর আছে একটি স্বীকৃতি, "What other Negroes be, I will not pretend to guess, but I am certain that there cannot be more tractable or well-disposed persons than my negroes of Cornwall. I only wish that in my future dealings with white persons I could but meet with half so much gratitude, affection and goodwill." আজকের ইংলণ্ড যদি নটিং হিলকে একটা সমস্যা করে তুলে থাকে দোষ কার? ব্রিস্টলে রায়ট হয়, লণ্ডনে রায়ট হয়,—দোষ কার?

সময় থাকে না চুপ করে। কালমুখর নদ।

গত অক্টোবরে ত্রিনিদাদ সানফার্ণাণ্ডোর কৃষ্ণ মন্দিরে বক্তৃতার পর ফিরছি। বন্ধু নর্মান গির্‌ওয়ার্ ভীড় ঠেলে কাছে এসে বললো,—দেখুন কাকে এনেছি।

বুদ্ধ দাদলানী!

আর তার পিছনেই মাথায় কাপড় দেওয়া প্রতিমা।

স্লান!

দাদলানী বললো, কাল সকালে প্লেন। চলে যাচ্ছিলাম এয়ারপোর্টে। নর্মান বললো আপনি এখানে। প্রতিমা আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

সে কী! ভারী অন্যায় তো প্রতিমা। ব্যবসাবুদ্ধি তোমার আর হলো না। ডানকানের খবর কি!

প্রতিমা বললো, ডানকান এবার তার মনের মতো বৌ পেয়েছে দাদা। তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করেছে। ওরা বিজনেস ভালো বোঝে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম।

প্রতিমা বললো, আমাকে তা বলে পুরো দু মিলিয়ন ডলার দিয়েছে। দাদা কি ব্যবসাতে খাটাবেন বলে ভাবছেন? দেখুন ভেবে। এখন আমি টাকার আণ্ডিল। বদান্য।

ছমাস পরে দাদলানী মারা গেলো।

গত মাসে প্রতিমা।

ত্রিনিদাদ

প্লেন নেমেছিলো বেলা আড়াইটা। সে এরোড্রোম আর নেই এখন। বর্তমান "পিয়ার্কো" এরোড্রোম ক্যারাবিয়ানের 'শো-পীস'। ঐ একটা কথার মধ্যেই ত্রিনিদাদ হৃৎস্পন্দনের অর্ধেক বলা হয়ে যায়। সারা ক্যারাবিয়ানের প্রলেতারিয়েৎ সমাজ যদি কৃষ্ণকায় বলা সঙ্গত হয়,—সেই কৃষ্ণ-সমাজের ধর্ম-অর্থ-কাম,—"শো"। এরা বলে 'ফেট্' (হ্রস্ব-"এ"; যেমন হেট্-হেট্ শব্দ করে গরুর গাড়ির গাড়োয়ান বলদকে প্রগ্রেসিভ করতে উৎসাহ দেয়)। 'ফেট'—Fete—অর্থে ঐ ফুর্তি-ই তবে, বেশ ফাটাফাটি ফুর্তি। যে কোন মনস্তাত্ত্বিকের এটুকু আজানা নয় যে, ফাঁপা হাঁড়ির দাপাদাপিই জোরদার। উদরে ছুঁচোর নৃত্য চাপা দেবার জন্যেই কোঁচার পত্তন আবশ্যক। বার বার দেখেছি নেশা, সাজ, কলরব, ঝগড়া, মারপিট, খুনোখুনি তাদেরই বেশী যারা ধর্মে, অর্থে ফকীর। কামও তাদেরই আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখে দেয়। এই যে নেশাড়ী, জুয়াড়ী, খেউড়ী একটা বিশাল জাত সারা ক্যারাবিয়ান জুড়ে দাপট দেখাচ্ছে আজ, এরাই শ' তিনেক বছর আগে কী যন্ত্রণাই না ভোগ করেছে। মানুষকে হয়তো বেঁধে মারা যায়, কিন্তু মানবতাও যে প্রহ্লাদের মতো অচ্ছেদ্য, অবধ্য, অশোষ্য, অদাহ্য। মারিলে না মরে রাম। ওরা মরেও মরেনি। আজ জেগেছে। দাবি জানাচ্ছে।

ওরা উঠতে বসতে "ক্যাট অব নাইন টেল্" নামক ভয়াবহ চামড়া চাবুকের মার খেতো; উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে গলদঘর্ম পরিশ্রম করতো চিনির কড়া-র এপার ওপার। ওরা চাষের বলদ, গাড়ির ঘোড়া, ঘানির খঞ্জর, পিঁজরাপোলের ষাঁড় হয়েও, বদলি পেতো ঘাসের মেটো ঘরে স্থান এবং সপ্তাহান্তে বা পক্ষান্তে বরাদ্দ ময়দা এবং শুকনো মাছ।

একদিকে রাজরোষ, অন্যধারে বণিকশাহীর গৃধ্নুতা; একদিকে মিশনারীর ভণ্ডামী, অন্যধারে বিদ্বান (!)-দের তত্ত্বকথা,—সব মিলে সেকালীন নিগ্রোদাসরা সমাজের বাইরের জন্তু বলেই বিবেচিত হতো। দার্শনিক ডেভিড হিয়ুম তো নিগ্রোদের "ন্যাচুরালী ইনফীরিওর টু দি হোয়াইট্স্", বলে ফতোয়াই জারি করেছিলেন। তিনি নিগ্রোদের মধ্যে ('ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিল') শিল্পরুচিতা অথবা বিজ্ঞান-মনতা, কিস্সু পাননি। ত্রিনিদাদের গভর্নর লর্ড হ্যারিস তো কবুল দিয়েই খালাস,—"বরাতের ওপর দায় ঠেলা এই বুঁদ-কুঁড়ে ব্রহ্মা-মেহোমেট্ পুজো-করা জানোয়ারগুলোর মগজ কই যে—মর্যালিটির অর্থ করতে পারে?" লর্ড হ্যারিসরা অর্থের মর্যালিটি খুঁজতে গিয়ে যতো অনর্থ করেছেন তার মধ্যে সেরা অনর্থ করেছেন তাবৎ আফ্রিকানদের 'স্যাভেজ' প্রমাণ করে।

"দাসরা মাহিনা পেতোই না। সপ্তাহে পেতো দু পাউন্ড শুকনো মাছ, শুয়োরের কিংবা গরুর মাংস,—আর কিছু নুন। বাকী কলা,—যতো চাও ততো। ওরা কসেড়ু,

কচু, তানিয়া, য়াম নিজেরাই আর্জাতো। ছ মাসে কোম্পানী ছ' গজ লাল শাল্‌ আর ছ'গজ কোরা থান দিতো। বরাদ্দ এই। তবে তার ওপর আবার ঠিকেদারদের চুরি থাকতো। কাজেই পালাতো, ধরা পড়তো, মার খেতো, পালাতো,—এই চক্রের মধ্যে পাক খেতো দাস জীবন।" * ইংরেজ রেভারেণ্ড স্মিথ এই ব্যবস্থার বিপক্ষে প্রথম আপত্তি জানানোর ফলে জেলে গিয়েছিলেন। সেই যুবক জেলের স্যাঁৎসেঁতে ঘরে যক্ষ্মা রোগে ধীরে ধীরে মারা যান।

সেই যমের অরুচি নিগ্রোদের বংশধররাই আজকের প্রাইম মিনিস্টর, চীফ জাস্টিস। সন্ধ্যার পর শামং গাছের অন্ধকারে বসে পোড়ানো ইগোয়ানার মাংস সহ জংলী তাড়ি গিলে ঢোল বাজিয়ে হৈ হৈ করা ছাড়া এদের আর কী আনন্দ ছিলো? তখন ওরা শাদাত্বকে স্বর্গত্ব, সাজপোশাককে মুক্তির ধ্বজা, ঘোড়া চড়া, ছাতা মাথায় দেওয়া, জুতো পরা, চার্চে যাওয়াকে বেজায় বড়ো রকমের জাতে ওঠা বলে মনে করতো। বিয়ে করাটা মনে করতো আভিজাত্যিক শানের চরম; নাচঘরে যুগলে নাচা মনে করতো কৃষ্টি।

এই থেকেই এ সব দেশে সাজ-পোশাক আড়ম্বরের ওপর আজও এতো জোর। বাইরের জাঁক দিয়ে অন্তরের ফাঁক এরা বোজাতে চায়। তাই আর কিছু না হোক, আগেভাগে পিয়ারকো এরোড্রোমটাকে এরা শো-পীস করে রেখেছে। এই শো-পীস-পনার নজীর আরও আছে। এদের পথে পথে প্রতি পাঁচজনের একখানা গাড়ি। ঘোড়াটানা গাড়ি প্রায় দেখাই যায় না। গাধা-খচ্চর টানা গাড়িও আছে, কারণ সেকেলে গাঁও আছে। সেগুলো কেউ শো করতে চায় না; এবং গাঁয়ের মধ্যে কাদা-পথে খচ্চর যতো নিরাপদ, ফোর্ড বা ক্যাডিল্যাক ততো নয়।

"বুম্" হয়েছে যাত্রীতোলার ব্যবসায়। বিনা পরিশ্রমে, কেবল সাজগোজ ছিমছাম হয়ে থাকতে পারলেই, আমেরিকা, ক্যানাডা, য়োরোপ, ভেনেজুয়েলা, মেক্সিকো, ব্রাজিলের টাকার কুমীররা আসবে মৌজ করতে,—ঢেলে দিয়ে যাবে অনেক দৌলত। এক জাতীয় স্ত্রীলিঙ্গরা মাত্র রমণীয়তা এবং সাজসজ্জার চটকের বিনিময়েই রোজগার করেন। জীবিকার্জনকে সুধময় করতে চান।—অধুনা ক্যারাবিয়ানময় এই কল-গার্ল। রূপোপজীবন-সম্পর্কে নানাভাবে বাড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা। গুণীজন জানেন এ ধরনের ব্যবসায়ে উইণ্ডো-ড্রেসিং কতো প্রয়োজনীয়;—প্রায় অপরিহার্য। কাজেই প্রথমেই পিয়ার্কোর উইণ্ডো ড্রেসিং মনে পড়লো। পিয়ার্কো শো-পীস।

আজকাল টুরিজিম্ একটি কুলীন ইণ্ডাস্ট্রি। সব ইণ্ডাস্ট্রির টাকাই মুনাফাদারের বৈকুণ্ঠে গিয়ে কৈবল্য লাভ করে। তবুও পরকালে নরকের অস্তিত্ব ঘোচাতে পারে না,—এ সব উপার্জনও সেই বৈকুণ্ঠেই যায়। ত্রিনিদাদে শ্রমিক-বিদ্রোহ বিঘোষিত হয়েই আছে। বারংবার বিদ্রোহে বিদ্রোহে নাস্তানাবুদ হয়ে প্রাচীন কালের সোস্যালিস্ট নেতা শ্রীমান এরীক উইলিয়মস্ শ্রমিক-আন্দোলন বন্ধ করার যাঁতাকল রচনা করেছেন,—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্টাবিলাইজেশন এ্যাক্ট্। এটি আমেরিকী ধুরন্ধরদের দান। সম্প্রতি

* ডাঃ ছেদী জগনের বই—দি ওয়েস্ট অন্ ট্রায়াল।

গুয়ানাও তালিম নিচ্ছে। ছেদী জগনকে জব্দ করার জন্যে গায়ানার প্রাচীন দিনের মহাসোস্যালিস্ট নেতা বার্ণহাম্-ও এ বজ্র হাঁকাড়ালেন বলে।

দেশ-ভ্রমণের বই কিনে পাঠক দুটো অবসর-ঘন মুহূর্তে নেশার রং চড়াতে চান। রম্য-রচনার উদ্দেশ্যই রস ধাতুকে চাগিয়ে তোলা। সৌখীন দিগ্বিজয়। বিনা টিকিটে মক্কা-মদিনার সফর। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে কামাচাটকা থেকে পোপোকাতিপোৎল ঘোরা। তার মধ্যে এই সব তত্ত্বকথা, জ্ঞান, ব্যঙ্গের কবে দেয় মনকে। বেশ বন্দরে বন্দরে পেয়ে যাবো। লারা, ক্লারা, ফ্রসেস্কা, মেখলাকে। লাঞ্চে ছুটবো, পাঞ্চে মাতবো, টুইসটে নাচবো, বুইকে চড়বো;—তা নয়,—কেবল গম্ভীর ধ্রুপদী কথা! সুতরাং নেমে এসো কথা; তুঙ্গ থেকে নেমে এসো। হে লেখনী রমণীয়া হও।

১৯৫৭-র পিয়ার্কো বিমানবন্দর এবং ১৯৭৯-এর বিমানবন্দরে আকাশপাতাল তফাত। নতুন করে আবার বন্দর তৈরী হচ্ছে। ত্রিনিদাদের বন্দর নগরী পোর্ট অব স্পেনের ঐতিহাসিক খ্যাতি। য়োরোপ এবং আমেরিকা, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এটি প্রসিদ্ধ সংযোগস্থল। ফলে ত্রিনিদাদের মালিক সারা ক্যারাবিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকা এবং মধ্য আমেরিকার মাতব্বর।

১৯৫৭-য় নিমন্ত্রিত হয়ে প্রথম আমি যাই ত্রিনিদাদে। তৎকালীন ভারতীয় দূত আমার বন্ধু। দিল্লীতে থাকতে স্কলার-সুলভ চপ্পল, পাজামা, পাঞ্জাবির ওপর জওয়াহর-বণ্ডী; উপরন্তু ছিলো রাজনৈতিক ট্রেডমার্ক গান্ধীটুপী। ত্রিনিদাদে দেখি একেবারে ভোল বদল গিয়া। লম্বা শার্ট পারবত, মায় টাই এবং পাইপ। টুপী, বাণ্ডী, চুস্ত্, পাজামা ইত্যাদিও আছে। থাকে পালিশ করা, বাক্সবন্দী। কালে অকালে ভারতীয় জাতীয়তার ধ্বজা তোলার সময়ে পরা হয়।

সেই প্রথম বিকেলটিতেই শাম্রোলের দৌলতেই হোক, ত্রিনিদাদের বিখ্যাত পীচ-লেকের পীচ ঢালা রাস্তার দৌলতেই হোক, বা পরমরমণীয় সংকেত নিদর্শন নর্দান রেঞ্জের শ্যামল গরিমার প্রতিভায়ই হোক, সে বিকেলবেলায় ত্রিনিদাদ আমায় জিতে নিলো। মনে হলো মানুষকে প্রকৃতির যা দেয় আছে তার চরম সৌন্দর্য, ধরে আছে এই ছোট্ট দ্বীপটি। নাগাড়ে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত এখানে রয়ে গেলাম। তারপরেও যাতায়াত আজও বজায় আছে। মনে মনে ভাবি এ দেশেই থেকে যাইনি কেন? ত্রিনিদাদে যদি থাকতো গঙ্গা থেকে যেতাম হিমালয় বাদ দিয়েও।

বড় সুন্দর ত্রিনিদাদ। রূপে-রসে নিষিক্ত, ধনে-দৌলতে সমৃদ্ধ, ভাব মনে রসিক, সৌখ্যে মমতায় নিবিড়; ছোটো (৮০×৮০) যেন পান্নার টুকরো; শোভায় অপ্সরী; রুচি-শিল্প-কলায় সদ্য বিবাহিতা তরুণীর মতো বর্ণাঢ্য, লাস্যময়ী, নব নব উন্মেষের সম্ভাবনায় অন্তঃসত্ত্বা।

প্রকৃতি দু হাতে দিয়েছে; মানুষ দু হাতে তছনছ করেছে। অন্তরের অফুরন্ত সম্পদ ব্যবহারের উদ্দামতায়, রূঢ়তায় অশালীনতায় তছনছ করেছে। স্পেন, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড,—এখন যুক্তরাষ্ট্র, একে কেবল দুয়েছে আর দুয়েছে। চিনি, কোকো,

কফি, চাল, জায়ফল, দারুচিনি এবং সর্বোপরি পেট্রল এবং পীচের একচ্ছত্র পৃথিবীব্যাপী অধিকার। কী নেই ?

ফলে এটা ছিলো দাস ব্যবসায়ের শ্রীক্ষেত্র। সেই ধারা থেকে এলো মুচলেকা লেখা ভারতীয় শ্রমিক দল। শিকড়হারা এই সমাজ আজ শিকড়হীনতার অসঙ্গতিতে বিভ্রান্ত। যে কোন সংস্কৃতির ঝাপট আসে, এরা টলমল করে ওঠে।

কিন্তু ১৯৫৭-র সেই সন্ধ্যা আজও আমার মনকে চিত্রের রংয়ে ভরে দেয়।'

চোখ চেয়ে থাকে 'আপন হৃদয় গহন দ্বারে'। চেয়ে থাকে নর্দান রেঞ্জের দিকে। রেঞ্জভরা আগাগোড়া শ্যামলতা। বুকে বুকে হাল্কা মেঘের মালা। তার মাঝে মাঝে মাথা তুলে আছে গ্রামের পর গ্রাম, বসতির পর বসতি। তখন সেটা বর্ষার আগে। ইম্মোরটেল এবং পোঈ গাছের সে সৌন্দর্য ভোলবার নয়। জ্বলন্ত হলদে। যে হলদে ঢেলে দিয়েছে ভ্যান গক্, গঁগা বার বার ক্যানভাস জুড়ে। যে হলদে আগুন লাগিয়ে দেয় সবুজ-মনা পৃথিবীর ফলিত-যৌবনের দাহে। বোঝা যায় নীল নয়না, শ্যামলী এই ট্রপিকের বাসরে যে পুরুষ সঙ্গ পায়নি সে এ হলুদের গান গাইতে পারতো না।

পোঈ গাছটার জাত শিমুল-কি-পলাশ-এর। গোটা গাছটায় কেবল ফুল ; ফুলের বাসরে অন্তরায় হয়ে বর্ষীয়সী পাহারা কেউ থাকে না। কলিকাদের রৌদ্র-স্নানের সময়ে আবরণের লেশও বাধা। গাছের চেহারা খাড়া খাড়া। যেন দেবদারু। অথচ সিল্কের মতো মিহি ফুলে আগাগোড়া ঢাকা। পাহাড়ের গাঢ় সবুজের পিঠের ওপর এই জ্বলন্ত হলদে। চাইলে মনে হয় যেন হঠাৎ দেহ-মন-পারায়ে অনির্বচনীয়তা উড়ে ভেসে চলেছে দিগন্তহীন যৌবন লোকের অভিসারে।

গাড়ি চলেছে তখন লেডী ইয়ং রোডের দিকে। নর্দান-রেঞ্জ কেটে পাহাড়ী পথ চলেছে শহরের শো-পীস পাড়ার দিকে। সাভানার চার ধারে বড়ো বড়ো হোটেল। 'কাসকেড-হিলে'র পাড়া ; মারাভাল পাড়া ; ডীগো-মার্টিন ;—সবই হলো হোটেল-নাইট ক্লাব পাড়া। এরই মধ্যে হোটেল-প্রধানা কুইন্স পার্ক হোটেল। সম্প্রতি দুয়ো রাণী ; কেননা 'ত্রিনিদাদ-হিলটন' মাথা চাড়া দিয়েছে। ১৯৫৭-তে তখনও 'ত্রিনিদাদ-হিলটন' হয়নি।

লেডী ইয়ং রোড এবং এসব পাড়ার উল্লেখ করলুম কেন না যাঁরা সত্যিকার টুরিস্ট হয়ে আসেন,—হোটেল, ক্যাবারে সুইমীং পুল, নাইট ক্লাবে রাত কাটিয়ে ফুর্তি সারতে চান তাঁদের জন্যে 'তৈরী' করা শো-কেস। এরই একধারে 'কুঈনস রয়েল কলেজ'—এককালে এ দেশের সাহেবদের এবং সাহেব ঘেঁষা কালোদের তীর্থ। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী, প্রধান ন্যায়াধীশ, গভর্নর জেনারেল, সকলেই এককালে এই কলেজে বেঞ্চিতে দাঁড়িয়েছেন, বেত্রাঘাতে ভীত হয়েছেন। অবশ্য 'কলেজ' মানে স্কুল; সীনিয়ার ক্যাম্বিজ পর্যন্ত। কিন্তু ক্যারাবিয়ান দেশগুলোই অতিশয়োক্তির দেশ। ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং সূর্যের তাপ দুটোই অতিশয়োক্তিকে প্রশ্রয় দেয়। হাঁক-ডাকের শো-পাড়া ক্যারাবিয়ান, এখানে দশবছরের মেয়ের যৌনজ্ঞান বিপরীত ; পেয়ারাগাছে ফল ধরার আগে ফুলেই পোকা ধরে ; কাঁচা আম পেড়ে পাকাতে গেলে পাকবার আগে পচে যায়।

ডাঃ মুখার্জি তেরো বছরের ছেলের গণোরিয়া চিকিৎসা করে বললেন, এ-ভুবন ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হলো ভটচায্যি মশায়। সূর্য এখানে পাকায়, কেবল পাকায়। এখানে তিল জন্মেই তাল। এখানকার সাহিত্যে সারকাজম্, টিটকিরি, শ্লেষ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছড়াছড়ি, বিদিয়া-নাইপলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর বাপ এবং মামাবাড়ির কেচ্ছা। তবে সেটা চুটিয়ে করতে পেরেছেন ব্রিটিশ-সিটিজেনশিপ হাসিল করার পর। এবং সেটা এক শূদ্রাললনার সিঁথেয় সিঁদুর দেবার ফলশ্রুতি কিনা বলা যায় না।

দরিদ্র অন্ত্যেবাসীর দল বাদ্যযন্ত্র না পেয়ে একদা টিন কানাস্ত্রা তেলের পিপে বাজিয়ে জাথা বার করেছিলো ১৯৫২-তে। তেল-খনির শ্রমিক-জমাদার উরিয়া বাটলারের নেতৃত্বে। সেই টিন, কানাস্ত্রা, মোটর-চাকার কাপ, তেলের পিপে, মোটরের রিম্ এখন হয়েছে বীট্‌ল্‌স পিট্‌নিকের মতো বিশ্ব-পাগল স্টীল-ব্যান্ড। গাইয়ে হেমন্ত মুখুজ্যে হিলটনে ডিনার খাচ্ছিলেন পুল-সাইড লাউঞ্জে। স্টীল ব্যান্ড বাজছিলো শুকনো পাতা-ছাওয়া সাজানো বন্য-কুটীরে। বললেন, "চলুন জামাইবাবু, স্টীল-ব্যান্ড ব্যাপারটা দেখে শুনে আসা যাক।" স্টীল-ব্যান্ডে এখন ওরা বাখ্, মোজার্ত, শপাঁ, ওয়াগ্‌নরও বাজায়। এখানে শিশুর শৈশব কাটতে না কাটতেই যুবা। তরুণ-তরুণী নিয়ে যে কাব্য রস অন্য পৃথিবীতে আছে সে কাব্য এখানে হাস্যকর। গোটা দেশ যৌবন হতে, দেখাতে, পান করতে পাগল, উন্মাদ, উন্মত্ত। ছ' বছর বয়স থেকেই মেয়ে ব্রা পরে; বিকীনীর সঙ্গেই। এদের মনটাকে শিশু বলতাম যদি সরলতা থাকতো; কিশোর বলতাম যদি রস থাকতো; তরুণ বলতাম যদি সেই চপল-আঁখির সৌন্দর্য এবং উচ্ছলতা থাকতো। যৌবনেই এরা বৃদ্ধ। জরায় এরা রোগগ্রস্ত, পঙ্গু। এদের বলা যায় জন্মপক্ক। এঁচড় বললে পাকা, পাকা বললে এঁচড়। গোটা জাতটায় সমীহ নেই; অনীহায় জর্জর। গোটা দেশেই অনুকরণকেই সমীকরণ বলা হয়। পাকা পাকা সমাজতত্ত্ববিদ বলেছেন, বেশভূষায় এরা 'এপিক' অর্থাৎ কেবল 'সাজতে চায়', প্রজ্ঞায় এরা 'আডুলেসেন্ট' অর্থাৎ কাঁচায় দরকচা অপরিপক্ক; ব্যবসায়ে 'দালাল'। রাষ্ট্রনীতিতে আম্রিকার 'পোঁ'।

সুতরাং শো-কেস না করে উপায় কই? সেজেগুজে বসে না থাকলে 'মোয়াক্কেল' আসবে কেন? ডলার দেবে কেন?—ক্যানাডিয়ান প্রফেসর টেলারকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার মতো প্রবীণ অধ্যাপক সস্ত্রীক ছয় সপ্তাহ থাকার মতো রস এখানে কী পেলে?'

ছোটো চোখে কাতুকুতু হেসে ডক্‌টর টিলার বললেন, "কী জানো বাতাশারিয়া—বৃদ্ধা এবং ছেলেপুলে নিয়ে এলাম। বেশ লাগলো। একেবারে নির্ভেজাল অনুকরণ করে জাতকে জাত যখন মেতে থাকে পঞ্চতন্ত্রের টুপীর গল্প মনে পড়ে যায়। বেশ মজা!"...তখন মনে হলো টেলার সামাজিক ইতিহাসের অধ্যাপক, বর্তমানে 'মায়াবাদ' নিয়ে বই লিখতে ব্যস্ত। পঞ্চতন্ত্রের টুপীগুলো বাঁদররাই পরেছিলো বটে!

আরও বেশী করে যখন মনে পড়ে যায় প্রথম আমায় সেই কদিনের হোটেল বাস, তখন বুঝি কী বলতে চাইছিলেন ডকটর টেলার।

মিসেস টেলার বললেন,—'জানেন মিস্টার বাতাশারিয়া, চাইল্ড্‌মে একটা গ্রীন

কোকোনাট, জল খাবো বলে। হোটেল বয় এনে দিলো আনকোরা ডাবের মুখ কেটে স্ট্র ঢুকিয়ে। চোঁ করে টেনে দেখি,—ও মা, হুইস্কির স্বাদ, সেই সঙ্গে একটু যেন অন্য কি গন্ধ!'

সঙ্গে সঙ্গে বলি, "ত্রিনিদাদীয় ফার্নান্ডেজ রাম এবং ত্রিনিদাদীয় আঙ্গাস্টুরার গন্ধ! ন্যাশনালিজম পান করছিলেন মিসেস টেলার।"

"ত্রিনিদাদের ডাবেও রাম, জানতাম না।"

"ওরা ভাবছে, ও মজা না পেলে এখানে আর আসবেনই না হয়তো।"

"আসব না ঠিকই। কিন্তু যেতেও ইচ্ছে করে না। বেশ মজা।"

শচীনদাকে (শচীন্দ্রলাল ঘোষ—সাংবাদিক) দিল্লীতে শুধোতুম—"শচীনদা, কেবল ঐ অখাদ্য ডিটেকটিভ নভেলগুলো পড়েন; কী পান?"

"বোঝো না হে! পোলাপান।...চিন্তাশীল ব্যক্তি কিছুতেই চিন্তা না করে পারে না। তবে যদি ডিটেকটিভ নভেল পড়ো, বিনা চিন্তায় ছ ঘণ্টা পার করে দিতে পারো। মানসিক ঘুমই বলতে পারো।"

তেমনি কথা বলেছিলেন মিসেস টেলার। "কিছুই নেই তবু ছুটি-ছাটার দিনে একবার একটা জু-তে গেলে, বিশেষ 'এপ্' সেকসানে গেলে যেমন 'মজা-সে' কেটে যায়!"

বললেন, শুনলাম। ভালো কিন্তু লাগেনি।

টেলার বলেন, "খবরের কাগজ আছে, খবর নেই। পর্ণোগ্রাফীকে সংবাদপত্রে পরিবেশন করার কারিগরী অদ্ভুত। (এখন তো দেখছি ভারতবর্ষের রঙিন কাগজগুলোও একালের ধর্মব্যবসায়ী সাধুদের সঙ্গে একজোট হয়ে প্রগ্রেসিভ হারে পর্ণোগ্রাফির মূলতত্ত্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। খাজুরাহো, কোনারকের নব কলেবর হবে না এমন কী কথা আছে?) বইয়ের দোকানে যা বই, তা নিয়ে তো প্রায়ই পুলিস কেস হয় শুনতে পাই। ভালো লাইব্রেরী নেই; পুরো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আছে বহুতর চার্চ, চার্চের পাশে রাম-শপ্ এবং তারপর, তারপর সব।...বেশ কেটে যায়। ভাবতে হয় না।"

টেলার সাহেব হয়তো সবটা সত্য বলেননি। এদেশের শান-ধাক শৌকত,—কালো যদি শাদা বিয়ে করে আনতে পারে। দেশের 'গুণী' যাঁরা প্রায় সকলেরই স্ত্রী—শাদা। স্টেটাস এবং প্রেস্টিজের অঙ্গ একটা শাদা মেয়ে বিয়ে করে ঘরে পোষা। অবশ্য সে সব মেয়েদের দুঃখ-দুর্দশাও পরে দেখেছি। এমন বিবাহ টিঁকেছে আমি অন্তত দেখিনি। একটাই বলবো।

গিয়েছিলুম একটি ভারতবংশজাত হিন্দুর বিশাল শার্ট ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করতে। ফ্যাক্টরির মালিক মিস্টার সিং পরিচয় করালেন যুবক পণ্ডিতস্বামী'র সঙ্গে। মিস্টার সিং পরিচয় দিলেন যে পণ্ডিতস্বামী ভারতে ছিলেন; হিমালয় পরিক্রমা করে ইয়োগা শিখে এখানে ইয়োগা ডিমন্স্ট্রেট করেন। এখানে ইয়োগা বিদ্যালয়ও আছে (ইয়োগা—যোগ)।

বয়স ছাব্বিশের যুবা। চোয়াড়ে গাল। ঘাড় অবধি চুল। চাঁচাছোলা মুখ। শ্মশ্রুর

রেখাপাত অবশ্য ছিলো। তাও লুপ্ত। গায়ে কোম্পানীরই শার্ট। কালো টাই। চোখের জ্যোতি ধূসর।

কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় কোথায় হিমালয় পরিক্রমা করলেন।" জবাব এলো কাশ্মীর, লাদ্দাক, কাঠমণ্ডু, কোদাইকেনাল, উটী, কোয়েম্বাটুর।

আমি তো থ'। বলেন কি! এতো লম্বা হিমালয় সেরে এলেন?

হঠাৎ কেমন একটা ঘোলাটে আলো দেখলাম সিংয়ের চোখে।

চুপ করে গেলাম। ম'ম্-এর মিস্টার নো-অল্‌কেও বোকা সাজতে হয়েছিলো। আমি থেমে গেলুম।

আমার ভালো লেগেছিলো কাটিং ডিপার্টমেণ্টটা। মিস্টার পণ্ডিতস্বামী কেরানী। অফিসে রয়ে গেলেন। আমি কাটিং ডিপার্টমেণ্টে অনেকক্ষণ কাটিয়ে ধীরে ধীরে পথ গুলিয়ে ফেলেছি। ঘুরতে ঘুরতে মাল-গুদামের দিকে। বাক্সবন্দী পোশাকে নম্বর দাগছেন যে মেয়েটি তার রং চোখ চুল অন্য আকাশের। একটু দাঁড়ালাম।

ঘরটায় আলোর অভাব। একটা দরজা দিয়ে টেবিলটায় আলো পড়েছে। পেছনটা অন্ধকার। কাজের সময়ে আলো জ্বেলে নেওয়া হয়। মেয়েটির কাজের মাঝে মাঝে একজন বর্ষীয়া এল—কী যেন দেখছিলেন; খাতায় লিখে নিচ্ছিলেন, হঠাৎ সেই বর্ষীয়সী বললেন, "মিসেস পণ্ডিতস্বামী, এইচ্ সিরীজটার পরে এ সালটা বন্ধই করে দিন... স্পোর্টশার্টের কে সিরিজটার মাল দরকার। ওইটা ধরুন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনিও কি হিমালয়ে গেছিলেন মিসেস পণ্ডিতস্বামী?"

হেসে মহিলাট—মেয়েটিই বলি—বললেন,—"আপনিই মিস্টার বাতাশারিয়া? আপনি কী করে জানলেন—?"

"এখানে তো বেশী পণ্ডিতস্বামী নেই। তাই ভাবলাম—"

বর্ষীয়াটি আসতেই মেয়েটি গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো, "আপনার ফ্যাক্টরি ভালো লেগেছে জেনে ভালো লাগলো। ধন্যবাদ।"

অগত্যা সরে পড়লাম।

কিন্তু ডুবে যাওয়ার কিশোরের মুখে জীবনের অসহায় চাওয়া; সেই করুণ কিরণে মিসেস পণ্ডিতস্বামীর চাহনি আর্ত।

সে চোখ, সেই চাওয়া ভুলিনি।

বহুদিন পরে ফেলিসিটি-কম্যুনিটি হলে বক্তৃতা দিয়ে ফিরছি। ফেরার আগে কর্তৃপক্ষ কফির ব্যবস্থা করেছেন আমার দুর্বলতা স্মরণ করে।

যে মেয়েটি কফি দিলেন তাঁকে আমি চিনি।

মিসেস পণ্ডিতস্বামী।

হঠাৎ এক বাচ্ছা কোলে, এক বাচ্ছা হাতে উপস্থিত মিস্টার পণ্ডিতস্বামী। "নাও নাও। সামলাও। আর পারি না।"

মিসেস পণ্ডিতস্বামীর চোখে আবার সেই মজ্জমান অসহায় দৃষ্টি।

আমি একখানা বিস্কুট দেখিয়ে বসালাম একটি বাচ্চাকে। অন্যটিকে বাধ্য হয়ে তার মা-ই নিয়ে বসলেন।

পণ্ডিতস্বামী আমার দিকে চেয়ে বললো, 'আর আধ ঘণ্টার মধ্যে আমার ইয়োগা ডেমনস্ট্রেশন আছে। হিমালেয়ান ইয়োগা···লরা তুমি আসছো তো!"

"আমি!!"—লরা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

"চেষ্টা করেও পারবে না? না পারলে সব মাটি।"

"কিন্তু ডারলিং—"

কি বলতে যাচ্ছিলো লরা।

বাধা দিয়ে পাণ্ডিতস্বামী বললো, "এ মৌকা গেলো তো গেলো। তখন আমায় দোষ দিও না।"

কোলের বাচ্চাটার দিকে চেয়ে লরা বললো—আচ্ছা দেখি।

আমি সেদিন ওদের ইয়োগা ডেমনস্ট্রেশন দেখি।

মিস্টার পণ্ডিতস্বামী কতকগুলো 'আসন' করলেন। ঘর অন্ধকার করা হলো। স্টেজের পিছন, ধার, সব কালো বনাতে ঢাকা। তার মাঝে ছোটো একটা ছেঁদার হাল্কা নীল কাঁচের চোখ। তীব্র আলো জেবলে তার দিকে দর্শকমণ্ডলীকে দৃষ্টি সংবিদ্ধ করে রাখতে বলা হলো। মাঝে মাঝে ধূপের ধোঁয়া। টেপ-রেকর্ডে ওঁকার ধ্বনির গম্বুজী শব্দ সিকান্দ্রার গম্বুজের তলায় 'আল্লা হো আকবর'-এর বিলীয়মান শব্দ মনে করিয়ে দেয়। আমেরিকানরা যেমন অ-লৌকিক অনুভূতির তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে 'ইয়োগা-ইয়োগা' খেলায় মত্ত হয়, তেমনি। লস্-এঞ্জেলেস, ক্যুইবেক, মণ্ট্রিল-এর এরোড্রোমে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থার মধ্যে এমনি 'মেডিটেশন' ব্যবস্থাও দেখেছি। আমি 'বাতিক গৃহ', কারণ রঙিন এক ছিঁটে 'বাতি' থাকে।

কিন্তু খানিক পরে লরার মুখ দেখে আমি অবাক। আমাকে ডেকে বললেন, "কিছু মনে যদি না করেন, আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলুন। মিঃ পণ্ডিতস্বামীর দেরী আছে। ওঁকে সন্ধ্যার সময় আবার 'ইয়োগা' দেখাতে হবে।"

লরাকে আমি হাসপাতালে পেঁছে দিলুম।

নাম মেটারনিটিতে লেখানোই ছিলো।

স্ট্রেচারে করে ওঁকে নিয়ে গেলো।

কর্তব্যের অনুরোধে আমি লরাকে পুনশ্চ দেখতে চেয়েছি। পারিনি। নানা টাল বাহানা করে পণ্ডিতস্বামী আমাকে ঠিকানাও দেয়নি, খবরও দেয়নি।

হঠাৎ একদিন টেলিফোন বাজলো।

কণ্ঠস্বরে ত্রাস, পাংশুতা এবং সবচেয়ে যা আবশ্যিক, অবিলম্বিক উৎকণ্ঠিত আহবান।

"চিনলাম না তো!"

"ওঃ। সো—সরি!—আমি, আমি লরা পণ্ডিতস্বামী?"

"লরা মিসেস পণ্ডিতস্বামী ইয়োগা সিং ?"

কিন্তু উদ্দিষ্ট চপলতার পরিবর্তে যে তরল কণ্ঠ আশা করলাম, কণ্ঠে সে তরলতা পেলুম না। লরা কাঁদছে।

দেখা হলো ধনকুবের সিংয়ের বাগানের পাশে চাকরবাকরের ঘরের একখানায়।

লরা বিছানায় শুয়ে। গায়ে ঢাকা কম্বল। এক ফোঁটা রক্ত নেই বললে মিথ্যা বলবো। অবৈজ্ঞানিক কথা হবে। কিন্তু রক্ত থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। মৃত্যুর চিঠি, তাই অতো শাদা। লরা ধীরে ধীরে যা বললো তার নির্গলিতার্থ এই যে বাচ্চা দুটোর জন্যই তার ভাবনা। সেই দিন ইয়োগা করার আগেই তার সামান্য হেমারেজ হয়েছিল। চার মাস অন্তঃসত্ত্বা থাকার পর সেই রাতে হাসপাতালে ওর গর্ভটা নষ্ট হয়। সেই থেকে বিছানায় ; মৃত্যু নিশ্চিত।

মরতেই চায় মেয়েটা। বাঁধা মানেই ত্রাস।

বিলেতে যে ঘরে পণ্ডিতস্বামী থাকতো তার পাশের ঘরে থাকতো লরা বি-পিতার সঙ্গে। মাকে লরা দেখেনি। বি-পিতা পাঁড় মাতাল হলেও লরার যত্ন করতো। শোথ হয়ে মারা যায় বি-পিতা। তখন পণ্ডিতস্বামী লরাকে টাকা দিতো লরার দেহের বিনিময়ে। পরে ওরা বিয়ে করে চার্চে। এবং সস্ত্রীক পণ্ডিতস্বামী ত্রিনিদাদে ফেরে। অ্যাকাউণ্টেসীর সীও পড়েনি। কিন্তু শাদা-বৌ আনার দৌলতে সেদিন সমাজের উঁচু ধাপেই জায়গা হয়েছিলো। শার্ট ফ্যাক্টরির চাকরিও পেয়ে গেলো। বৌকে তাপ্পীতাপ্পা দিয়ে পণ্ডিতস্বামী এক হিমালয়ান গপ্পো ফাঁদলো ; ইয়োগার ভড়ং ছাঁদলো ; এবং ইয়োগা স্কুল করলো।

তখন পণ্ডিতস্বামী আমেরিকায় গিয়ে ইয়োগা স্কুল করতে চায়। লরাকে অত্যাবশ্যক। শাদা মাদার এবং ভারতীয় ইয়োগা-ফাদার, আমেরিকায় দারুণ ফলাবে।

"আমি যাবো না। এ ভাঁড়ামী আর ভাল লাগে না। আমি যেন সত্য দেখতে পেয়েছি। জীবনে আমি কখনো সুখে থাকা কাকে বলে জানি না। আমার বাচ্চারা আমার চোখে ভগবানের আলো ঢেলে দিয়েছিলো। আমার প্রাণে মাতা মেরীর প্রেম জ্বালিয়েছিলো। ওদের আমি এই ভীষণ জগতে ছেড়ে যাচ্ছি,—মনে হচ্ছে আমি এক মহাপাপী। আমার জন্যে নরক সব দরজা খুলে রেখেছে। তাই আপনাকে ডাকলুম। যদি শোনেন মরে গেছি, দয়া করে এমন করবেন যেন বাচ্চা দুটো আমার স্বামীর সঙ্গে না যায়।···ওদের চেহারা ভারতীয়দের মতো। বিশেষ করে রং। তাই আমার স্বামী ওদের একটুও চান না। বলেন—কুলি বাচ্চা বাড়ানোর জন্যে তোমার পেটের কি দরকার ছিলো ?"

আরও কথা হয়েছিলো কিন্তু এখানে তা অবান্তর।

লরা মারা গেছে।

পণ্ডিতস্বামী পোর্টোরিকোয় আশ্রম খুলেছে। পুনশ্চ এক শাদা-মাদার জুটিয়েছে। এবারেরটা পীনাঙ্গী ; শাঁসবতী। ভগবান পণ্ডিতস্বামীর ভগবতী স্ত্রী হবার দায় ও দায়িত্ব দুটিই বহন করার ক্ষমতা রাখেন। পণ্ডিতস্বামীর যোগ ফ্যাক্টরিতে পণ্ডিতস্বামী

ফেল করলেও মাদাম ভগবতী ফেল হবার পাত্রী নন। বাচ্চা দুটোর জন্যে ফ্যাক্টরিতে আমি কিছু করতে পারিনি। তবে বিশিষ্ট একটি দম্পতীর সাহায্যে একটা অস্ট্রেলিয়ায় এবং একটা কানাডায় 'দত্তক' করে পাঠানো গেছে। তারা ভালো আছেই মনে করি।

যে কোনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় আত্মসমীক্ষার চেয়ে আত্মম্ভরিতা এবং স্বার্থ-কেন্দ্রিকতা বড়ো হয়ে ওঠে। যে যার ঢাকনা বাজালে চলে না। যে যার কড়ি না গোছালে পিছিয়ে পড়া সুনিশ্চিত। ' যে দশটা পুরো-কে পুরোই 'নেপো'-দের দেশ সেখানে দই মাথার হাপুস-হুপুস শব্দটাই আসল কৃষ্টি। যার ধন তার তো তামাম সাফাই হয়ে গেছে। আরাওয়াক আদিবাসী ত্রিনিদাদে নেই বললেই হয়। সেই সেদিনের সাচ্চা ত্রিনিদাদীয়দের ধ্বনি শোনা যায় কয়েকটি আরাওয়াক গাঁয়ের নামে ;—তাকারিগুয়া, গয়াগয়ারী, তুনাপুনা, কারাপিচাইমা, মায়ারো, নাপারিমা, আরিমা, তোবাগো, বারাতারিয়া সবই আমিরিণ্ডিয়ান নাম। এমনি নাম ঃ শাকাশাকারি মোকোরোপো, তাবাকীৎ, তালপারো, শুপারা, কুনুপিয়া, গুয়াইপো, গুয়োনাপো, আরুকা, তোকা, মাকুইরিপো।

সে কারীব-আরাওয়াক খতম হয়ে গেলো। ইংরেজরা কেড়ে নিল স্পানিশদের কাছ থেকে এ দ্বীপ। বেরিও ছিলেন স্পানিশ। ১৫৯৫-তে রালে তখন এলডোয়াডোর খোঁজে ওরিনোকোতে যাত্রা করেন। বেরিও রালেকে সম্বর্ধনা জানান। রালে তখন গালফ অব পারিয়ার দক্ষিণ তীরবর্তী লো-ব্রেতে নোঙ্গর করে আবিষ্কার করলেন বিশ্ব-বিখ্যাত পীচ লেক। তাঁর জাহাজে 'কল্‌ক্' হিসেবে ব্যবহার করে খুশীতে ডগমগ। কবুল দিলেন নরওয়ের কল্‌ক্-এর থেকেও ভালো। আজ পৃথিবীব্যাপী এই পীচের একচেটিয়া ব্যবসায়ের মালিক এক আম্রীকি কোম্পানী। ভেনেজুয়েলার পীচের অতো খ্যাতি নেই। বেরিওকে বন্দী করে রালে ত্রিনিদাদ কেড়ে নেয়। রালে বেরিওকে বাধ্য করে ওরিনোকো-অভিযানে তার পথপ্রদর্শক হতে। তখন রালে এলডোয়াডোর খোঁজে মত্ত।

এইখানে বলে রাখা ভালো ত্রিনিদাদ ভূখণ্ড দ্বীপ হলেও দক্ষিণ আমেরিকারই অংশ। কোনও তুলকলাম (কাটাক্লাসমিক) ভূমিকম্পের ফলে, মুখ থেকে দাঁত ঢিলে হয়ে যাওয়ার মতো, ত্রিনিদাদ নামক প্রায় চৌকো 'মোলার' দাঁতটি ভেনেজুয়েলার মাড়ী থেকে ঢিলে হয়ে খসে গেছে মাত্র। উত্তরে ভেনেজুয়েলার পয়েণ্ট পীনা এবং ত্রিনিদাদের শাকাশাকারীর মধ্যে সাত মাইলের প্রণালীটির নাম ড্রাগনস্ মাউথ। ড্রাগন না হোক হাঙ্গরে হাঙ্গরে ছয়লাপ। দক্ষিণে ভেনেজুয়েলার ওরিনোকো নদীর মোহনা এবং ত্রিনিদাদের পয়েণ্ট ইকাকাস। মধ্যে মাইল দশেক সমুদ্র প্রণালী, নাম সার্পেণ্টস্ মাউথ। ড্রাগনস মাউথ এবং সার্পেণ্টস মাউথের দুই আঁকশির মধ্যে স্থিত গালফ অব পারিয়া। লেক মারা-কাইবো থেকে গালফ অব পারিয়া পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার উত্তর ভাগেব সমুদ্রে তেলের বাসা। এই তেল দিয়েই আজ ত্রিনিদাদের ধন দৌলত। ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, টেক্সাকো, কালটেকস্ এবং এস্সো কোম্পানীরা এই সব তেলের স্বত্ব উপভোগ করে। ত্রিনিদাদ সরকার কেবল কর-গ্রহণ করেই খালাস। শোনা যায় একবার মহারাজ গায়কোয়াড়

ত্রিনিদাদের দক্ষিণাংশে বিপুল জমি কিনেছিলেন। তখন তেলের সুলুক সন্ধান জানা যায়নি। তার পরই তাঁকে বিবাহ করেছিলেন আমেরিকান ললনা। সেই ললনাই গায়কোয়াড়কে দিয়ে এ অখদ্যে (!) জমি বেচিয়ে দেন! ফলে বর্তমান টেকসাকো। আমেরিকান কোম্পানীর সম্পত্তি!

দক্ষিণ ত্রিনিদাদেই এই প্রসিদ্ধ পাহাড় যার তিন চূড়া দেখে কলম্বাস নামকরণ করেছিলেন এ দ্বীপের। দক্ষিণ ত্রিনিদাদে কলম্বাস-পয়েন্টে একটা স্তম্ভ সাক্ষ্য দেয় কোথায় কলম্বাস নোঙর ফেলেছিলেন। সেকালে জায়গাটা নিশ্চয় এতো নোংরা ছিলো না। কলম্বাসের জাহাজ 'পিণ্টা'র একটা নোঙ্গর গাল্ফ্ অব পারিয়ার ঝড়ে হারিয়ে যায়। সেই নোঙ্গরটাই নাকি আজ ত্রিনিদাদের মুাজিয়মের দোরে রক্ষিত। গত মাসে এ দেশের সংবাদ (তাতে সবই বাদ, সং ছাড়া) পত্রে একটা খবর দেখলাম। কলম্বাসের জাহাজের গলুইয়ের একখণ্ড কাঠ (!) নাকি বিক্রী হচ্ছে [মহামতি যীশু যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন সেই ক্রুশের একখণ্ড কাঠও বিক্রী হবার কথা পড়েছিলাম। সম্প্রতি মহামতি পোপ ফতোয়া দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন—'যীশু সত্য, কাঠও সত্য, মিথ্যে কিছু নয়!' ফলে কাঠের টুকরোর মালিকাঈন নিজেকে এখন লক্ষপতি বলে বোধ করার সুযোগ পেয়েছেন]। ফলাও করে গত মাসে আবার খবর ছাপানো হয়েছে মহর্ষি পোপের আশ্রমের বিদ্বজ্জন-সমাজ সে কাঠ পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক (!) সংবাদ দিয়েছেন অবিকল সেই ক্রুশ্-এরই কাঠ (!)।

ত্রিনিদাদের উত্তর দিকটায় একটা পাহাড়ের সার। তার পরেই সাভানা। সেই সাভানায় পোর্ট অব স্পেন শহর। শহরটা ছোটো, নোংরা, একেবারে যেন গা ছড়িয়ে বসে পড়েছে। ক্লান্ত। চিনির বদৌলত এবং ক্যারিব সাগরের প্রসিদ্ধ বন্দর হিসেবে প্রাচীন বোম্বেটে আমল থেকেই পোর্ট অব স্পেনের খুব নাম। ত্রিনিদাদের উত্তরাংশ স্প্যানিশ এবং পর্তুগীজদের বাস। আখ, কোকো, কফি, সাইট্রাস, বানানা এস্টেট। এই পোর্ট অব স্পেন থেকে নিয়ে একেবারে সাঁগ্রে-গ্রান্দে পর্যন্ত বিস্তৃত। চিনির জন্য কাউন্টি কারোনী বিখ্যাত। ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সব-সে-বড়া চিনিকল এই টেট এণ্ড লায়াল-এর চিনিকল। আরীমা ছিলো প্রাচীন কালের স্প্যানিশ নগরী। এখন সাঁগ্রে-গ্রান্দে এবং আরীমা ক্ষীয়মান শহর।

কিন্তু যেখানেই যাওয়া যাক ঐ একটা জিনিস চোখে পড়ে। এরা নিজেদের শাদা করতে চায়। ঐ মিঃ পণ্ডিতস্বামীর মতো শাদা মেয়ের পেট চায় শাদা বাচ্চার জন্ম দিয়ে রংটা পালটাবার ফিকিরে। এক চীনী-রা ছাড়া, কী আফ্রীকান, কী ইণ্ডিয়ান— সবাই চায় খ্রিস্টীয় হেলেনিক সংস্কৃতি। সবাই চায় শাদা হতে। বারবাডোজে এটা সমাজের স্তরে স্তরে প্রত্যক্ষ। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমাজবিধানের মনস্তত্ত্বে এই শুভ্র-শুচিবাঈ শ্বেতরোগের মতো অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য।

বিলিতি হোটেলে থেকেছি। বিলিতি হোটেল বেশ বিলিতি; বুঝতেও যেমন কষ্ট হয় না, গ্রহণেও মনে হয় স্বাভাবিক। কিন্তু পার্ক হোটেলে প্রবেশ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত পদে পদে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়ে যে এরাও বিলিতি। কিন্তু এরাও যে

বিলিতি বুঝতে ভারি কষ্ট হয়। কালো মসৃণ চামড়ার মধ্য থেকে ঠিকরে চেয়ে থাকা ঝকঝকে দৃষ্টি, সরল সতেজ দাঁতের ব্যবহার, পেশীবহুল বলিষ্ঠ গতি—এর কিসসুই বিলিতি নয়। এ জ্বলন্ত সূর্যক্ষরা চেহারা। এ্যাংলো-স্যাকসন রৌদ্রাল্পতায় অসম্ভাবনীয় ঐশ্বর্য। কিন্তু সে ঐশ্বর্য ঠেলে চেপে রেখেছে হোটেলের উর্দির পোখতো পালিশ-চোস্ত পায়জামা ; কোট, টাই, বাহারে-কলার, য়ুনীফর্ম।

সেই প্রথম সন্ধ্যায় স্থান পেয়েছি প্রথম সারির হোটেল কুইনস্ পার্ক হোটেলে। আমি তখন ভারত সরকারের অতিথি। আমার অভ্যর্থনা করতে স্বয়ং রাষ্ট্রদূত, আমার বন্ধুটি অপেক্ষমান।

কিন্তু আড়ষ্ট বোধ করছি ঐ নিগ্রো সাহেবিয়ানা দেখে। কেমন উৎকট লাগলো যেন। বন্ধুবর দুটো ড্রিঙ্কস অর্ডার দিলেন। আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললেন—"অদ্ভুত লাগে ; নয় ?"

আমি বললুম—"প্যারিসে, লণ্ডনে কিন্তু লাগেনি।"

"প্যারিসের কথা তুলো না। রোমের কুয়িনালে হোটেলের কেতাদুরস্তপনার নাম আছে। তেমনি নাইল-হিলটন। কিন্তু যতোই সেখানে কেতাদুরস্তপনা দেখো, এখানকার মতো নয়। কী জানো। অনেকদিন হয়ে গেলো তো। দেখছি, এরা জাগতিকভাবে, স্বভাবে, আজও লোটাস ইটার্স। আজও এদের চরম বিলাস লাইমিং।"

"সেটা আবার কি বস্তু ?"

"যেমন আমাদের দেশের রকবাজী একটু অন্য ধরনের। আড্ডাও নয়। স্রেফ পথের মোড়ে, পার্লারের ধারে, জাহাজ-ঘাটার বাইরে, হেথা-হোথা মানুষের আনাগোনার পথে দাঁড়িয়ে থাকা। অপেক্ষা করা। কোনো কিছুর জন্য নয়। তবু যদি কোনো কিছু ঘটে যায়। মজা দেখা। জীবনের মজা আলস্যভরে দেখা। মাঝে মাঝে কথার বাণ ছুঁড়ে মারা। যার গায়ে লাগলো লাগলো। মাঝে মাঝে এ সব নিয়ে হুজ্জৎ হয়, কাটলাশ চলে,—পুলিশ কেস হয়। এই জড়ত্ব, অবসাদ, মন্থর স্থিতিশীলতা থেকেই ক্রাইমসের জন্ম।...সেই এন্হনী ট্রোলোপের দিন থেকে আজ অবধি যতো ভ্রাম্যমানের পাঁজী ওলটাবে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জীবনে লাইমিং টিপ্পনী পাবে...।"

"অথচ টিপ্পনীর যোগ্য অভ্যাস এটা নয়। এর পেছনে এক মর্মান্তিক ইতিহাস চোখ মেলে আছে। এদের প্রকৃতির ধর্মে ঘুমিয়ে আছে দুশো বছরের দাসত্বের স্মৃতি। সেই সব কলো দিনের স্বপ্ন ছিলো একটু বসে থাকা, একটু জিরুনো। রোববারে ওদের গির্জায় যেতে ভুল হতো না, তবু ভগবানের নামে ওরা বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুঁজে 'বসে' থাকতে পেতো। প্রার্থনার পর একটু গল্প-গাছা করতে পেতো। আজও তাই বসে বসে কিছু না করে শুধু বসাটাই উপভোগ করায় ওদের তৃপ্তি। নাম লাইমিং।"

"নৈলে ভাবতে পারো এ শহরের বনেদী সড়ক ফ্রেডরিক স্ট্রীটে সাজগোজ করা এক-পাল তরুণ-তরুণী-যুবক-বৃদ্ধ শুধু বসে দাঁড়িয়ে জীবন উপভোগ করে ?"

আমায় নিয়ে বন্ধু যাবেন মারাভাল পাড়ায় এক ককটেল পার্টিতে। চান সেরে তৈরি হয়ে নিলাম।

পার্টি ছিলো মারাভাল রোডে। অস্ট্রেলিয়ান ট্রেড কমিশনারকে আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা করেছেন শহরের বন্ধু এবং নমস্য জিউ ব্যবসায়ী জেকব বেন মুলো।

বাগানের ওপরে মস্ত পোর্টিকো। পোর্টিকোর পরে লম্বা বারান্দা। নতুন বাড়ি সবই নানা-প্রকার জিওমেট্রিকাল ছন্দের খুপরি কাটা ফাঁপা ইঁটে তৈরী। বাংলো বাড়ি হলেও জালুসী-প্যাটার্নে এমন দেয়াল এবং রেলিং করে, মনে হয় জাপানী হালকা-মৃদুতা আনার চেষ্টা স্পানিশ বোরোক-এ বাধা পেয়েছে। উত্তর-যুদ্ধের রেখা-বিন্যাসের সরলতা আছে; আর আছে রংয়ের বিচিত্রতা। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা রংপ্রিয়। বাগানেও যেমন, পোশাকেও যেমন স্থাপত্য শিল্পেও তেমন বর্ণাঢ্যতা এদের মনকে শিশু করে রেখেছে। পাকা মনের পরিচয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সমাজে পাঁতি পেলেও পাত্তা মিলবে না। গাড়ি কিনবে টাউস টাউস; মদ খাবে গেলাস গেলাস; গান বাজাবে জাজ; রান্নায় লঙ্কার চেঁচানি স্টম্যাকের দেয়াল ফাটানো; আর নখে, ঠোঁটে, চোখে রং রং রং। দেহের রেখাকে বলয়িত উত্তুঙ্গ করে অতি স্পষ্টতায় কটকটে করে তোলায় যেমন বাহাদুরী, তেমনি বাহাদুরী চুলের বদৌলত শরীরের দৈর্ঘ্য বাড়ানোয় কমানায়। ত্রিনিদাদের মেয়েদের লাস্য এবং চটুলতা নিয়ে হোটেলের প্রবাদ বাক্য যে মার্তিনিকানদের পরেই ত্রিনিদাদের মেয়েরাই নাকি নিদারুণ বাসব গন্ধী নর্মিষ্ঠা। শয্যা-সহচরী হিসেবে এদের মতো কুশলী বেহিসিবী নাকি দুর্লভ—

বন্ধুবর আমার সঙ্গে ঝটাপট পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রায় বিশ পঁচিশ জনার। আমার আবার ছাই এমনিতেই নাম মনে থাকে না। তাও পুস্হাবেকার, কির্লোস্কর, আহ্লুওয়ালিয়া, চাকলাদার পর্যন্ত—তবু যা মনে করতে পারি, এখানে স্টিফেন, টমাস, গেব্ল্ এবং স্মাইথীর ভীড়ে একেবারে বিপজ্জনক। স্থানীয় ভারতীয়দের নাম রাম-এ রাম-এ ঠাসা। মনে রাখা আরও দুরূহ।

ওরই মধ্যে জমে গেলাম যে চেয়ারখানায় তার একধারে প্রাক্তন শিক্ষাসচিব রয় জোসেফ অন্য ধারে ফরাসী দূতাবাসের মিস্ কোলীন দ্যু প্যাঁ। মিস দ্যু প্যাঁকে বর্ণনা করার ইচ্ছে ছিলো আমার। কিন্তু ডারেলের চোখ নেই; ম'ম-এর কলম নেই। এ-যাত্রা থাক। বুঝে নিতে হবে যে আমি মোটেই উঠছি না দেখে বন্ধুবর বারকতক এসে হেসে চলে গেলেন। হিন্দী ভাষায় বলেও গেলেন, "তবু তো খাচ্ছো গ্রেপ্ ফ্রুটের রস। আঙুরের রসও নয়।"

আমি বললুম, "ওহে শেয়াল—নাগালটাই যাদের গুচ্ছ অবধি পেঁছে গেলো, রস তাদের অধর-বিধৃত।"

স্টীল ব্যাণ্ডের কথা উঠেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি বলি, মাথায় আসে না সে বাদ্য কেমন হবে।

কানে আসবেই। এবং যদি এমন কথা অন্য কানে যায়, কান কাটা যাবে। এদেশে 'কালচার' কথাটার খোশবয় অনেক দূর পর্যন্ত যায়। লেখাপড়া কালচার নয়। পোশাক কালচার নয়। ত্রিনিদাদে খবরের কাগজে কাগজ আছে; খবর নেই। তবু সেটা কেনা

কালচার। তার বিরুদ্ধে কিছু বলা ইনটেলেকচুয়াল ব্যসন; কিছু করা—কালচারে বাধে। নাচ কালচার; গান কালচার। দুটোই বিলিতি। তাই 'হায় কালচার' ধ্বনি আছে। 'ফোক' কালচার চাগিয়ে তোলার চেষ্টা আছে। শুধু সেই 'ফোক্স'-ই আজ লুপ্ত। সারা আফ্রিকা, ভারত, চীন এখানে জড়ো। তবু এরা ন্যাশনালিজম্ গড়বে। কিন্তু সে ন্যাশনাল কালচারটা কী হবে ভেবে পাচ্ছে না। কালচার আরম্ভ করলেই দেখা যায় নানা জনের নানা শুচিবাঈ। পোর্ক, ব্লাকপুডিং নিগ্রো কালচার; চিংড়ি এবং চপ্-সোয়ে চিং কালচার; দাল-রোটি কুলি কালচার। ত্রিনিদাদ কালচারটাকে কী উপায়ে খাড়া করা যায় এই চিন্তায় পড়েছেন কালচার-চারণ সরকার। নাচকে অনুবাদ করেছে কার্ণিভাল জাম্প-আপ-এ,—কালচার; গানকে অনুবাদ করেছে ক্যালিপসোতে—কালচার; যন্ত্রসঙ্গীতকে অনুবাদ করেছে স্টীল ব্যাণ্ড-এ,—কালচার। ক্লাবকে অনুবাদ করেছে নাইট ক্লাব-এ—ত্রিনিদাদের বেলি ড্যান্সিং নাইট ক্লাব—কালচার! আর যদি কিছু বলেন, লেখেন, কইতে যান, শেখাতে যান—এবং যদি শাদা হন, ব্যস্! দফা গয়া। এবং যদি বলেন বাহবা, বাহবা, বেশ।...ইভ্ন হোয়াইট্ পীপ্ল্ লভ্ টু-উ ব্যাড উই কালচার!!

ছোটো ছোটো দাঁত, ডাগর চোখ দুই-ই হাসিতে ভরে উঠলো। চেয়ে দেখি দ্যু পঁ্যা-কে।

আমি চুপি চুপি কানে কানে বললুম—"কেউ কি আপনাকে বলেনি আপনার চোখে, ঠোঁটে, বিশেষ ঐ প্রীরাফেলাইট আঙুলে সিগারেট মানায় না? আপনার নাক মুখ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে দেখলে মনে হয় পদ্মবনে আগুন লেগেছে।"

দূর করে ফেলে দিলো সিগারেটটা দ্যু পঁ্যা।

যোগ দিলেন তখন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী মিঃ রয় জোসেফ স্বয়ং। কথার মোড় ফিরলো রাজনীতি ঘেঁষে। 'ফেডারেশন' বনাম 'জাতীয়তা' নিয়ে।

ফেডারেশন ভেঙে যাওয়া এবং ন্যাশনালিজমের বন্যা প্লাবন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুটি অনবদ্য অধ্যায়। ইউনাইটেড নেশনস চার্টার যখন লিখিত হলো—তখন চিয়াং-কাই-শেক এবং রুজভেল্ট চার্চিলকে চাপ দিয়েছিলো। ইয়ালটায় স্টালিনও। তার প্রধান কারণ হিসেবে ভারতবর্ষের অখণ্ড এবং ব্যাপক শক্তিসাধনা। ইংরেজের বিপক্ষে এতোকাল ধরে অন্য কোনো দেশ বা জাত এতোদিন সশস্ত্র বা নিরস্ত্র যুদ্ধ চালায়নি। তারপর কোহিমা থেকে করাচী পর্যন্ত যা হলো, সেই বিপ্লবই পথ দেখালো রুজভেল্টকে।

তখন পর্যন্ত রুজভেল্ট এবং চিয়াং একই মানবতাবাদে পুষ্ট। শুধু রক্ত স্টালিনের নোংরা হাত সম্বন্ধে এদের মন খুঁৎ খুঁৎ করতো। কিন্তু হিটলারের হাতে এতো এতো রক্ত তখন যে স্টালিনের হাতও গোলাপী হয়ে গেলো। ফলে যা কখনও সম্ভাবনীয় ছিলো না, তা হলো। ব্রিটিশ সিংহের ল্যাজে মোচড় দিয়ে আমেরিকা তার বাণিজ্য সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে নিলো। কিন্তু এ সবেরই অজুহাত ছিলো ভারতের

বিপ্লব। ফলে চার্টারে লেখা হলো সাম্রাজ্যবাদই থাকবে না। সেই সংবাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজও হাতছাড়া হওয়া অবধারিত। আলাদা আলাদা এ দ্বীপগুলো স্বাধীন হলেই তারা আমেরিকার সাঙ্গাৎ হয়ে পড়ছে। ও-এ-এস-এর মেম্বর হবে। অথচ রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ গেলেও ইংরেজ ধনিক সাম্রাজ্যবাদ ছাড়তে রাজী নয়। আমেরিকার হাতে তো নয়ই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মদে, তেলে, চিনিতে, বক্সাইটে, সোনায়, হীরেতে—ইংরেজের প্রচুর টাকা খাটছে। এ সাম্রাজ্য তুলে দিলে খাবে কি ইংরেজ! আসলে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। আমেরিকা এবং ইংরেজের দাবা খেলাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সেরা ঘুঁটি।

ইতিমধ্যে ক্যুবা থেকে আমেরিকা বিদায় হয়েছে। তেমনি হেইতিতে এবং পোর্টোরিকোয় আমেরিকা জেঁকে বসেছে। কাজেই ইংরেজ চাইলো সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফেডারেটেড হোক। হয়েও ছিলো। টিঁকলো না। ফেঁসে গেলো।

এ কাণ্ড যখন চলছে তখন আমি (ব্রিটিশ) গায়ানায়। ফেডারেশনে গায়ানার অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে আমার মতামত আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ ছেদী জগন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি দেখেছিলুম ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। নিগ্রোরা কালধর্মে একদা আফ্রিকীই হবে। কাজেই ছেদী জগনের সোস্যালিজমের তাতে বারোটা বাজবে। ছেদী জগন তাই ফেডারেশনে যোগ দেননি। আমি বলেছিলাম—"ফেডারেশনে যাবৎ না এক ডজন প্রেসিডেণ্ট এবং সওয়া ডজন প্রাইম মিনিস্টর হবে, তাবৎ ম্যানলী, উইলিয়ামস্ গ্রাণ্টলীর খাওয়াখাওয়ি যাবে না। এক হওয়া যুক্তরাষ্ট্র চাইবে না। গিলতে গেলে টুকরো করাই বিধি।"

জামায়কা প্রথম ফেডারেশন ছাড়লো। তারপর ত্রিনিদাদ। তাড়াতাড়ি ফেডারেশন পার্লামেণ্ট নিজেদের মাইনে নিজেরাই পাশ করিয়ে ফেডারেশন তহবিলের টাকা ভাগ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ইংরেজ সরকার রাতারাতি পার্লামেণ্ট করে ফেডারেশনের সেই অর্ডারটি নাকচ করিয়ে রাষ্ট্রীয় ধন আইনত আত্মসাৎ করার দৃষ্টান্তটি ধামা চাপা দিয়ে বাঁচেন।

অবধারিত ভাবে কালচারের কথা উঠলো। উঠলো 'রেস্' সমস্যার কথা। সবে তখন লণ্ডনের নটিংহিলের রায়ট হয়ে গেছে (এখনও রায়ট চলছে)।

'জাতীয়তা-জাতীয়তা'! কী করে হবে। দেশটা কি! প্রথমে স্পানিশ, পরে পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ। তার মধ্যে এলো লেবানন, সিরিয়া থেকে জু, খ্রীষ্টান, মুসলমান। স্পানিশরা খতম করে দিয়েছিলো শান্তজাত আরাওয়াকদের। নিগ্রো, চীন এবং ভারতীয়। ভারতীয়েরাই সর্বশেষে আসে। কিন্তু চীন এবং ভারতীয়েরা চটপট স্বাবলম্বী হয়ে ব্যবসায়ে ধনে এগিয়ে গেলো। ফলে নিগ্রোরা করে হিংসে। নিগ্রোদের নিজস্ব বলতে তখন ভাষা নেই, পোশাক নেই, সংস্কৃতি, ইতিহাস—কিছুই নেই। তাই ওদেরই কালচার পিপাসা অত্যধিক। গ্রীক-লাতিন আওড়ালে ওরা যত বেশী নিজেদের কালচার্ড মনে করে বান্টু, হটেনটট্ হাউসা, উবাঙ্গি কিংবা আশাণ্টির জ্ঞানে অতোটা কালচার্ড মনে করে না। ওদের দিব্যজ্ঞান হয়েছে যে ওরা যখন য়োরোপীয়ান সেজে

কালচার্ড হয় তখনও শাদারা হাসাহাসি করে ; যখন পাকাপাকি আফ্রিকান সাজে হৈ চৈ করে তখনও হাসে। কিন্তু পয়সা প্রথমটায় ওদের খরচ হয় ; দ্বিতীয়টায় হয় রোজগার। কাজেই কালচার এরা বেচে। নাইট ক্লাবে যদি ভূডু, জিঙ্গো, রাম্বা কিম্বা লিম্বো নাচ এরা না দেখতে পায় কালচার বন্ধ হয়ে যাবে।...এক ত্রিনিদাদেই নিয়ম আছে বিদেশী এন্টারটেনার শো দেখতে এলে স্টেজে স্থানীয় এন্টারটেনারকে পয়সা দিয়ে ডাকতে হবেই।

শুনতে ভালো লাগছিলো। দ্য প্যাঁ বললেন—"কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে স্পষ্ট একটা অন্য কালচার বোঝা যায় ; চীনাদের মধ্যেও। নিগ্রো কালচারটি কী বুঝি না। ওরা চেয়েছিলো সমান হয়ে যাবে। বুঝেছে তা হবে না। কাজেই কালচার খতম।"

তাই তো ভারতীয় চীনা কালচার মেড ইন্ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিছুতেই বিক্রি হতে চায় না। এখানে বাজনা ঢোলক ; গান,—রামায়ণ কিংবা কবীরের পদাবলী। আজকাল ফিলমী গান চলছে। ভারতীয় গাইয়েরা এসে ভারতীয় গান গায়। শোনে সবাই। শেখে। এবং মাঝেমাঝে বাদ দিলে—আফ্রিকান গাইয়ে কেউই এসে আফ্রিকান গায় না, গাইলেও কেউ যাবে না। চীনাদের যা কিছু হয় চুপ চাপ।

মাঝে মাঝে এ নিয়ে গোলমাল ঠেকে। হোটেলে, নাইট ক্লাবে, কখনও কখনও আমেরিকান টুরিস্ট মনকে তোয়াজ করতে 'ভারতীয়' কৃষ্টি দেখানো হয়। তখন 'ভারতীয়' নাচ, 'ভারতীয়' গান চলে। সে যে কেমন 'ভারতীয়'—বলা যায় না। একবার ভারতীয় দূতাবাসের এক প্রতিনিধি মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা হলো। প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন স্থানীয় ডাক্তার দুবে। তাঁর বক্তব্য, আসল ভারতীয় গান নাচ এতই শিল্প ও রুচিসঙ্গত ব্যাপার যে 'ভারতীয়' বলে এই নাচ গান চালু করার বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আমিও সায় দিয়েছিলাম। কমিশনার মহোদয় বলেছিলেন আমি নাকি নাক উঁচু গ্রামারিয়ানের মতো ব্যবহার করছি। সবিনয়ে আমি নিবেদন করলুম 'ইংরেজ' পোশাক এবং আদবকায়দা বলে জাপানে যদি উৎকট একটা কিছু চলতো ইংরেজ রাজপ্রতিনিধি সেটা উড়িয়ে দিতেন কি-না। ডাঃ দুবে টিপ্পনী কাটলেন নন্‌ভায়লেন্স এবং টলারেন্সকে অনেক স্থলে লোকে আলস্য এবং অনীহা বলে ভুল করে। ব্যস, যা বেধে গেলো সে এক 'বিরোত' ব্যাপার।

ক্যানাডার এক্সপোর 'ভারতীয়' শো ত্রিনিদাদ প্যাভিলিয়নে হচ্ছে। এখানে টেলিভিশনে দেখছি। একটা কণ্ঠা-তোলা মেয়ে একটা শাড়ি জড়িয়েছে। মাথায় কেশ-রাশিকে করে তুলেছে যেন জ্যাকুলীনের মাথার পাখির বাসা। তারা চারধারে গুচ্ছের কাগজের ফুল। প্লাস্টিকের হার, স্পানিশ বালা, স্যাণ্ডেল চটী পায়ে নাচছে সে মেয়ে। কেবল হাত ঘুরছে। যেন কব্জীর এক্সারসাইজ। সে হাতে একখানা থালাও আছে। নিতম্ব নামক অনতিতুঙ্গ বিন্যাসটি ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরছে যেন ঘড়ির দোলনার সঙ্গে কেউ কাপড় ঢাকা রুটিবেলা চাকী বেঁধে দিয়েছে। পদবিন্যাস স্যাণ্ডেলিত। সঙ্গে থালা বাজিয়ে গান গাইছে—তেরী-মেরী-তেরী-মেরী...মুহব্বৎ হো গইয়া ।। এবং ব্যাণ্ড বাজছে ঢোলক, লম্বা লোহার ডাঁটির গায়ে হ্রস্ব লোহার U মার্কা ডাঁটির বাজনা, করতাল,

হারমোনিয়াম, বেহালা,—আর কী ? বোধ হয় স্পানিশ শক্-শক্ ইতালিয়ান মান্দোলীন, উৎকট ক্লাভোলীন,—ব্যস, হিন্দ্ আর্কেস্ট্রা। নাচ শেষ। শাদা হাতের উদ্দাম করতালি। ভারতীয় সঙ্গীত—"ভেরী একসাইটিং—হট্ লাইক্ ফায়ার !"

আমি ত্রিনিদাদে নাগাড়ে বিশ-বাইশ বছর কাটিয়েছি, এবং ভারতীয় কৃষ্টির এই দিকটা লক্ষ্য করে বহু জোর জুলুম করে (পরে স্বর্গীয় হুমায়ুন কবীরকে বলে) ত্রিনিদাদে ICCR-এর পক্ষ থেকে কোন দার্শনিক Ph. D না পাঠিয়ে নাচ-গানের শিক্ষক পাঠাতে প্রায় 'বাধ্য' করেছি। এদেশের মনে ঢোকার সেরা সড়ক নাচ ও গানের ম্যাজিককে বাঁধানো। ফলে কৃতী শিক্ষকরা গেছেন ; প্লে-ব্যাক গাইয়েরা গেছেন। বর্তমান গানের এবং নাচের ভোল পালটে গেছে ত্রিনিদাদে। হেমন্ত মুখার্জি, মহম্মদ রফী, গীতা দত্ত, মুকেশ, কিশোরকুমার, মান্না দে প্রভৃতি কতো কৃতী গাইয়ের দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গেছেন। আমার বাসায় সকলেই এসে আনন্দও করেছেন। কেউ কেউ থেকেছেনও। তখন আমার লেখা নাটক গান ত্রিনিদাদে খুব জনপ্রিয়।...তবুও সরকারি ব্যবস্থায় ত্রিনিদাদের ভারতীয় কৃষ্টি যখন বিদেশে রপ্তানি হয় তখনও সেই পঞ্চাশ বছরের পুরোনো বস্তাপচা মালই যে কেন যায় বোঝা গেলেও কিছু বলা অসঙ্গত।

এই গানের মাধ্যম ভারতীয়েরা পেলো কোথায় ?

প্রথম প্রথম যখন ভারতীয়েরা এখানে এলো, ভোজপুরী কায়দা, রামায়ণ গান, অন্ত্যেবাসী ব্রাত্য প্রথা-আচার-রীতি নিয়ে এলো সঙ্গে। আজও বিবাহে, অনুষ্ঠানে, ব্রত-ব্রতে সেই সব ব্রাত্য প্রথার সমাবেশ। তারপর কিছু কিছু মিশনারী হিন্দুরা এলেন। তাঁরাও কিছু পরিবর্তন আনলেন। 'জাত'-এর ধুয়া প্রখরই রইলো। সামারু, সম্পৎ, ফুলবতিয়া, বুধু, সোঁবারী, মুংগরিয়া, নানকু, এসব নামে আজও পয়সার খ্যাতিতে উঁচু-ধাপের মানুষ আছে। সেই তারা যখন হাতের কোদাল, ঝাঁটা, তুরপুন ছেড়ে এখানে এসেছিলো, সঙ্গে এনেছিলো ঢোলক, কাঁসি, দান্তাল এবং করতাল ; তাসা, মঞ্জীরা, রামশিঙ্গা এবং ঢোল। এখনও ঐ সবই। সেতার-তবলা যোগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচলন সাম্প্রতিক কালে হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারে প্রচলিত ঐ কাঁসী-দান্তাল। ভাগবতের কল্যাণে ব্রাত্য ধ্বজা পুজা, গাছ পুজা, চতুষ্পদ পুজো, গো-শালা পুজো ইত্যাদি এখানে মর্যাদা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, গভীর বিশ্বাসে আঁকড়েও আছে। যদি এরা সূক্ষ্ম বেদান্ত, ব্রাহ্ম, বৈদিক কিম্বা আর্যসমাজী এ্যাবস্ট্রাকশন্ নিয়ে আসতো, স্থানীয় ক্যাথলিক এবং এ্যাংলিকান ধর্মের দাপটে ভেসে যেতো। তাই এদের আমি সাবাস দিই।

একগাদা গোবর-মাটি লেপা গোবর্ধন পাহাড়কে সাতদিন ধরে পুজা করে ওরা ভাগবৎ পাঠের মঞ্চে। ওরা বাঁশের ওপর রাঙ্গা ধ্বজা তুলে দোরে বসিয়ে প্রমাণ করে আপন ইজ্জৎ, দেশ স্বতন্ত্রতা। বিদ্রোহী ভারতীয় রক্ত অ-ভারতীয়দের সঙ্গে ফারাক হয়ে রয়েছে সব কিছু হারিয়েও। অতঃপর ময়দার মোহনভোগে, কচুপাতার বড়ায়, বেসনের কঢ়ীতে, গোদা গোদা জলেবীতে, আটার লাড্ডুতে, দালে, পুঁই এবং চড়াই শাকে বজায়

রেখেছে ভারতীয়তা। ভেবে দেখলে সাবাসই দিতে হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সমাজে ভারতীয়দের বৈশিষ্ট্য বিস্ময়জনক।

তারপরে এলো সিনেমা। ওরা ভা.তের 'সমাজের' ছবি দেখলো। যেন হারানো ভারত ফিরে পেলো। ওদের ধরলো শাড়ির লোভ, আলতার লোভ, টিপের লোভ, গহনার লোভ। দিশী বণিক, গুজরাতি, কচ্ছী, সিন্ধী বণিক চিলের মতো ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীর সর্বত্র। ভারতের জন্য। তারা ঐ দুর্বলতার অজুহাতে কোটি কোটি টাকা কামালো, কামাচ্ছে। কিন্তু এ দেশের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। বিয়ে করে দেশে; চাকর আনে দেশ থেকে; টাকা পাঠায় দেশে। ভারতীয় সমাজসেবায়, মন্দিরে, স্কুলে কানাকড়ি দিতে ভরসা পায় না। একটা টিপ বেচে এক ডলারে। একছড়া কাঁচের হার বেচে দশ ডলারে। একটি হনুমানের ছবি বেচে তিন ডলারে। প্লাসটিকের সত্যনারায়ণ বেচে পাঁচ ডলারে। তুলসীদাস রামায়ণ বেচে একশো ডলারে। গীতা প্রেসের ভাগবৎ (দেশে দশ টাকা) বেচে একশো ডলারে।

তবু, তবু,—এরা সেই শাড়ি, টিপ, আলতা, সিঁদুর পরে। পরে রুদ্রাক্ষ, তুলসী-মালা। পড়ে রামায়ণ, ভাগবত। ওরা জানে না গঙ্গা মাটি বলে যে মাটি ওরা কেনে তা-ও দেশের মাটি বই নয়।

হোক মেকী। তবু তা নামেও তো ভারত। তাই এখন দুঃখ করে ভারতবর্ষের বর্তমান হিন্দী ছবি দেখে। যে রীতি-ঢং, আসবাব-পোশাক ওরা এড়িয়ে চলতে চায় ভারতের মানসরূপ বজায় রাখার আশায় বম্বের ছবির মাধ্যমে সেই সব অসত্য কেন ফলাও করতে দেওয়া হয়। জিজ্ঞাসা করে ভারতের সবটাই কি বম্বে শহর? ছবিতে গ্রামজীবন কই। মনের মিল না হলেই কি সেখানকার বধূ পথের 'গাইড'-কে নিয়ে পালায়? একি সত্য? প্রণয়জাত অবৈধ সন্তানকে নিয়ে এতো আস্কারা কেন? বৈধ জীবনের সমস্যা কি দূর হয়েছে?—সমস্যা আছে ভারতের। সেগুলো এ দেশে জাহির করার কী তাৎপর্য? এ দেশে যে ভারতের কৃষ্টি নিয়ে, মানসরূপের প্রতিবেদন নিয়ে, ওদের বাঁচতে হবে অন্য কৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করে। উত্তর পুরুষের কাছে কোন্ মুখে তারা ভারত-কৃষ্টির স্বকীয় গরিমার ছবি তুলে ধরবে?

মনে আছে কোনো মার্কিন মর্কট ভারত থেকে এবং স্টুডিওর ম্যাজিকে তোলা ডকুমেন্টারি দেখিয়ে বাজার মাৎ করছিলো। একটি দল এসে আমায় জানালো, আমি প্রতিবাদ করতে যাই ভারতীয় দূতাবাসে। এ মিথ্যা বন্ধ হোক। অনুদ্বিগ্ন দূতাবাস অহিংস স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে প্রশ্ন করলেন, প্রায় সবটাই তো সত্য! তখন সেই 'কাশ্মীরী' সত্যসন্ধকে বলতে বাধ্য হই ঘরের কন্যা জামার প্রায় সবটা ঢাকা সত্ত্বেও কোনো সামান্য অংশ প্রকাশিত হয়ে গেলে সে লজ্জা ঢাকার প্রয়াস ডিপ্লোম্যাট না করুন, মানুষ হলে করবে। সত্যের আংশিক প্রকাশ অসত্য।

মানি, এটা বোঝা কঠিন কথা। কিন্তু কোনো কোনো মোহ ভাঙতে হলে মুদ্গর ব্যবহার সমীচীন। কাজ হয়েছিলো। সে ছবি বন্ধ হয়েছিলো। কিন্তু বোম্বাই ছবি বন্ধ করতে গেলে দেমক্র্যাসী মারা যাবে। বিদেশে ভারতীয় মাইনরিটির পক্ষে এ এক গহীন সমস্যা।

মনে রাখতে হবে এই সব ভারতীয়দের বাস করতে হয় পর্তুগীজ, চীন, সাইরীয়নদের গায়ে গা ঠেকিয়ে। দাসত্বের ঐতিহ্যে মাথা নিগ্রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। এদের চুল চিরে বিচার করতে হয় দাস এবং শ্রমিকের মধ্যে ফারাক; মূলহীন ভাসাফুল এবং মূল বিকীরিত অশ্বত্থের চারার মধ্যে পার্থক্য। 'আফ্রিকা' বলে কোনো দেশ স্বাধীন হলো না; কিন্তু 'ভারত' দেশটার স্বাধীনতা যেদিন হলো সেদিনের উৎসব এবং শোভাযাত্রা আজও এ দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শোভাযাত্রার নজীর হয়ে আছে। প্রথম যেবার শিল্পী হেমন্ত মুখার্জি গান গাইতে সপরিবারে গিয়েছিলেন তাঁর অভ্যর্থনা হয়েছিলো সম্পূর্ণ নাটকীয় এবং রাজকীয়।

ত্রিনিদাদে ভারতীয় বর্গের জনসাধারণের ত্রাস যে ক্রমশঃ তারা তাদের চিরকামিত ভারতাত্মার সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। তারা ভারতীয় সংস্কৃতি চায়, এবং ভাবে এ বিষয়ে ভারতীয় দূতাবাসের বিশিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

দূতাবাস কিন্তু তা ভাবে না। ভাবে সুস্থ ভাবে তিনটি বছর কাটাতে পারলেই প্রোমোশন হয়ে যাবে ব্রাজিল, জার্মানী তোকিও,—কোনো ফার্স্ট ক্লাস চান্সারি। দূত-গৃহিণীদের মুখে শুনেছি, "কী করে আছেন এক্কেনে? আমি তো গেলেই বাঁচি। মাগ্‌গো। এ নিগেটদেশে মানুষ থাকে?" কী অনুকম্পা! কী অবহেলা! অথচ দেখেছি ফিরে আসার সময়ে ত্রিনিদাদীরা দু হাত উজাড় করে দিয়েছে দান, সোনা থেকে আরম্ভ করে যা তাদের আছে। এবং উন্নাসিক ভারতীয় দূত তাদের কৃতার্থ করেছে—নিয়ে।

মিঃ রয় জোসেফ ভারতীয় ইণ্ডেণ্চার্ড লেবার সমাজের কনজার্ভেটিভ কৌলিন্য বাবদে বেশ গর্বিত। 'আমার ভালো লাগে এই কালচার কনসাস' মনোভাব। নৈলে ক্যারাবিয়ান শঙ্করের দেশ। ব্যাস্টার্ডিজম্-এর ধাক্কায় ভেসে যাবে যা কিছু মৌলিক, সাচ্চা। শাদা দুনিয়া কালচার 'বেচে'; ভুলে যায় যা বেচা যায়, তা কালচার নয়। বেচবার মনোবৃত্তিটা কালচার বলে গণ্য হতে পারে।...

"শাদা দেশে ত্রিনিদাদের খ্যাতি কী? আড়াইটি! এরা ভালো ডমেস্টিক! অর্থাৎ ঝি-চাকর খিদ্‌মদ্‌গার বলতে হয় তো ত্রিনিদাদ! দ্বিতীয়, উত্তম এনটারটেনার; অর্থাৎ, ঢলাঢলি মাতামাতি রঙ্গিলীপনায় ওস্তাদ। বাকীটা আধখানা, কারণ ব্যাপারটা অর্ধাঙ্গি নিয়ে। সে খবরটাও অর্ধেকই থাকুক।"

দ্য প্যাঁর গাল রাঙা হয়ে উঠেছে দেখে রয় জোসেফ টুস্‌কী কাটে, রাঙা কেন? বলো না কে জাতীয়তা? নটিংহিলে রেস রায়ট গেলো। আমি তো তখন ওখানে। আধা-কালোরা ভাবলো ঠ্যাঙানী খাচ্ছে খাক মিশকালোরা। আমাদের কী? চুপ থাকো। দু-কলম বিদ্যেওলারা ভাবে ঠ্যাঙানী খাচ্ছে জাঠমুখ্যুগুলো, আমাদের কী? চুপ থাকো। লেখাপড়ার চাঁই ম্যানলী, উইলিয়ামস্ মার্কা অনারারি ডকটরদের দল টাই-বো নেড়ে বললেন, ঠিক করেছে। বড় তিলিয়েছিলো। ইংরেজ সইবে যে, কতো সইবে! নিগার হবারও একটা সীমা আছে।...বুঝুন ন্যাশানালিজম্-এর পরিস্থিতি। ডিপ্লম্যাটিক্যালি চুপ থাকা।

"এ্যাডালট সাফ্রেজের নামে এখানে ডেমক্রাতিক এ্যাডালটরিই চলছে। দেশ মাটি এবং রুজি এ তিনের গর্ববোধ না থাকলে ন্যাশানালিজম্ কাগজে ফুল।"

দ্যা প্যাঁ নীচু গলায় বলে, "হবে, হবে। এতোকালের দাসত্ব। দাসত্ব বলতে দাসত্ব। বুঝতে, জানতে, চলতে একটু সময় নেবে।"

মেয়েটির কথা কেমন শান্ত সমীহ। তার সুরের মধ্যে সুন্দর একটি পরিশীলিত মনের প্রতিচ্ছায়া। ভারত, ভারতীয় সম্পর্কে যেমন সম্ভ্রমনত কথা বলে তেমনি সুযোগ পেলেই ত্রিনিদাদের জয়ধ্বজা তুলে ধরে।

পরদিন সকালটা রৌদ্রস্নাত বলতে যা বোঝায়। সারারাত বর্ষা গেছে। সকালটা ফর্সা। আমি উঠেছি ভোরে। ঘরেই চা আনিয়ে খেয়ে বেরিয়ে পড়েছি। বিদেশে ভোরবেলায় পায়ে হাঁটা মনোরম কবিতা। শহরের স্বভাব জানার পক্ষে এমন সময়ও আর হয় না। কুইন্স পার্ক হোটেল মূল শহরের একটু বাইরে। সাভানা ঘুরে কুইন্স্ রয়্যাল কলেজের দিকে পা বাড়াই। যারা কুকুর নিয়ে ঘুরছে বেশীর ভাগই শাদা। এমনি বৃদ্ধরাও কেউ কেউ মাঠে বেড়াচ্ছেন। এ্যাথলীটরা দৌড়ুচ্ছে। ভ্যানগুলো দৌড়ুচ্ছে। খবরের কাগজের ভ্যান। রুটির ভ্যান। দুধের ভ্যান। ঘোড়ায় চড়ার বাতিক অনেকের। বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটানোর দল অবশ্য নেই। কারণও স্পষ্ট। ত্রিনিদাদে ফৌজদারী মামলার হার খুব উঁচুতে। কথায় কথায় খুন হয়। হচ্ছে। পথেঘাটে ঠগ, জোচ্চোর, গুণ্ডা। ত্রিনিদাদের অপর নাম ত্রিকিদাদ। কেউ কারুকে 'ট্রিক' করছে, ঠকিয়েছে,—এ সংবাদটা শ্রোতার পক্ষে পরম কৌতুক-বহ, ঠগের পক্ষে মনোরম বাহবাস্ফোট; যার গেল সে জানে, কেউ তার সমব্যথী হবে না। মেয়ে লোপাট, বলাৎকার, ব্যভিচার,—নিত্যনৈমিত্তিক। তবে গতরাত্রে বর্ষাও গেছে। এমনিতেও কেউ রাতে বেঞ্চিতে শুতে সাহস করে না।

বাড়িখানা দেখে বুঝলুম গভর্নর জেনারেলের বাড়ি। কুইনস্ রয়্যাল কলেজের ইমারতের পরে পর পর সাজানো অনেকগুলো ইমারত। প্রত্যেকে এমন স্বতন্ত্র, দেখে মনে হয় ইমারাত-বিদ্যার খোলা এ্যালবাম একখানা। ক্রিকেটার স্টলমায়ারের পূর্বপুরুষদের বাড়ি, স্টলমায়ার কাসল। দেখলে মনে হবে স্কটল্যাণ্ডের বালমোরালে এলাম বুঝি। পরক্ষণেই শাদা বাড়িখানা দেখে মনে হবে আলজিয়ার্স না মরোক্কো? আসলে যুদ্ধকালীন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের দপ্তরখানা—হোয়াইট হল। অধুনা প্রাইম মিনিস্টারের দপ্তর। লাল-পাথুরে রংয়ে জমকালো বাড়িটি বিশপের ভবন। সন্ন্যাসী মোহন্ত ক্যাথলিক বিশপের শ্রীনিকেতন। রবুরবায় রাজবাড়িরও বাড়া। এই তল্লাটের অন্যতম অট্টালিকা রুদালস্ রেসিডেন্স। এই রুদাল ভারতীয়। ইণ্ডেণ্চার্ড লেবার বংশের। ব্যবসা করে কোটিপতি। সে ধনের তুলনা রইলো না। মারা গেলেন রুদাল। কোনোদিন কোনো ভারতীয়ের জন্য কিছু করলেন না। কোনো সৎকাজে কিছু ব্যয় করলেন না। 'জাতে' ওঠার জন্য খ্রীস্টান হলেন। আরও 'জাতে' ওঠার জন্য মেম রাখলেন। পূর্বের স্ত্রী যেমন হিন্দু তেমনি হিন্দু রয়ে গেলেন। আরও জাতে ওঠার জন্য ছেলেদের

আমেরিকায় পড়তে পাঠালেন। ছেলেরাও মেম বিয়ে করলো। আরও 'জাতে' উঠলো রুদাল। কিন্তু ক্রমাগত উঠেই তো যাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক রেখা-গণিতের মতে সেটা নাকি অসিদ্ধ। অতঃপর নামা। রুদাল মোলো। ছেলে মোলো। শুনতে পাই মেম-বৌ সে সম্পত্তি মেরে দিয়ে আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকান বিয়ে করে নাকি দিব্যি

সার্কুলার রোডের মাথায় বোটানিক গার্ডেনস্। সকাল বেলায় একা একা ঘুরছি। অদ্ভুত ভালো লাগছে। অদ্ভুত ভালো লাগে আমার বড়ো বড়ো গাছ দেখতে। নানাবিধ ট্রপিক্যাল গাছ দিয়ে সাজানো বাগান, পায়ে হেঁটে ঘোরার মতো পরিধি। এম্পায়ার ভ্যালী জু পাশেই। ভেতরে যাঁরা আছেন তাঁরা হাসপাতালের রুগী। খেতে না পেয়ে সেভেন্থ্ পিরিয়ডের স্কুল-ছাত্রের দল, খাঁচায় পোষা যেমন থাকে আছে। আসলে ডোমিনিকান রিপাব্লিকের জু দেখার পর আর কোন জু চোখে লাগে না।

এইখানেই বাঁশের সেতুর ওপর বসে বসে চোখে পড়ল চ্যান্সেলার হিল। নামটা তখন জানতাম না। কেবল দেখেছিলাম খাড়া পাহাড়টা।

পাহাড় দেখলেই চড়ার সাধ। তখনও ঝকঝকে সকাল নয়। দিব্যি উঠে নেমে আসার সময় পাওয়া যাবে। জু থেকে বেরিয়ে পথটা ঘুরে গেছে। বেলভেডিয়রের পথ ধরে উঠে গেলুম। মাঝে মাঝেই রহিসী বাড়ি। উঠে উঠে যখন চূড়ায় তখন সেখান থেকে গালফ অব পারিয়ার দৃশ্য অপূর্ব।

একটি বছর বারো-চোদ্দর নিগ্রো ছেলে। সঙ্গে ছোটো বোন। এক থোলো লিচুর মতো ফল দিলো—নাম চিনেট। ওকে একটা শিলিং দিতেই মহাখুশী।

চিনেট খেতে খেতে নামছি। ভাবছি সময়মতো হোটেলে ফিরে যেতে পারলে অফিসে যাবার আগেই কোলীন দ্য পাঁকে টেলিফোনে পাবো।

কিন্তু হোটেলে ঢুকেই দেখি কোলীনের গাড়ি পোর্টিকোয় দাঁড়িয়ে। ছোটো রাঙা ভক্স-ওয়াগন। কোলীন হেসে কথা বলছে রিসেপ্সনিস্টের সঙ্গে। আমাকে দেখেই একগাল হাসি। "তুমি তৈরী হয়ে থাকো লক্ষ্মীটি। আমার তো জানো বন্ধু জোটেই না। একা একা থাকি তাই।"

"ফরাসী মেয়ে। বন্ধু পায় না। কম দুঃখ?"

"বোঝ তবে। বিদেশে এসে অরিএন্টাল রসিক বান্ধবী পাচ্ছে না। এ শুনেও যদি বেওয়ারিশ ফরাসী ললনা না এগোয় তবে প্যারিস ডুবে যাবে আইফেল টাওয়ার ছাড়িয়ে।...শোনো, আমি আফিসে যাবো এবং সঙ্গে সঙ্গে আসবো। তুমি সারা দিনের জন্য তৈরী হও। আমি বাকী ব্যবস্থা করছি।"

মাঝেমাঝেই আমি ভাবি হঠাৎ আমার ভাগ্যে এই সব আশীর্বাদ জুটে যায় কেন? রোমে ফোরামে পেয়েছিলাম আলবার্তোকে; প্যারিসে মঁসিয়ে পুলাঁ; অল্পদিনের জন্যে কানাডায় যেতে না যেতে পেয়ে গেলুম মিঃ রাসেল! কেন? সেবার জিনেভা থেকে প্যারিস যাই যখন, ঠিকানা হারিয়ে ভাবছি। প্লেনের মধ্যেই জড়িয়ে ধরলো ডক্টর ব্রুনেল। 'আরে, বাতাশারিয়া যে! পৃথিবী কতো ছোটো।' মার্তিনিকে মলি, ভিভি ক্যাথী;

পথে পথে রবার্টস্, তান্তিয়া, স্মেলিং, ডঃ বার্লে; কতো বলবো। সুদূর ত্রিনিদাদে সাথী হলেন ফরাসী মেয়ে, বাপ অরিএণ্টালিস্ট। সেই সুবাদে আমার তত্ত্বতালাশ। প্রফেসর টেলর আলাপ থেকে বন্ধু,—কেন না 'মায়া', matrix এবং mater-এর মধ্যে শাব্দিক অর্থবোধতত্ত্ব বুঝিয়েছিলাম।

এমনি অযাচিত করুণায় যখন অবারিত পৃথিবীর মধ্যেও হারিয়ে যাই না, মানুষ-সমুদ্রের দিক্‌চক্রও যখন অন্ধকারে হারিয়ে যাবার মতো হয়, তখন জেগে ওঠে আশ্চর্য স্বরায় এক একটি নাম, সান্নিধ্য। পার হয়ে যাই দুস্তর।

ত্রিনিদাদে 'দেখবার' কিছু নেই। দেখবার নয়, এমন অনেক কিছু। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দ্বীপগুলোতেই 'দেখবার' কিছু নেই। কিন্তু ভ্রমণ-বিলাসীদের জন্য এসব দেশের গভীর হৃদ্য আতিথেয়তাই একটা খ্যাতিমান বাণিজ্যের বিষয় হয়েছে। এ বাবদে এই দ্বীপগুলি পয়সা ছড়ানোর অনবদ্য জাঁতাকল। কারণ আছে, হলিউডের আমোদী মোদোরাও যখন টি ভি এবং 'ইত্যাদি'র পার্টের ওপর বরাত দিয়ে ক্যাডিল্যাক চেপে বেড়ায়, বাড়িতেই সুইমিং পুলের পাশে বিলিয়ার্ড টেবল পাতে,—তখন টাকার মূল্য হয়ে যায় ভাঙা কলসীর কানা। তখন বিলাসের মাত্র একটা পথই খোলা থাকে,—টাকা খরচ করা যায় কিসে। খরচ করে তাকে লাগানো চাই। তাই ভ্রমণ-বাণিজ্যের পসার। কে কোথায় কীভাবে কতো টাকা অজস্র ব্যয় করেছে এর হিসেবেই উঁচুতে ওঠার হিসেব। ত্রিনিদাদে যতো যাত্রী আসে তার ৫৩·৭% আমেরিকান, ত্রিনিদাদ-যাত্রীরা যতো পয়সা ত্রিনিদাদে ঢেলে দিয়ে যায় তার ৮০% আমেরিকান। জর্মানী, ইংলণ্ড, ফ্রান্স—সর্বত্র প্রাচীন জমিদার সামন্তদের পারিবারিক প্রাসাদগুলোও এই ভ্রমণ-বাণিজ্যকে লোভনীয় করার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য, কী করে 'দ্রষ্টব্য' বাড়ানো যায়। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আভিজাত্যও নেই, কৌলীন্যও নেই, কোনদিনই আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে কৃষ্টির যোগাযোগ হয়নি। এখানে যখন যখন যে যে য়োরোপীয় জাত এসেছে, 'নেংড়া'তে এসেছে। পথের বারবনিতার যৌবনশ্রী যেমন বেশীদিন থাকে না, তার ঘর এবং বর দুটোই যেমন যাযাবর দীনতায় কৃপণ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইতিহাস এবং সমাজ তাই। এখানে কে কী দেখবে? এখানে যে দেখার কিছু নেই।

প্রথমটায় কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভ্রমণের হিড়িক লাগার এই মনস্তত্ত্বই প্রথমে কুব্যার দেবতা ফীডেল ক্যাস্ট্রোকে ক্ষেপিয়ে তোলে। ফীডেল ক্যাস্ট্রো জানতো আমেরিকান ভূখণ্ডের লোক য়োরোপে যায় ঐতিহ্যময় অতীতকে স্পর্শ করে আসতে। আমেরিকান য়োরোপীয়কে বিয়ে করে জাতে উঠতে; য়োরোপীয় আমেরিকানকে বিয়ে করে পাতে পড়তে। প্রথমটার লোভ গোত্রের, দ্বিতীয়টা বিত্তের। শাদার তো জাপান বেড়ানো কায়দায় আনলো এই যুদ্ধের পর। ইজিপ্টে, ইণ্ডিয়ায়, চীনে বেড়ানো যেন আরব্য উপন্যাস পড়া। প্যালেস্টাইনে যাওয়া বাইবেলের খাতিরে। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এরা আসে কেন? ফীডেল ক্যাস্ট্রোর রক্ত চেঁচায়, কেন? কেন? কেন?

ফীডেল ক্যাস্ট্রো জানতো পলিনেশিয়ায় কী রেটে ম্যাকার্থিজ্‌ম্ ছড়াচ্ছে। কোকাকোলা, কোকেন, গনোকোক্‌কাস, পাইরোচীটা, হাই-ওয়ে, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স,

চিউইং-গাম এবং জাজের দৌলতে পলিনেশিয়ার অ-সভ্যরা তো কাঁড়ি কাঁড়ি সভ্য হচ্ছে। আবার, ক্যুবার নামই তো ছিলো আমেরিকার লালবাতি পাড়া। ফলে, ক্যুবার মেয়ে-মা-দের মরশুমী রোজগার ছিলো অঢেল। তেমনি আবার ত্রিনিদাদের কৃতী সন্তান তাঁর বইয়ে আফসোস করেছেন,—"এদেশের মেয়েরা শাদার তালাশ করে। ভাবে শাদা ধরে শাদা হবে। হায়, এই সব অবলারা জানে না যে শাদারা এ দেশে বেড়াতে আসে শাদা বলে নয়।...যদি এই কামিনীরা শাদাই 'হয়ে' যায়, তখন কেই বা এদের চাইবে।..."

"জ্যামায়কায় জ্যামায়কান খাবার পাওয়া যায় না", বহু পর্যটকেরই এই দুঃখ!

সুতরাং এখানে 'দেখতে' কে আসে? পেতে আসে সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তি। অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি দিনের উচ্ছৃঙ্খলতা। বিদেশীর চোখে আগুন ধরিয়ে আত্মপ্রসাদ।

তবু দেখতে হয়। পারিয়া-উপসাগরের উত্তর বৃত্তুঁপাহাড়ের গা ঘেঁষে। ইয়াট ক্লাব পার করে যেতে হয়। ইয়াট ক্লাবের সঙ্গে ত্রিনিদাদের এক স্বনামধন্য পুরুষের বিশেষ যোগাযোগ। খুনে সিং। সারাজীবন খুন করে তার টাকা নিয়ে সে লক্ষপতি। ভাড়াটে খুনে। সে লোকের সঙ্গে সমাজপতিরাও খানাপিনা করতো। তার স্টেটাস ছিলো। যতদূর জানি সে-ই একমাত্র ত্রিনিদাদীয়ান যার নামে একখানা জীবনী লেখা হয়েছে। লোকে বলে বহু জননেতাও এই পথে নেতৃত্বের আসন পেয়েছেন। সিং ধরা পড়েছিলো। ফাঁসিও হয়েছিলো। জননেতাদের হয়নি।

চলেছি ঐতিহাসিক শাগুয়ারেমাস নামক ভূখণ্ডে।

ত্রিনিদাদের উত্তর-পশ্চিম কোণটা ঘিরে ভিল-ভিলে সব শ্যামলী দ্বীপের কুঞ্জবন। নীল-জল সুগভীর। দ্বীপে দ্বীপে এমন ছয়লাপ যে দ্বীপের ঢাকা পড়ে উত্তর দিকটা দেখাই যায় না। সেই যে যুদ্ধের সময়ে এ দিকটা ইংরেজের কাছে ইজারা নিয়ে আমেরিকানরা এক ফৈলাও নৌ-বহরের গোপন বন্দর করলো, আর যেতে চায় না। এমনি লীজ নিয়েছিলো পূর্বের এক ভূখণ্ড। ওয়ালার ফীল্ড্স্ নাম দিয়ে যেখানে এক বিমান ঘাঁটি, মার্কিনী শহর। সে শহরে নো এণ্ট্রী।

এই দুটি 'ভূ-স্বর্গ' ত্রিনিদাদের পলিটিকসে স্বদেশপ্রীতির চরম বাজী হয়ে গেলো। 'কুইট্ শাগুয়ারেমাস্' আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো। হাসতে হাসতে আমেরিকানরা চলে গেলো। তারপর সেজন্য হায় হায় করার আওয়াজে পোর্ট অব স্পেন অধীর হলো। ওয়ালার ফীল্ডস্ এখন পরিত্যক্ত জঙ্গল। শাগুয়ারেমাসে এখন মানুষ বীচ পার্টি করতে যায়। আর 'কুইট্ শাগুয়ারেমাস্' আন্দোলনের নেতা ডঃ উইলিয়মস এখন ত্রিনিদাদের প্রধানমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের খাতিরের লোক!

সেকালে শাগুয়ারেমাসের আঁচল ঘিরে বহু ছোটো ছোটো গাঁ হঠাৎ গজিয়ে উঠেছিলো। রাত না পোয়াতে ঘরে ঘরে ঝম ঝম করে টাকা (ডলার) বাজতো। এখনও মদ্যশালা,

রঙ্গশালা, রঙ্গীলা-শালা শাগুয়ারেমাস্ অঞ্চলে অঢেল। তারা 'প্রাচীন' (!) শাগুয়ারেমাসের গান শোনায় নাৎনীদের।

কোলীনের গাড়ি এসে দাঁড়ায় জলের ধারে। অপূর্ব লাগে জলে, সবুজ দ্বীপে ধোয়া আকাশে ঘেরা গাল্ফ পারিয়া। নিয়ে গেলো ফোর্ট ডেভিডের চূড়ায়। সেই স্পানিশ যুগের দুর্গের অবশেষ। দাঁড়িয়ে পোর্ট অব স্পেন বন্দরের ঐশ্বর্য দেখা যায়। গুণে গুণে দেখলাম ৫৩টি বিদেশী জাহাজ। রুশের, জাপানের, ওয়েস্ট-জার্মানীর, মেক্সিকোর। আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ তো আছেই।

গাড়ি নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে। চড়ে ডী-গো মার্টিনের অরণ্য ডিঙিয়ে অন্য পাহাড়ে। গাড়ি এলো অবজারভেটরি হিলস্।

এরই একাংশে ত্রিনিদাদ ভ্রমণ-পত্রিকার বহুবিঘোষিত ব্লু-বেসিন। পঞ্চাশ-ষাট ফুট ওপর থেকে একটা জলধারা পড়ে পড়ে তলায় একটা বিশাল বাটির মতো হয়ে গেছে। তার মধ্যে লোকে চান করে। পিছনে গুহা আছে। সেভেন-ডে-এডভেনটিস্টরা তাদের তান্ত্রিক ব্যাপারে এই সব গুহা ব্যবহার করে।

চড়া রোদ। কোলীন বুঝেছে "এ সব আমার মোটেই লাগেনি ভালো ; মনের চেয়েও বড়ো কিছু, তাই দেখা। নৈলে দেখা কি কেবল চোখের আলো ?"

চলো তোমাকে নিয়ে যাই।

কোথায় ?

উধাও পৃথিবীর দিকহারা সমুদ্রে।

তাই নিয়ে এলো। বলে স্যাড্ল্ রোড। একটা ভাঁজ থেকে দেখা যায় দুটো বড়ো পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা। দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে গাল্ফ্ অব্ পারিয়ার ঝিলমিল। তার ওপরে উত্তর পেরিয়ে মারাকাস্ বে।

ওখানে যাবো না। তোমার ভালো লাগবে না। মাংস ঢাকা বালির বন, তার ধারে নির্লজ্জ নীল জল। ভীড়। কুৎসিত জনতা।

বলে আর হাসে।

'কাজলা মেঘ হাসে, দেখে নয়ন ভাসে'—আমি হঠাৎ বলি।

'ওকি হলো বলো। মানে বলে দাও।'

'বেশ হাসো তুমি। নাম কোলীন। মনে পড়িয়ে দাও মিশরের কোহেল, বাংলার কাজল, সংস্কৃতের কুহেলী। রহস্যময়ীর ভাব-কলা। তাই গাইলাম মেঘের হাসি বিদ্যুতের রূপ দেখে চোখে জল আসে। আমি একা ; সে নেই। আমাদের দেশে বর্ষা এবং মেঘ নিয়ে বহু বিরহের গান আছে।

কালো আমি ধরে ফেলেছো ? মিথ্যে করেও তো বলতে পারতে আমি ট্যান্ড্। আভিজাত্য বাড়তো।

মিথ্যের অভিজাত কেন হতে যাবে ? সত্যের কালো আমাদের দেশে পুজো পায় গো।

বাঁচলাম। এবার বলো ফরাসী নই। আমি তোমার দেশের।

হতে হবে না ফরাসী তোমায়। পাক্‌কা ফরাসী তোমার মতো মিষ্টি ত্রিনিদাদীয় সুরে ইংরেজী বলতে পারতো না। তুমি যা, তাই ভালো।

হঠাৎ কোলীনের কণ্ঠের চপলতা হারিয়ে যায়। বলে, সত্যি আমি ফরাসী নই। যেটুকু ফরাসী তা শুধু মার্তিনিকের।

হলেই বা? যায় আসে কি?

আসে আসে বাতাশারিয়া।

হঠাৎ যেন যবনিকাপাত হয়ে গেলো। বুঁজে গেলো কোলীন।

আমি ওর হাতখানা আমার হাতে টেনে নিয়ে বন্দী করে ফেললাম।

পাহাড়টার এক ধারে অনেকটা ছায়া। মোটরখানা রেখে থলিটা গলায় ঝুলিয়ে পাহাড় চড়তে থাকে কোলীন। বেশী চড়তে হয় না। পাহাড়ের মাঝটা কেটে পথ। এধার দিয়ে মারাভাল, ডী-গো-মার্টিন উপত্যকা দেখা যায়, ওধারটার পিতী-ভ্যালীর অখণ্ড সাম্রাজ্য। সেকালীন পর্তুগীজ্র বোলেনটে-সামন্তদেব গড়া ফল-বাগানের চত্বর; কলা, পেঁপে, আম, কোকো, কফি, লেবু, আনারস—কেবল মাইলের পর মাইল সাজানো বাগান। এতোটা উঁচু থেকে দেখলে লাগে চমৎকার। বাউলের সুরের মতো একতারা হলেও আঁকাবাঁকা পথটা গেছে পিতী-ভ্যালির বুক চিরে। সে পথের খানিকটা বাঁশের ঝাড়ে ছাওয়া; তার পরেই বড়ো বড়ো আদ্যিকালের শামং-গাছ, বাকলে, জটায়, শাখায়-প্রশাখায় ঝুলে ঝুলে আছে অর্কিড, মিসলটো। কোলীন বললো, একটা শামং আছে ত্রিনিদাদের প্রাচীনতম, বৃহত্তম,—লোকে ফোটো নেয়।

বসেছি পাথরের চাঙড়ের ওপর। পাথুরে ভাঁজ। মাথার ওপর অনেকটা ঝুলে আছে পাথর। সমুদ্র দেখা যায় না এদিকে; কিন্তু পিতী-ভ্যালী, পিতী-ভ্যালীর পরে কারোনী স্যাভানার সুবিস্তীর্ণ ইক্ষুবন দিগন্তে বিলীন। সবুজের ঢল, সবুজের সমুদ্র। আর দক্ষিণ সমুদ্রের নিদ্রালু বাতাস।

রাঙা রাঙা ফ্যামিংগো এক ঝাঁক উড়ে গেলো স্যাভানার পারে পাখি-সরায়-এ (বার্ড স্যাংচুয়ারী)। এককালে পর্যটকরা লিখতেন সারা যোরোপের পাখির বারো আনা খালি ত্রিনিদাদেই। আজ ত্রিনিদাদে পাখির ডাক শোনাই দায়। একবার হঠাৎ চলে গিয়েছিলাম ত্রিনিদাদের নাভেট্‌-বাঁধে। দুই পাহাড়ের মাঝে জল বেঁধে খাবার জলের ব্যবস্থা। জায়গাটা পাহাড়ের নাভিকেন্দ্রে। অনেকটা জায়গা জুড়ে গভীর জঙ্গল। দশ-বিশ মাইলের মধ্যে জনবসতি নেই তিন ধারে। একধারে পথ। চুপ করে বসে থাকি হ্রদের কিনার থেকে অনেক উঁচুতে। আমি চুপ; কিন্তু নানা পাখির ডাক। দেখলুম ফ্ল্যামিঙ্গো। ক্লাগনীশে থাকতে প্রায়ই বাগানে পাখি দেখতুম। হামিং বার্ড; হাউস-স্প্যারো; ওরিওল; ময়না; তোতা; বউ কথা কও; বুলবুল। বড়ো পাখির মধ্যে 'করবো'। শকুন জাতের। তবে শকুনের চেয়ে ছোটো। যেন চিল। কাক নেই ত্রিনিদাদে। ঈগল ছিলো। এখন নেই। বাজ আছে। বৃহত্তম পাখি পেলিকান। সপ্তাহে তিন হাজার পেলিকান সাপ্লাই করার কনট্রাক্টার ছিলো ত্রিনিদাদ। পেলিকানের

পাখায় য়োরোপের হ্যাট্-টুরেরা হ্যাট সাজাতেন। এখন পেলিকান ফ্ল্যামিংগো ত্রিনিদাদের 'সংরক্ষিত' পাখি। এখানকার রাষ্ট্রীয় পাখি স্কার্লেট আইবিস।

আমরা ফিরলুম যেখানে, জায়গাটার নাম সেণ্ট জেমস। শহরতলী হলেও পোর্ট অব স্পেনের সঙ্গে এক। বর্তমানে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় মন্দির সেণ্ট জেমসে। মুসলমানেরা পর পর অনেকগুলো বড়ো মসজিদ করেছে। ভারতীয়েরা যেখানে যেখানে থাকে—মন্দির এবং মসজিদ করেছে। বেশীর ভাগ মন্দিরই পুরোহিত ব্রাহ্মণদের স্বকীয় সম্পত্তি। সেণ্ট জেমসের মন্দির ১৯৫৭-তে ছিলো না। পরে হয়েছে। এখানকার হিন্দু মহাসভার সম্পত্তি। পুরোহিত নেই।

১৯৬৪-তে যখন ত্রিনিদাদে ফিরি, মন্দির তখন প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। হঠাৎ ধনকুবের এবং আমার বন্ধু জংবাহাদুর সিং (মন্দির কমিটির সভাপতি) জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হয়েছে?

বললাম, (হিন্দীতে) জং-এর জবর কীর্তি। জবর জং!

কেন? কেন? কেন? জং যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বড়ই উদ্ধত, অহংকৃত, নাক-উঁচু এর মিনারধর্মী বিন্যাস। হিন্দু মন্দির শিল্পের গোড়ার কথা স্থিতি, ধৈর্য, সাম্য, বিনয়। মন্দির হবে শান্ত ধীর, মনকে ভরিয়ে দেবে দেবকল্প আশ্বাসে। মন্দিরে থাকবে অবকাশ, সৌন্দর্য।

তৎক্ষণাৎ আর্কিটেক্টকে ডাকানো হলো।

স্কটিশ আর্কিটেক্ট। এ তল্লাটের নামজাদা লোক। ব্যাঙ্ক, স্কাই-স্ক্রেপার ইত্যাদিতে স্কাই-হাই নাম।

আমার মন্তব্য শ্বেতবিজ্ঞতাসুলভ আত্মম্মন্যতার চুলোয় পাঠিয়ে ছিলেন মাত্র দু-চারটি কায়দাদুরুস্ত ঘোঁৎকার দিয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, "হিন্দু স্থাপত্য সম্বন্ধে আপনার চর্চা কি রকম?"

"কিছু না।"

'তবু হাত দিলেন এ কাজে। যখন দিলেনই তখনও কি সে সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনো করার দরকার বোধ করলেন না?"

আশ্চর্য হয়ে যাই যে এসব দেশে 'শিক্ষিত' সাহেবরাও অনায়াস বর্বরতার সঙ্গে কী ভাবে শুধু অ-শুভ্র এবং এশিয়ান বলেই রং-দেশের সংস্কৃতিগুলোকে তচ্নচ্ করে দেয়। অনীহা, উন্মনস্কতা বলতে পারতুম। কিন্তু সফিস্টিকেশন যেমন ব্যবহারের অনুকরণেই দেখা যায়, সিনিসিজমটা ঠিক তেমন অনুকরণীয় ব্যবহার নয়। মাঝে মাঝেই 'ফাউস্ট' পড়তে পড়তে মনে হয় গোয়েঠের নিখিন্ন যথার্থ্যবোধ, বিবিক্ত যাযাবরত্ব, উদাসীন জীবন-মত্ততা কতো কতো নিবিড় কঠোর সাধনার ফল। স্বর্গ পাতালের মনের কথা লিখতে যাকে হয়, স্বর্গ পাতালে বিচরণও তাকে করতে হয়। নরক সাধনাও সাধনা। বেতালসিদ্ধাই-ও সিদ্ধাই।

তাই বলেছি 'বর্বর'। মনস্কতা কোথায়? রীতিমতো অশ্রদ্ধা। সেই অশ্রদ্ধাকে মনে রেখে কেবল টাকার লোভে এই 'কুলিগুলোর হীদেন ধর্মের' একটা ইমারত খাড়া করার ফিকির।

তখনই সাহেব বাচ্চাকে হিন্দু স্থাপত্যের গোড়ার কথা, বাস্তু শিল্পের ইতিহাস, ফিনীশিয়, ব্যাবিলোনীয়, বাইজেন্টাইন, গথিক চার্চের সঙ্গে প্রাচ্য স্থাপত্যের মন্ত্রগত সাদৃশ্য বোঝাতে হলো।

চুপ করে শুনছে সাহেব। হঠাৎ একটা সময়ে বলে উঠলো—তা বলে মডার্নিটি থাকবে না স্থাপত্যে? এ আমি জানি না। হোক দেবালয়। হোক চিরন্তন। তবু যুগে যুগে শিল্প বদলায়। তাই ধারা।

বলি তখন—যা বদলাবার বদলায়। সেটা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গকে বদলানো কি বাটালি তুরপুনের সাধ্য? মন্দিরে মানুষের অজ্ঞাত মনের অবচেতনিক আশা, নিষ্ঠা, অভয়, পিপাসা রূপ নেয়। মনের ভাষা বদলায়, রুচি বদলায়। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে অমোঘ যে সব নিয়ম তাকে বাতিল করে মন কখনই এগিয়ে যেতে পারে না।

হিন্দু ভাস্কর্যের গোড়ার কথা—একের বহু হবার তৃষ্ণাকে ফুটিয়ে তোলা; অমূর্তকে বিগ্রহিত রূপে আদর্শময় করার প্রয়াস; সাবলীল নমনীয় কোমল-রেখার আন্দোলিত সৌকুমার্য দিয়ে চিত্তের উদাত্ত বাণীরূপটি মহাকালের পানে মেলে দেওয়া। যেমন সরোবরের পদ্ম কোরক সূর্য পিপাসায় বদ্ধকর প্রার্থনার মতো মাটি ছেড়ে, জল ছেড়ে আকাশ-আলো-বায়ুর জগতে উঠে যেতে চায়, তেমনি হবে মন্দির। নৈলে হবে মানস কমলের ওপর অব্রহ্মণ্য, অত্যাচার। হিন্দু মন্দির ভাস্কর্যের ওপর আদি গ্রন্থের বয়স বাইবেল সংকলনের বয়স ছাড়িয়ে গেছে বহু পূর্বে। এ সম্বন্ধে হিন্দু ক্রমান্বয়ে সাত আটশো বছর ধরে লিখে গেছে।

সাহেব তো বুঝলেন তাঁর ভুল। কিন্তু শোধরায় কে? সে অনেক খরচা যে! জং ঘাবড়ে গেলেও বুঝলো ভুল যা হয়েছে বিষম ভুল।—বহুতর কারণে জং-এর পক্ষে আমার ব্যাখ্যাকে অবহেলা করাও সম্ভব ছিলো না। সকাতরে বললো, "এ যে আরও ষাট সত্তর হাজার ডলারের বিল।"

আমি জানি কী ধরনের কথায় ঐ যক্ষ ক্ষেপে উঠে মানুষ হয়ে যাবে। বলি, "বাঁচাও ষাট-সত্তর। নাম মরে যাক; হিন্দু সংস্কৃতি মরে যাক; তবু টাকা বাঁচুক। ...মনে রেখো তোমার মৃত্যুর পাঁচশো বছর পরেও এ মন্দির তোমার লোভ, তোমার কার্পণ্য, তোমার ক্ষীণ দৃষ্টির ইতিহাস হয়ে থাকবে।"

এখন যা ঈথেল স্ট্রীটের কৃষ্ণ মন্দির সেটির আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা সেদিন হলো।

এমনি আছে বহু সুদৃশ্য মসজিদ, বহু মন্দির। গির্জায় গির্জায় ভরা এই দ্বীপে ভারতীয়েরা (কী হিন্দু, কী মুসলিম) নিজেদের হীনমন্যতায় মরে থাকতো। প্রথম যেদিন বক্তৃতা দিলাম (বিষয়: রবীন্দ্রনাথ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারত), তারপর থেকে বার বার আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে চার দিকে একটা সাড়া পড়ে গেলো।

নির্জীব দেবস্থান সজীব হলো ; ধর্ম ও দেবতাকে আশ্রয় করে আত্মসম্মানবোধ এবং মর্যাদাবোধ জাগ্রত হলো। পর পর তিনটি কলেজ তৈরী হলো। সে ইতিহাস দীর্ঘ। [এই সময়ের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মাধ্যমে ভারত সরকার আমার আবেদনে সাড়া দিয়ে দুই দফায় দুইটি পূর্ণাবয়ব সায়ান্স ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি সাহায্য পাঠিয়েছিলেন]।

আমার কাজ ধর্মপ্রচার নয়। আমি শিক্ষক। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সমাজে ১৭ থেকে ১৮ লক্ষ ভারতীয় থাকা সত্ত্বেও দেখলাম ভারতীয়েরা মনের ভয়ে আরও অন্ধকারে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে উপহসিত হচ্ছে। তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে আমার উপায় ছিল না। আমার পক্ষে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলন তোলা ভুল হতো। আমি বিদেশী। সাবধানে বেছে নিলাম সেই দুটি স্রোত যার বুকে ভেলা ভাসিয়ে আমি ওদের হৃদয়ে পেঁছে যাবো। একটি ধর্ম ; অন্যটি গান। কাজেই নাচ, গান নাটক ছবির তরঙ্গে ওদের মনের বালুচরকে শ্যামল প্রাচুর্যে ভরে দেওয়া কঠিন হলো না। কঠিন হলো না কালা-শাদা-পীত-বাদামী বর্ণের বর্ণেতরের ধর্ম-নির্বিশেষে একাত্ম হয়ে যাওয়া। ত্রিনিদাদের ভাবময় ইতিহাসে একটা বদল হয়ে গেলো।

এটাই ত্রিনিদাদ, গায়ানা, সুরিনামের বৈচিত্র্য। এই বিচিত্রতার স্বাদ নিতেই আমেরিকা ভূখণ্ডের হাট্টরে ভ্রমণ-বিলাসীরা জাহাজ জাহাজ ছড়িয়ে পড়ে এ সব দেশে। এসে পায় একটি ক্রুসিবলে পৃথিবীর যাবতীয় কৃষ্টির রসপাক। চীন, আফ্রিকান, নিগ্রো,* সাইরিয়ান, ইজিপশীয়ান, গ্রীক, ফরাসী, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, ভারতীয়, ইন্দোনেশীয়ান, মালায়ী, সিংহলী, সেনেগালী, ইংরেজ, ডাচ, কানাডিয়ান, কারীব, আরাওয়াক, মেক্সিকান, জর্মন, ইহুদী, মস্লেম, হিন্দু, প্রেসবিটেরিয়ান, এ্যাড্ভেন্টিস্ট, ক্যাথলিক, মেথডিস্ট, প্রটেস্টাণ্ট এমনকি বৌদ্ধও।

এখানে কার্নিভ্যাল এবং ক্যালিপ্সোর পাশে আছে হোলীর শোভাযাত্রা, দেওয়ালী, রামায়ণ গান এবং চৌতাল কম্পিটিশন ; তাজিয়া মোহার্‌রামের পাশে আছে আমেরিণ্ডিয়ান ফোক্-ডান্স, শাম্বা, রাম্বা, লিম্বো, জিঙ্গো, লং ড্রাম, কোম্বোর পাশে ঢোলক, তবলা, সেতার, হারমোনিয়াম। শাড়ির পাশে ড্রেস ; টুপীর পাশে পাগড়ী, চিকেন এণ্ড চিপ্সের পাশে দালপুরী, রোটী ; গুড-ফ্রাইডে, ক্রীসমাসের পাশে জন্মাষ্টমী, ইদুল্-ফিতর্, সত্যনারায়ণ কথা। এদেশ দেখা মানে এশিয়া, আফ্রিকা, য়োরোপ, পূর্ব-পশ্চিম দেখা।

সমাজতাত্ত্বিকরা বলেন বহুর মধ্যে যে মুষ্টিমেয় বাস করে, তরঙ্গের মধ্যে কাগজের নৌকোর মতো একদিন তারা ভেসে তলিয়ে যাবে। তবু একাঙ্গ হয় না। ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌রা জাপানী ভাষায় সংস্কৃত ভাষার শেকড় খুঁজে পান ; রুশ ভাষা, জর্মন ভাষা, যাযাবর জিপ্সীদের ভাষায় আর্য সংস্কৃতি খুঁজে পান। তবু মিল হতে চায় না। মিলে যাবারই পক্ষে মুষ্টিমেয়রা নিদারুণ ভাবে লড়াই করেন। পৃথিবীতে ইহুদীদের মতোই স্পেনের বাখ ; ইরাণের কুর্দ, ক্যানাডার ফরাসী, গ্রীসের 'চামু', ভারতে খোজা

* আফ্রিকান—আফ্রিকা মহাদেশের দেশীয়েরা। নিগ্রো—বিক্রীত দাসদের বংশধরেরা। দুটির মধ্যে যা পার্থক্য সেটা সমঝে না চললে এক মর রামে মারবে, নৈলে রাবণে।

সম্প্রদায়ের মতোই, এই নিরন্তর সংগ্রামের নজীর। আরও আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান সংগ্রাম এই ভাবে পদে পদে। এটা মানসিক পরিবেশ রক্ষণশীলতার বৈগুণ্য নয়। এই সংগ্রামী জীবজগতে আত্মরক্ষার মতোই এক স্বাভাবিক বৃত্তি। কাজেই ভারতবর্ষের ভিতরে যতো না, তার ঢের বেশী, 'জাত', 'ধর্ম', 'পোশাক', 'আচার', 'রীত', 'ব্যাভার' নিয়ে এদের সমাজে উন্নাসিক অসহিষ্ণুতা। অসহিষ্ণুতা বোধ হয় ঠিক কথা নয়; বলা যায় স্পর্শকাতরতা। যথাপূর্বং এর উস্কানি জোগায় পাগড়ী বাঁধা পণ্ডিতেরা, যাঁরা কেউ সংস্কৃত জানেন না, হিন্দীও কাজ চালাবার বেশী নয়।

অথচ এদের সমাজের, সদাস্পর্শকাতর সমাজের মধ্যেই আবার এমন উদারতা আমি পদে পদে দেখেছি যে বার বারই মনে হয়েছে যে ভারতের বর্তমান ইতিহাস নতুন রঙে রঙীন হয়ে যেতো, নতুন প্রাণে উদ্বুদ্ধ হতো যদি ভারত সমাজে ধর্ম এবং সমাজকে আমরা অন্তরের আনন্দ এবং বাহিরের ব্যবহারের মতো পৃথক করে দেখতাম। এরা যেমন করে। দুটোয় সম্পর্ক গভীর হলেও ব্যবহার দিয়ে বিরোধকে অস্বীকার করতে করতে বিরোধ অবলুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের সাধন পথে অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব এবং ব্যবহারে বৈষ্ণব সাধনের আপাতবিরোধী রীতিকে তো শ্রেষ্ঠ সাধন বলে স্বীকৃতি দেওয়াই আছে। ব্যবহারে প্রকৃত এমন ধারা হয়ে আমরা বাউল সহজ হয়ে যাই না কেন? কেন আমরা জমিদারী হারিয়ে জমাদার? সামন্তকাল পার হয়েও সামন্ততন্ত্রী?

এদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারটা সামাজিক হলেও বিবাহ অনুষ্ঠানে দম্পতির ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একই হিন্দু শ্বশুরের মুসলমান জামাই, খ্রীস্টান পুত্রবধূ হওয়ায় যেটুকু বাধা তা সংস্কারের, সমাজের নয়। পুরোহিত হিন্দু বা মৌলবী-মুসলিম মতে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পরে চার্চে গিয়ে পাদ্রীর আশীর্বাদ নেওয়া, রেজেস্ট্রেশান করা আশ্চর্য ঘটনা নয়। ছেলে-মেয়ের নাম শংকর বা মহাবীর হলেই যে তারা হিন্দু হবে এমন কথা নেই। ধর্মের সঙ্গে পানাহারকে জড়িয়ে না ফেললেও গোমাংস বা শূকর মাংসের প্রীতি মাটন, মুর্গী বা মাছ ছাড়িয়ে ওঠেনি। শাড়ি পরতে খুবই ভালবাসলেও গাড়ি চালানোয়, ব্যবসা-চাকরি ক্ষেত্রে ড্রেস অল্প খরচে হয় এটা মেনে নেয় সকলে। শাড়ি কস্টুম্; ড্রেস্ ডিগ্‌নিটির শীলমোহর। ড্রেস প্রাকটিকাল; আটপৌরে। সিঁদুর পরেও, পরেও না। প্রসাধনকে সমাজের অঙ্গ করে। খাওয়া পরায় নিষিদ্ধ-অ-নিষিদ্ধ বলে কোন ফতোয়া দেওয়া হয় না। সত্যনারায়ণে, রামায়ণ সভায়, ভাগবত পাঠে সুবক্তা ধর্ম বিষয়ে বলেন। সে তিনি যে কোনো ধর্মের বক্তাই হোন। বক্তার বিষয় তখন, রাম বা কৃষ্ণ বা হিন্দু ধর্মের বিশিষ্ট মর্যাদা। আরও উচ্চগ্রামের কথায় মানব ধর্ম নিয়ে বলা হয়, ধর্মের ভিত্তি অন্তর, সমাজ নয়।

আমায় মসজিদে, গির্জায় মস্লেম সংসদে বারবার নিমন্ত্রিত হয়ে বলতে হয়েছে। এবং দেখেছি প্রাণের কথা, 'ধর্মে'র কথা, 'সনাতন' ভাবরূপের মার্মিক কথা, প্রাণের মূলে যে দুঃখ-সুখের দ্বন্দ্ব-দোলা অনবরত দুলিয়ে দুলিয়ে জীবনকে দুঃসহ করে, সেই বেদনা উৎসারণের কথা সকলেই আগ্রহভরে শোনেন। এবং এরই ফলে আমি মানব-

অরণ্যের দুর্গম কান্তারের মধ্যেও দিকে দিকে পম্পা চিত্রকূট পর্ণমন্দিরে বহু বহু বান্ধবীর সঙ্গে সমাসনে বসার দিব্য আনন্দরসে প্লাবিত হয়েছি। পৃথিবী সুন্দর, সুন্দর মননের কাছে; মানুষ সুন্দর, সুন্দর মননের কাছে। উদাসীন, নিঃসঙ্গতার দাবদাহে তাকেই জ্বলতে হলো যে এগিয়ে গিয়ে পৃথিবীকে জড়ালো না। বসে রইলো পৃথিবী কখন তার কাছে আসে এই আত্মকেন্দ্রিক প্রত্যাশায়।

তা বোলে যে ত্রিনিদাদ বা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারতাত্মা ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে হারিয়ে যেতে চায় তা নয়। তারা জানে ত্রিনিদাদ বা গায়ানার নিজের জাতীয়তাই তাদের স্থায়ী সম্পদ। স্বর্গের লালসার মতো 'ভারত' লালসা তাদের ভাবময় লোকের এক স্বর্ণমঞ্জরী। ঠিকই। কিন্তু তাদের ইহলোকে, বস্তুলোকে, প্রাণলোকে ত্রিনিদাদ, ত্রিনিদাদের আকাশ, বাতাস, জাগৃতি, সম্পদগুলোই নিজস্ব। স্বাধীনতার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যে ন্যাশনালিজমের বন্যা এসেছে তার পাশে আফ্রিকা বা ভারতবর্ষ ঘর বাঁধতে চাইলেও সে ঘর হবে চরের বাড়ির মতো আকাশকুসুম। এ কথা সত্য ইমিগ্রাণ্টদের রক্তের ঘূণ ইমিগ্রেশন। নানা কারণে এরা ঘর খোঁজে কানাডায়, যুক্তরাষ্ট্রে, ইংলণ্ডে, হল্যাণ্ডে। কিন্তু সেটার কারণ অর্থনৈতিক। যেখানেই যাক ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান। এটা তাদের গর্ব। ভিদিয়া নাইপলের (বিদ্যা নেপাল : এর দাদামশায় নেপালের ব্রাহ্মণ ছিলেন) মতো। অবান্তরের জবাব আমাদের নীরদ সী। নৈলে জাতীয়তাবোধ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের সম্পদ।

তবু সত্য যে জাতীয়তাবোধটা দানা বাঁধতে পারছে না। তার কারণ জানতে গেলে আমাদের একটু ইতিহাস ঘাঁটতে হবে।

ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ত্রিনিদাদেই বোধকরি সবচেয়ে কম দিন দাসত্ব-প্রথা ছিলো। একটা সময় ছিলো যখন জনসংখ্যা অদ্ভুত রকম কম ছিলো—কুল্যে ৩০০। তারপরেই চিনি-সুবাদে ভারতীয় 'কুলী' আমদানী শুরু হলো।

'ফাতেল রাজাক' জাহাজে ভারতবর্ষ থেকে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে ১৯৭ পুরুষ এবং ২৮ স্ত্রীলোক আমদানী করা হলো। শেষ জাহাজ এস. এস. গ্যাঞ্জেস এলো ২২শে এপ্রিল, ১৯১৭। তাতে ছিলো পুরুষ ২৪৭, স্ত্রী ১১৫, ১২ টি কিশোর, ১০টি কিশোরী এবং ১০টি শিশু। বেশীর ভাগই মাদ্রাজী এবং বিহারী—যুপী 'হিন্দুস্থানী'র দল। বাঙালী আসেনি। ২/৪ ঘর মুসলমান এসেছে হুগলী থেকে। কিছু ছুতোর, কৈবর্ত এসেছে বাধ্য হয়ে অন্যজাতের বিধবা সঙ্গে নিয়ে।

জাহাজ আসতো মাদ্রাজ এবং কলকাতা থেকে। কুল্যে এই সময়ের মধ্যে ৩৮/৩৯ হাজার ভারতীয় ত্রিনিদাদে আসে। তারা এলো। এখান থেকে সারা ক্যারাবিয়ানে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু ভারতকে ভুলতে পারলো না। সেণ্ট জেমসে তাই নাম পাচ্ছি লখনউ স্ট্রীট, ক্যালকাটা স্ট্রীট, নেপাল স্ট্রীট, মাদ্রাজ স্ট্রীট, বেনারস স্ট্রীট, পাটনা স্ট্রীট, কানপুর স্ট্রীট, দিল্লী স্ট্রীট ইত্যাদি। এখানে গাঁয়ের নাম ব্যারাকপুর, ফৈজাবাদ,

ক্যালকাটা, গান্ধীগ্রাম, মথুরা, গঞ্জাম। সাভানার পরে মস্ত বাড়িখানার নাম, তাজদার-এস্-সালাম।

তখনকার ইতিহাস দেখছি। ভারতবর্ষে ১৪৮৫-এ শিখযুদ্ধ আরম্ভ হলো। বর্মা যুদ্ধও এর পরে। বম্বেতে রেল লাইন খোলা, কলকাতা-আগ্রা টেলিগ্রাফ তার যোগাযোগ-এর পরে। বিশেষ করে দেখছি সাঁওতাল বিদ্রোহ, আউধের বিদ্রোহ—এবং নীলকর বিদ্রোহ এই ১৮৪৫ থেকে ১৯১৭-র মধ্যেই।

নীলকর বিদ্রোহটি এই সূত্রে বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। ১৮৬৫-তে ভীষণ সেই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ যার ফলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এর পরেই দেখছি দুর্ভিক্ষের হিড়িক। ১৮৬৫-তে উড়িষ্যা, ১৮৭৪-এ বিহার, ১৮৮০-তে বাংলা এবং দুর্ভিক্ষ কমিশন স্থাপন, ১৮৯৭-তে প্লেগ, ১৮৬৮ থেকে ১৮৭৬ এবং ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষে ছয়লাপ, ১৯০৫-এ বঙ্গবিচ্ছেদ। (১৮৪৫ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত কুলী চালান চলেছে) পাঞ্জাব, রাজপুতনা, বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ—ভারতবর্ষে যেন দুর্ভিক্ষের রাজত্ব। ইংরেজদের রাজত্ব। অথচ মেগাস্থিনিস লিখেছিলেন, ভারতবর্ষে 'দুর্ভিক্ষ' শোনাও যায় না। হিউয়েন সাঙ দুর্ভিক্ষের নামও করেনি। মোগলরা জোর হাতে দুর্ভিক্ষ দমন করতেন। হায়দর, টিপু, পেশোয়ারা কৃষি-সম্পদ বাড়ানোর জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে সব পূর্ত ব্যবস্থা করেছিলেন, রেল লাইন পাতার হিড়িকে বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে ইংরেজরা সে ব্যবস্থা নিষ্ঠুর অবিবেচনায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো। চাষের বদলে আপদ হলো দুর্ভিক্ষের। সুজলা সুফলা দেশের বদনাম হয়ে গেলো দুর্ভিক্ষের দেশ। ১৮৭৬-এর দুর্ভিক্ষ পাক্কা চার বছর স্থায়ী হয়েছিলো। মাদ্রাজ, মাঈশোর হায়দ্রাবাদ, বম্বে পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ এবং বিহার—ব্যাপক দুর্ভিক্ষ !! তবু ইংরেজ সাবাস রাজত্ব করেছে। এই সময়ের মধ্যে ভারত থেকে ইংলণ্ডে যে অর্থ গেছে তার পরিমাণ তিন কোটি আশী লক্ষ পাউণ্ড !! তবু যে ভারতবর্ষ কী করে দাঁড়িয়ে আছে আশ্চর্য !

এই সময়ের মধ্যেই নীলকর বিদ্রোহ হয়। বিহার, বাংলা, যুক্তপ্রদেশই নীলের প্রধান কেন্দ্র। আইন করে যখন দত্তক-ব্যবস্থা এবং দাদন প্রথা রদ হলো নীলকররা কুঠী বন্ধ করলো। সেই টাকা তারা এনে ফেললো ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। এবং তখন দেখা গেল শ্রমিকের অভাব। ভারত ছেড়ে কেউ আসতে চায় না। তাই তখন দুর্ভিক্ষের অঘটন 'ঘটানো' হলো। এতো দুর্ভিক্ষ যে দলে দলে শ্রমিক নাম লেখালো 'রাংরুট' (Recruiting Centre) কেন্দ্রে। তাই মাদ্রাজ এবং বিহার-যুপীর লোক ত্রিনিদাদে এবং ব্রিটিশ গায়ানায় বেশী। সুরিনামেও তাই। (ঋণী : রমেশচন্দ্র দত্তের Economic History of British Rule in India এবং ডঃ ছেদী জাগনের (১) বিটার সুগার ; (২) ওয়েস্ট অন ট্রায়াল্)।

এরা তখন বিহারী, মধ্যপ্রদেশীয় এবং মাদ্রাজী 'নুলিয়া' সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এবং কৃষ্টিকেই ভারতীয় কৃষ্টি বলে মেনে নিলো। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহের ফলে রাংরুটদের মধ্যে 'ব্রাহ্মণ' আনা আইনত বন্ধ হলো। ব্রাহ্মণরা কেবলই ব্যক্তিস্বাধীনতা

দাবী করে ; অনায়াসে সামাজিক শ্রেষ্ঠতা পেয়ে যায়, তখন দলের পাণ্ডা হয়ে গোল পাকায়। সুতরাং নীচ জাতের লোকদেরই বেছে বেছে আনা হতো। অনুরূপ কারণে 'পাঠান'রাও বাদ যেতো। তাই কুর্মী, লোহার, কাহার, পাশী, ডোম, চামার, আদিবাসী জেলে, জোলা, এরাই রাশি রাশি। গাছ পুজো, ধ্বজা পুজো, হনুমান পুজো, রামায়ণ গান প্রভৃতি ব্রাত্য সংস্কারই ত্রিনিদাদে হিন্দুত্ব বলে আখ্যা পায়। এদেশে ব্রাত্য এবং শ্রৌত এক হয়ে গেছে। এরাই বশিষ্ঠস্মৃতির দেবলস্মৃতির 'হিন্দু'। হিন্দ-ইজম্ এদের 'ইজম্'।

এরই মধ্যে ছাপাছাপি লুকিয়ে 'ব্রাহ্মণ'রাও এসেছেন 'বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং।' 'জাত'-ব্যবস্থাও এজন্য দায়ী। কেবল উদরের বুভুক্ষা নয়, দেহের বুভুক্ষা। বিধবা ব্রাহ্মণ-তরুণী কুর্মীর সঙ্গে, নাপিতের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে ; ব্রাহ্মণ তরুণ রজকিনী প্রেমে সমাজচ্যুত, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে দেবর, বিধবা পুত্রবধূকে নিয়ে শ্বশুর ; ঋণের দায়ে ঘাড়ে করে একাকিনী বারাঙ্গনা ইত্যাদি। সব অসামাজিক, বুভুক্ষিতদের বৈতরণী হয়ে গেলো middle passage—সামাজিক বোম্বেটের একটা সমাজ হয়ে গেলো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারতীয় সমাজ।

ব্রাত্য এবং সংকর সমাজের মধ্যে আত্মনিষ্ঠার অভাব থেকে যায়। যায় বলেই তারা স্টেটাস খোঁজে। ব্রাহ্ম, আর্য সমাজী, খ্রীস্টানরাও আমাদের দেশেও 'ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দিতে পেলে বর্তে যায়। রক্তের ব্রহ্মণ্য দিনে দিনে ফিকে হলেও, এখন ধনের ব্রহ্মণ্য পাংক্তেয় করে। এই স্টেটাস সন্ধানেই এখন ত্রিনিদাদ সমাজে প্রবল। শাদারা ব্যবসায়ী। কালো এবং চীনেরা ব্যবসায়ী হতে চায়। চায় ডাক্তার এবং আইনজ্ঞ হতে। কালোরা কিছু কিছু আইনজীবী, ভিষক্‌ও—কিন্তু বেশীর ভাগই সরকারী কিংবা বিলিতি কোম্পানীর চাকুরে। মেথর, ছুতোর, মিস্ত্রী, মেছো—ইত্যাদি সব কালো।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ত্রিনিদাদের শ্রম বিভাগ চামড়ার রং নিয়ে বিভক্ত। ধোয়া কাপড় পরতে হলে কালো হাত নোংরা, লণ্ড্রী মাত্রে তাই চীনা বা ভারতীয়। পাঁউরুটির কারবারও তাই। শাকশব্জী মাছ, ভারতীয়। গ্রসারি বেনেতি পুরোপুরি চৈনিক থেকে এখন একটু-আধটু, ভারতীয়ও। মাংসটা প্রায় পুরোপুরি কৃষ্ণকায়। কিছু কিছু ভারতীয়ও। ছুতোর স্থপতি এরা কৃষ্ণকায়। তেলশ্রমিক কৃষ্ণ, চিনিশ্রমিক ভারতীয়।

স্টেটাস-ক্ষুধায় পাগল যারা তারা সাহেব সাজায় ব্যস্ত। য়োরোপীয় পোশাক, য়োরোপীয় সাজ, য়োরোপীয় ধর্ম, য়োরোপীয় ভাষা, য়োরোপীয় সঙ্গীত, শিল্প, ছবি—য়োরোপীয় নাম—সবই কৃষ্টির পরিক্রমায় ক্রমোচ্চতায় পেঁছে দেয়।

গাড়ি এদের পোশাকী পোশাক। ধুতি পরা পিছিয়ে থাকা। পায়ের গোছ পুরুষেরা দেখলে ভারী লজ্জাকর। যে মেয়ের গাউন কুঁচকী অবধি উঠেছে তিনি প্রগতি-শীলা। ভারতীয় কৃষ্টির ধারক এখন সিনেমা। বম্বের 'লা-লা-লা' মার্কা নচ্ছার নক্কারগুলোই ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক। তাই এরাও ভাবে ভারতে যত্র তত্র কিশোর

কিশোরীরা গাছের ডালে ঝুলে প্রেমের গান গাইছে আর প্রেম সাগরে ডুব দেবার জন্যে কাশ্মীরে, চীনিতে, কাংড়ায় দৌড়ুচ্ছে। 'পথের পাঁচালী' দেখে এরা লজ্জায় হেসে বাঁচে না। দু দিন পরে প্রেক্ষাগারে লোক নেই। এবং 'সিংগাপুর' এবং 'ইয়ং ওয়াইফ' দেখতে গিয়ে এরা বলে 'ভারতও তো এখন প্রোগ্রেসিভ হচ্ছে!' অথচ ক্রিকেটার সোবার্স কোন তারকা-রাক্ষসীর কবলে পড়েছে শুনে লজ্জায় এরা অধোবদন। কী আক্কেল ভারতীয় ললনার। ঢলালি ঢলালি শেষ অবধি একটা নিগারের কোলে? ছ্যা, ছ্যা! ক্যানাডিয়ানের কোলে ঢলা ভারী সম্মানের। ত্রিনিদাদ-ভারতীয় যদি কেউ শাদা মেয়ে বিয়ে করে আনে ত্রিনিদাদীয় হেলেনরা আপোষে মর্মাহত। কিন্তু সে ছেলেটির সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেও স্ট্যাটাস খুঁজবে ঠিক।

ত্রিনিদাদে স্ট্যাটাস দুটি ব্যাপারে: এক টাকায়, অন্যটা রংয়ে। প্রথমটা যথেচ্ছ ব্যবহারে, য়োরোপ আমেরিকায় আবিষ্ট থাকায়; দ্বিতীয়টা কালোকে ঘৃণা করায় এবং ভারতের নিন্দা করায়। পাক্কা ভারতীয়দের পেলে এরা বর্তে যায়। দেখায় যেন দেব-লোকের দূত এসেছে। সে জাহিরী ভক্তির ৯০%-ই নিগ্রোদের দেখানো যে,—ভারতীয়েরা ভারতীয়ই।

ওয়াদেকরের দল ক্রিকেট-এ গোহারান হারলেও ভারতীয়রা ভরে দিয়েছিলো ওভাল মাঠ। 'আমরাও যদি হেনস্থা করি, আর আসবে না ওরা।' গাভাস্কার ডবল সেঞ্চুরী করলো। ওভাল মাঠ ভেঙে পড়লো। সে পর্বের শেষ বিজয়ী ইনিংসও ওভালেই হলো। ভারতের বিজয় নিশ্চিত জেনে মাঠে সেদিন ভারতীয় কেউ এলোই না। Beyond the Boundary গ্রন্থে প্রবীণ লেখক সি-এল-আর জেম্‌স্ ক্রিকেট এবং জাতীয়তাবোধ বিষয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। হেইলে সেলাসী এলেন ত্রিনিদাদে। শোভাযাত্রায় গেলো কেবল নিগ্রোরা। ভারতীয়রা সে বাবদে ঠাণ্ডা মেরে রইলো। রানী এলিজাবেথ এলেন, নিগ্রো-ভারতীয় সব গেলো। ইন্দিরা গান্ধী গেলেন। দলিত আফ্রিকা-এশিয়ার আশ্চর্য রমণী। ওভাল মাঠে অমন ভীড় কখনও দেখিনি।

সেই প্রথম যাত্রার প্রথম দিনের কোলীন আমাকে যে ত্রিনিদাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো বিশ বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরে সে ত্রিনিদাদ হারিয়ে গেছে। কোলীনও হারিয়ে গেছে।

কিন্তু তবু কোলীন সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় নি। ফিরে ফিরে ফিরে এসেছে; ফিরে ফিরে ফিরে আসে। সে এক এমনই অধ্যায়। জীবন-উপন্যাসে এরা হলো পরিচ্ছদ। এই কোলীনদের না হলে জীবন মহাভারত পর্বে পর্বে এমন বহু রঞ্জিত বহু রমণীয় হতে পারতো না। আমি বলি এরা 'পার্থ' পাথেয়'। কতো দীর্ঘ, মন্থর, একাকী এ জীবন; কতো এর ক্লান্তি, কতো এর বিষাদ। তবু মাঝে মাঝে কোলীন, স্মেলিং, ক্যাথী, ভিক্তি, মলি-রা আছে এবং থাকে বলেই জীবন মহাকাব্য কথায় কথায়, প্রাণে প্রাণে স্পন্দিত মুখরিত হয়ে উঠতে পায়।

ভাবলাম কোথায় হারিয়ে গেলো সেই কোলীন। হারাবার মতো মনটি তার নয়।

আমাকে আশ্রয় করার মতো প্রশ্রয়ও সে পায়নি। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিত হয়েছি হিমালয়ান ক্লাবে, টাউন হলে, পাবলিক লাইব্রেরিতে। আমার বক্তৃতা শোনার জন্য অবিসম্বাদিত ভীড়ও হয়। মাঝে সেই ভীড়ের প্রথম সারে বৈদেশিক প্রতিনিধিদের কাছাকাছি তাকে বসতেও দেখেছি। কিন্তু ঐ কথা,—হারিয়ে গেছে।

বাঁধবো, সে গ্রন্থী যে ভুল হয়ে গেছে! সে মন্ত্র আর জানি না। তবু কোথায় যেন পাই বেদনা। মনকে ঠেসে ধরে রাখি। ফরাসী দূতাবাসে টেলিফোন করি না। হোটেলে ফিরেই খোঁজ করে না চোখ একখানা লা'ল ভোক্‌স ওয়াগনের।…চলে যেতে হবে গায়ানায়। তার আগে সে কি আসবে?

এলাম সেই সেন্ট জেম্‌স-এর দালপুরীর দোকানে। …না, কোলীনের জন্য নয়। এদেশের বিশিষ্ট দালপুরী এ দেশীয় প্রথায় (মাদ্রাস কারি পাউডার সহযোগে) রান্না চিকেনের সঙ্গে, দেবে আমের-তরকারী এবং কুচীলা। আরও নেবো 'সহীনা', কচুর পাতা দিয়ে বিচিত্র-সুস্বাদু বড়া…এ সবের লোভেই কি? তাও নয়। একটা লোভ, অন্যটা বাহানা।

কিন্তু ভেতরে হাত ধুয়ে টেবিলে বসার মুখে দেখি কোলীন হাসতে হাসতে ঢুকছে। আমার টেবিলে হ্যান্ডব্যাগটা রেখে বললো, অর্ডার দাও; আমি হাত ধুয়ে আসি। বাপ্‌রে, কী বক্তৃতা গো! বক্তৃতার সাগর। আমি ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলাম। অজ্ঞাতকে সঙ্গ দেওয়া যায়। কিন্তু সেলিব্রিটি হান্টিং? ও—নো!…এখন ভয়, কেউ যদি দেখে ফেলে…দাঁড়াও, আসছি।…

ভীষণ ঝাল খাবার। হুস্‌ হাস করছি। নাক ঝাড়ছি। চোখ মুছছি। কোলীন দিব্য চাটুশ-চুটুশ খেয়ে চলেছে। না বলে পারি না, ঝাল খাওয়া দেখে মনে হচ্ছে রংটা তোমার ট্যান্‌ড্‌ না হতেও পারে।

কোলীন ব্যস্ত মশালায় মাখানো মুর্গীর ঠ্যাং আয়ত্ত করতে।

কালোয় অতো নাক সিঁটকুনো কেন? শাদাকে কি আর পাত্তা দেয় নাকি এ দেশ? স্পারোর ক্যালিপসো শোনো নি? শাদা মাংস ঘরে বাইরে যেখানে খাও খেতে জানলে মিষ্টি! কেনিয়াতার ক্যানিবালিজ্‌ম্‌কে নিয়ে যে কথা উঠেছে তারই জবাব!

মনে পড়ে যায় লেখক ক্যারুর এক উক্তিঃ "কী জানো, যখন শাদা মেয়েটাকে অনাবৃত করে বিছানায় ঠাসা হয়, নিগ্রো-রক্তে ঘুমন্ত প্রতিশোধস্পৃহা শতাব্দীর ফসিল-ফেড়ে জেগে ওঠে। তৃপ্তি সুধায় ভরে গিয়ে বলে, "মাৎ করেছি ভাই, মাৎ করেছি! ভালোবাসা? থুাক্‌! প্রতিহিংসা! প্রত্যেক নিগ্রো জানে তার শাদা স্ত্রীর গর্ভজাতরা কালোটাকে বাপ বলে কবুল দিতে ঘেন্নায় মরে যায়।" এই ধারা, অনুলোম প্রতিলোম সংগ্রাম সব চেতনের প্রবাহ না মিটিয়ে বরং বাড়াচ্ছে। কিন্তু এ সব কথায় কোলীন এতো রস পায় কেন? রসটা কেমন যেন বাঁকা রস, ঝাঁঝ রস। কোলীন হাসলো; ব্যস্ত হাতে ধরা মুর্গীর ঠ্যাং, কামড়াচ্ছে।

দোরের ধারে কাউন্টার। কাউন্টারে বৃদ্ধা মহিলা বসে। ভরা মুখ, ভারী চেহারা, গালের ভাঁজ নিবিড়, মাথায় হিন্দুস্তানী (এদেশের) মেয়েদের মতো রুমাল বাঁধা (কুলার্দ

নয় তা বলে)। ঘন ঘন মহিলাটি দেখছেন। খাবার পরিবেশন করছে দুটি নিগ্রো মেয়ে; একটি ভারতীয়।

কোলীন ভেতরে গেলো মুখ ধুতে।

এই প্রথম দেখলুম শাদা মেয়ে হাত দিয়ে মুর্গীর ঠ্যাং ধরে কামড় দেয়, চিবোয়। খেয়ে মুখ ধুতে যায়।

আমি কাউণ্টারে দাঁড়ালুম।

ঠিক কলকাতার কায়দায় একটা প্লেটে লবঙ্গ এবং জায়ফল দিলেন বৃদ্ধা। "লেও বেটা!"

হিন্দী। পরিষ্কার হিন্দী!!

আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি—বিল?

বৃদ্ধা বললেন, কোলীন যঁহা রোজ খাতি হ্যায়।

কোলীন এসে গেছে। ব্যাগ খুলে দুখানা বিশ ডলারের নোট রেখে আমার হাত ধরে তাড়াতাড়ি বার হলো।

আমি তো হাঁ। চল্লিশ ডলার! ধার শোধ দিলে বুঝি?

কথাটায় চমক খেয়ে কোলীন হঠাৎ বললো, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। ধার শোধ। চলো চলো। কুইন্স্ হলে আজ ভালো শো আছে।

ক্যালিপসোর শো। আমি কিছু বুঝিনি। কিন্তু এদেশের সেরা ক্যালিপসো-নিয়ান স্পারোও ছিলেন।

স্টীল ব্যাণ্ড বাজছে। প্রচুর গোল। সিগারেটের ধোঁয়ায় বসে কার সাধ্য। যুদ্ধকালীন ওয়াভেল ক্যাণ্টিনের একটা এয়োরোপ্লেন গ্যারাজ সাজিয়ে ত্রিনিদাদের শ্রেষ্ঠ তামাশা-গৃহ। নাটক 'প্রস্তুত' করতে গিয়ে বার বার আমার বহু ঝামেলা গেছে। সারা হলময় এ্যাম্প্লিফায়ার না বসালে ইংরাজীতে লেখা ভারতীয় নাটক সাধারণের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগলেও মনকে ছুঁতো না।

ক্যালিপ্সোতে বাউলের নৈসর্গিক প্রশান্তি নেই; দাহময় তীব্রতা, স্নায়ুবিকারী তুর্ণতা, প্রচণ্ড বেগ। ক্যালিপসোতে কবির লড়াইয়ের খেউড় আছে, কিন্তু উত্তেজনা নেই; ভাষায় সাহস আছে; বিষয় নির্বাচনে দুঃসাহসিক সমালোচনা আছে; সুরের মাতনে পা নাচিয়ে ছাড়ে—কিন্তু সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নেই। রসটার বেশিরভাগ আদি রস। খোলামেলা আন্-ইন্-হি-বিটেড ভাষা। কিছু কিছু নমুনা পরে মিলবে।

বেরিয়ে এলাম। ব্রিটেন হল্-এ ছেড়ে দিলাম কোলীনকে। বললাম, এ পথটা আমি হাঁটি। রাতে হাঁটতে ভালো লাগে।

কোলীন বললো—সাভানায় গুণ্ডার হাতে পোড়ো না। মেয়ে গুণ্ডার মতো সবাই ওরিএণ্টালিস্ট বলে ছেড়ে দেবে না।...রুটি কেমন খেলে?

হঠাৎ?—ভালোই।

ভালো? ও ছাড়া আমি খাবার জানি না। ঐ রুটিতেই আমার রং কালো।

তোমার রং কালো নয়।

যে বিবাহিত অরিএণ্টালিস্ট, যুবতী একাকিনীকে মাঝরাতে স্তব করতে চাও, মিথ্যে কথায় কোরো না। রাতের মিথ্যে চেনা যায়।...রুটি আর আমি! আচ্ছা কাল হবে। চলি।

মনে হলো কেবল হাত ধুতে যায়নি কোলীন। কোনো বড়ি-টড়ি খেয়েছে। এদেশে ড্রাগের ছড়াছড়ি।

অত্যন্ত মিষ্টি লাগছিল ওর চোখ।

সাভানায় তখন হু হু করছে বাতাস।

পরের দিন।

জানি সকালে কোলীন আসবে।

আমি কফি খেয়ে লাউঞ্জে খবরের কাগজ দেখছি।

হঠাৎ কোনো দেশ জানতে গেলে বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ এবং বইয়ের দোকান দেখতে হবে। এমনিতে ত্রিনিদাদীয় রুচি, জিজ্ঞাসা, বিস্ময় এবং স্তব বিদেশ সম্বন্ধেই উৎসারিত; কিন্তু বিদেশী খবর বলতে এক পাতাও নেই। কোরিয়া, জাপান, আফ্রিকার কোনো নাম কোনোদিন এদেশী খবর কাগজে পাইনি। কঙ্গোর ব্যাপারে ত্রিনিদাদ কাগজ শ্বেত; এনক্রুমার পতনে, 'ক্যা-মজা! জব্দ!' চার্চিল মারা গেলেন। ঘটা করে সব কালো পেঙ্গুইন্ সেজে 'ম্যাস্'-এ গেলো। যখন একজন নিগ্রো ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধালাম, 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ইংরেজ বলছে বলুক, তোমরা বলো কেন?' হেসে ট্যাক্সি-ওয়ালা জবাব দিয়েছিলো, 'সে কী বস? বুঝলে না। ইংরেজ বলে বলেই। নৈলে স্টাইলে বাধে!' ত্রিনিদাদীয় ব্যক্তিমত এবং জনমতে আজও অনেক তফাত। ত্রিনিদাদ? জানে কে? তবু য়ুনিয়ন জ্যাক মাথায় চাপানো ছিল, লোকে ঘোমটা খুলে মাল দেখতে চাইতো। য়ুনীয়ন জ্যাক সরেছে। কে পেঁাছে ত্রিনিদাদ। ত্রিনিদাদে মার্কিনী বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং ঢং খুব চালু। যথা—বিজ্ঞাপন: If you do not drink, it is your business; if you do, it is your (কোনো মদের); পেচ্ছাবখানার গায়ে লেখা—Have a Beer instead. প্রায় নগ্না সুঠাম সুন্দরীর ছবি: লেখা—Want a perfect body? Try here (মোটর মেরামত কারখানার বিজ্ঞাপন!) পর পর কয়েক জোড়া অনাবৃত পা—গোড়ালি থেকে উরু—তারপরে নেই। "Dare to be bare!" (ক্রীমের বিজ্ঞাপন)।

এগুলো কোথায় পায় এরা? কথা হচ্ছিলো একজন আইরিশের সঙ্গে। ভদ্রলোক ব্যবসায়ী। বহুকাল ক্যারেবিয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক। বললেন, এরা মডার্ন হতে চায়। মডার্ন হওয়া এদের ভারী সখের ব্যাপার। ঘরের জিনিস ব্যবহার করাকে এরা মডার্ন বলে না। এতো ফলন এদেশে। টিনেবন্ধ সব্জী কিনে খাবে। কফির দেশ এটা। খাবে নেস্‌কাফে, সানবার্ণ, ম্যাক্‌সওয়েল হাউস। নৈলে মডার্ন হবে না। স্টেটাস থাকবে না। এতো কাঠ। প্রত্যেকে আসবাব কিনবে স্কান্ডিনেভিয়ান। আয়ারল্যান্ডে আইরিশ পোট্যাটো খেয়ে আইরিশ ধনকুবের, বিলিতি রাজা রানীর শান শৌকৎ বজায়

বার এসেছি মাত্র তার সৌন্দর্যের জন্য। 'সাঁগ্রে গ্রান্দে' (বিশাল পাহাড়) সেকালের স্পানিশ শহর। বনেদী স্পানিশ পরিবার, কিছু কিছু আদিবাসী কারীব, সেকালের দাস বিপণির নিগ্রো বংশধরেরা পাহাড়ে পাহাড়ে আজও বসবাস করছে।

পথ আঁকাবাঁকা জটিল হলেও পরতে পরতে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে সফেন তর্জিত সমুদ্র। তাড়নায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে পাহাড়ের অংশ হেথা হোথা সেথা। কোনো কোনোটায় নারকেলের শ্যামল তর্জনী, কোনো কোনোটায় কেবলই গাংচিলের সী-গালের বাসা। তীরে তীরে নারকেল বন ক্রমশ উঁচু হয়ে হয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে। মাঝে মাঝে নির্ঝরিণীর ঝম ঝম করে নেমে এসে সমুদ্রের সফেন মদ-মত্ততার ভৈরব আলিঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

পথ চলে গেছে উত্তর সীমারেখার পাহাড়ী ধার ধরে। সমুদ্র এখানে অতলান্তিকের মুক্তি বৈভবে মত্ত, স্বৈরাচারী। কেটে ধ্বসে নামিয়ে আনছে মৌ-টুসকী গ্রামগুলো। কতো বাড়ি পাহাড়ের বুকে হেলে আছে, সমুদ্রে পড়ে হারিয়ে যাবে। ঐ ভাবে বাড়িগুলো আছে অন্তত বিশ বছর।

ওরই মধ্যে ক্রিকেটও চলছে, মাছ ধরাও। আর চলছে অবাধ স্নান। সমুদ্র যেন বড়ো বড়ো গামলায় বাধা পড়ে ফুঁসছে। এখানে স্নান মানে তরঙ্গের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে স্নান।

কতো ক্লান্ত দিনে, কতো উৎসবের ক্ষণে, কতো বাসর-মনা পুষ্পিত সন্ধ্যায়, কতো বন্দনানত গভীর মধ্যাহ্নে এই উত্তর সাগরের সদা নৃত্যপর দোলাকে বুক পেতে পেতে এসেছি, হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় রঙ্গে ধারণ করতে এসেছি। দিনে দিনে রাতে রাতে এই চৌকো রীফ আমায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

ফিরে এলাম অপর দিকে পাহাড় ডিঙিয়ে। বন, নদী পার হয়ে এলাম ত্রিনিদাদের প্রাচীনতম শহরে, স্পানিশ কালের রাজধানী শহরে—আরিমায়। কারীবদের প্রধান গ্রাম ছিলো। আজও এখানে 'রাণী' আছেন, কারীবদের রাণী।

আরিমা থেকে পোর্ট অব স্পেন। মাঝে সেকালের প্রসিদ্ধ যক্ষা হাসপাতাল 'কাওরা'। পরম প্রিয় রসিক বন্ধু ডঃ মনোরঞ্জন দাঁ এ হাসপাতাল কেন, ডাক্তারি ডাইরেকটোরেটের প্রধান। স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত পরে। যখন হাসপাতাল সাধারণ হাসপাতাল হলো, এখানে পেলাম প্রাণের দোসর চোখের বালি নাতজামাই ডাক্তার ননীগোপাল মজুমদারকে। আরও দু-চার ঘর বঙ্গসন্তান আছেন ত্রিনিদাদে। তবে স্থায়ীভাবে বাস কেবল ডাঃ দাঁ এবং ডাঃ অমিতাভ দে।

উত্তরের সাগরের শেষ প্রান্তে আছে যে কয়টি ছোটো দ্বীপ তারই একটায় প্রখ্যাত কুষ্ঠাশ্রম ছিলো শাকাশাকারি। পাহাড়ী একটি দ্বীপ। সপ্তাহে দুবার জাহাজ ফেরী যায়। কুষ্ঠাশ্রমে সব ব্যবস্থা আছে। বিবাহিত কুষ্ঠীরা ঘরবাড়ি করে আছে। হাসপাতলে দুরন্ত রোগীরা আছে। চমৎকার পরিবেশ। কিন্তু ওরা একা। ওরা বিষণ্ণ। আমি কয়েকবারই গেছি। ওদের কাছে গিয়ে ওদের সঙ্গ দিতে আমার ভালো লাগতো। কতই অভিজ্ঞতা হয়েছে এই বাবদে। দু একটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। গির্জা

আছে। মন্দিরও আছে। মন্দিরে কৃষ্ণ, শিব, হনুমানজী। কুষ্ঠীরা বললো গান শুনবো। গানও শোনালাম ওদের। রেডিওর মাধ্যমে নাকি ওরা আমাকে চিনতো। ওদের বন্ধু আমি। কতোবার গান বাজনার দল নিয়ে, কলেজের ছাত্রছাত্রী নিয়ে কেবল ওদের সেবাতেই নাচগানের 'শো' রচনা করেছি। জায়গাটা, পরিবেশটা মনোরম।

সম্প্রতি ত্রিনিদাদ সরকার কুষ্ঠাশ্রম ভেঙে দিয়েছে। কুষ্ঠ (একটি দুটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া) ছোঁয়াচে নয় এবং এখন চিকিৎসাসাধ্য। তাই একটা হৈ চৈ করে ওদের সমাজের বাইরে করে রাখার পক্ষপাতী নয় সরকার।

ত্রিনিদাদের চাঁদনী চক, কনট প্লেস, চৌরঙ্গী সেকালের মেরিন স্কয়ার আজ তার নাম ইণ্ডিপেণ্ডেন্স স্কয়ার। সেকালের বহু বিঘোষিত বিলিতি কোম্পানীদের সাইন বোর্ডে ভরা! হ্যাগিনস্, স্মাই থী, ফগার্টি, আলষ্টনস এ সব নামের মধ্যে আজকাল দেখা যাচ্ছে জুতাগীর, লাখন কৃপলানী। জাহাজঘাটা এবং শহরের নাভিকেন্দ্র একত্রে। এমন নোংরা অন্যত্র নেই। পথের ধারে জাল শুকুচ্ছে, গন্ধ; সমুদ্রের জল বেঁধে নোংরা দিয়ে ভরাট হচ্ছে, গন্ধ; রেললাইন ছিলো। ট্যাক্সি এবং ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দেবার পর বন্ধ হয়ে গেছে; সেই রেললাইনের ধারে ধারে গন্ধ; তার পরেই সমুদ্র থেকে বার করা নোংরা স্যাঁতসেঁতে জমি; কাতোয়ারে ভরতি; কাতোয়ার যাদের সম্পদ সেই নোংরা-বাছা জীবদের শ্যাণ্টিটাউনও এখানেই, তার গন্ধ; অতঃপর ফার্ণাণ্ড্স-বুয়ারীর ক্কাথ এবং রাবিশ বার হচ্ছে, তার গন্ধ। পর পর ফ্যাক্টরী—গন্ধ। পোর্ট অব স্পেনের সেরা পাড়া ম্যারিনস্ স্কয়ারের গন্ধ—বিচিত্র। এখানেই ব্যাঙ্ক-মহল। সেকাল ভেঙে একাল গড়ার হিড়িক চলেছে। বর্তমান বাণিজ্যিক 'এ্যাফ্লুয়েন্সে'র বদৌলত য়োরোপ-আমেরিকা-কানাডার অর্থ হু হু করে আসছে খাটতে খাটাতে। পুরোনো ইমারতের বদলি নতুন স্কাইস্ক্রেপার রচনার হিড়িক।

ফলে আফ্রিকারই পাঁচো অঙ্গলী ঘী সে, পোয়া বারো! কী এক অ্যালুমিনিয়মের ফ্রেম বানিয়েছে। চার পাঁচ তলা উঁচু জালির মতো। এনে যে কোনো বুড়ী-বাড়ির মুখ-বুক ঢেকে বুরখা পরিয়ে দাও; ব্যস্। আনারকলি হয়ে গেলো। প্রাচীন নবীনা হলো। অসূর্যম্পশ্যা হলো। ওর পেছনে যে পুরোনো বাড়ি আছে বোঝাই যায় না! চেপে, ঢেকে সাজে সজ্জয় এ সভ্যদেশ নটী-টি সেজেই আছে।

পোর্ট অব স্পেন হারিকেন এবং ভূমিকম্পের খপ্পরে পড়ে। হারিকেন 'ফ্লরা'-তে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হলেও মানুষ মারা যায়নি। আবহাওয়া বিভাগ দারুন হুঁশিয়ার। আজকাল উঁচু বাড়ি হচ্ছে; আগে হতো না। 'সালভাটেরী', 'স্মাইথী', 'হলিডে ইন' বড়ো বড়ো ইমারত। বন্দরের সমানে টেলিকমিউনিকেশন বিল্ডিং সর্বোচ্চ। কেনাকাটার চৌরঙ্গী ফ্রেডরিক স্ট্রীট। উইণ্ডো-শপিংয়ের স্বর্গ। দাম চড়া। যে কোনো জিনিসকে দু-গুণ করে দাম। কথায় কথায় ২০% ডিসকাউন্ট! এর সামনে উডফোর্ড স্কয়ার। এখানকার হাইড পার্ক কর্ণার। রাজনৈতিক জনসভার মুখ্যস্থান। এতো গল্প এবং বাজেকথা এখানে চলে যে উডফোর্ড স্কয়ারের অন্য নাম উডফোর্ড য়ুনিভার্সিটি। এই তল্লাটেই সেরা সেরা গির্জা। ক্যাথলিক গির্জাই সবার বড়ো।

একটু দূরে—জামা মসজিদ। অন্যতম বৃহৎ মসজিদ। পৃথিবী বিখ্যাত এঙ্গেস্টুরা ড্রিঙ্কস-এর জন্ম এরই কাছাকাছি। এঙ্গেস্টুরা নিজে পানীয় নয়। তীব্র তেতো। কিন্তু মাপসই দিলে পর মদের পাত্রে, তরকারীতে, নানাবিধ পশ্চিমী খাদ্যে অতুলনীয় স্বাদ এনে দেয়। এ স্বাদ গ্রহণ মাঝে মাঝে চৈনিক খাদ্যে পেয়েছি। গরম-মশলার গন্ধ স্পষ্ট; আরও কিছু আছে। জবাকুসুম হাউসের জবাকুসুমের মতো, পীয়ার্স সাবানের মতো এ্যাঙ্গেস্টুরার ফর্মুলা বিশ্বের অজ্ঞাত রহস্য।

এই দিকটাই পুরোনো পোর্ট অব স্পেন। গির্জার পেছনে বেচারী কলম্বসের অতি দীন একটি মূর্তি। মেরীন স্কোয়ারের মধ্যে রাজকীয় সম্মানে যার মূর্তি তাঁর নাম ক্যাপ্টেন সিপ্রিয়ানী। ত্রিনিদাদে দেশাত্মবোধের জনক। স্বাধীনতা পাবার পর ভদ্রলোকের মান সম্মান পাথুরে শিল্পের দৌলতে জমকালো।

দুদিন কেটে গেছে আরও। তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পর যখন ফিরছি, আমি ক্লান্ত। অবশেষে ব্রিটেন হল হোটেলে গেছি। নেই কোলীন।

কী মনে হলো, চলে গেলাম সেণ্ট জেমস্ পাড়ায় সেই রুটির দোকানে। বৃদ্ধা আমাকে দেখেই টেবিল দেখিয়ে দিলেন। কোলীন বসে আছে। একরাশ কাঁকড়ার ঝাল সুমুখে রেখে দু হাতে ভেঙে ভেঙে পরম কৃৎবিদ্যতার সঙ্গে ভোগ করছে।

আমাকে দেখে একগাল হেসে বললে, "এ, ধরে ফেললে! আমি ধরা দিতে চাইনি।"

আমি বললুম, সাধ্য কী ধরি! এতোই কি সোজা? একা একা খেতে পারি নে তাই খোঁজ করতে গেলুম হোটেলে।

একটা টেবিলে বসে যারা খাচ্ছিলো তারা সবাই টিন-এজরাস। স্কুলের ছাত্র। কথা বলছে ইংরেজীই। তবুও আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু বুঝি অতি কুৎসিত রসিকতা করছে। সিগারেট টানছে, এবং প্রত্যেকে মদ্যপান করে এসেছে। অবশ্যই প্রত্যেকে বুঝছে সে 'হিপী'।' কারুর সঙ্গে নাপিতের সম্পর্ক বহুকাল নেই।

কোলীন, বললো, আমাদের ভবিষ্যৎ!

হবেই তো! ওদের অতীত যে আমরা! হোসো না ওদের তুমি। টিন-এজার্স নিয়ে হাসলেই আমি মেজাজ হারিয়ে ফেলি। আমরা কি? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ-ব্যবস্থা কী যে ওরা আর কিছু হবে?

শিক্ষার কথায় এসে পড়লাম। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠলো। জামায়কায় মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি, বারবাডোজে লে ফ্যাকাল্টি, গায়ানায় সে-কালে এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি ছিলো (ছেদী জগনের সময় থেকে গায়ানায় নিজের বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে, নাম: লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়); ত্রিনিদাদে এখন এগ্রিকালচার এবং আর্টস ফ্যাকাল্টি। কেমিস্ট্রি এবং ফিজিকাল সায়ান্সও ত্রিনিদাদে।

কিন্তু প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বাঁধা লণ্ডনের সাথে। সম্প্রতি এ বন্ধন ছিন্ন হয়েছে এবং সে পর্যন্ত শিক্ষণ ব্যবস্থাও অবৈতনিক হতে পেরেছে।

লণ্ডনের সঙ্গে শিক্ষণ প্রণালীর যোগাযোগ ছিন্ন করে দেশের প্রাণশক্তি এবং স্পন্দন-সাধনার সঙ্গে নিবিড় হয়ে শিক্ষণের বিধি নিয়ে বহুকাল যে সংগ্রাম চালিয়েছি, এখন তা সার্থক হচ্ছে। সার্থক হচ্ছে কাগুজী বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে শিক্ষার প্রবর্তন। ফলে অনেকগুলো পলিটেকনিক কলেজ হয়েছে ত্রিনিদাদে। আছে মাউসিকায় শিক্ষাবিধি আয়ত্ত করার শিক্ষাকেন্দ্র।

আমরা নিষ্প্রাণ শিক্ষার কাগুজে টুপী মাথায় পরে তালেবর ভণ্ডামী করি, ওরা যুদ্ধোত্তর সমাজে জন্মে বুড়োদের ভণ্ডামী দেখে হতাশ হয়ে পড়েছে। মেকীর দুনিয়াকে ওরা বাজিয়ে দেখাচ্ছে সেটা কতো অচল। যে শিক্ষার স্বর্গ চাকরি সে শিক্ষাকে ওরা ত্যাগ করেছে নিষ্প্রাণ কঙ্কালের মতো। ওরা বর্জিত; ওরা হতাশ; ওরা একা। ওদের আক্রোশ জীবনের প্রতি। জীবনধারার বিরুদ্ধে ওদের সংগ্রাম। ওদের সংগ্রাম চার্চের বিরুদ্ধে, ধর্ম নেই; সমাজের বিরুদ্ধে, সত্য নেই; পরিবারের বিরুদ্ধে, প্রেম নেই; বর্ণের বিরুদ্ধে, সাম্য নেই।

কোলীন অস্থির হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষ কেমন জানি না। কিন্তু এদেশে শাদা চার্চ, শাদা সমাজ, শাদা বিচারালয়, শাদা বর্ণ ভেদ...ভাবলেও আমার রক্ত চনমন করে ওঠে। ভারতে শাদার বিপক্ষে সংগ্রাম বরাবরই ছিলো বলে মনে হয়।

মন তোমার উদার। ভারতের বর্ণভেদ, ভারতের অস্পৃশ্যতার পরিণতি যে কী হয়েছে তা তোমার কল্পনার অতীত। কিন্তু শাদা বলেই শাদাব প্রতি এতো রাগ তোমার কেন বলো তো?

তোমাদের দেশের মতো বিপ্লবে বিদ্রোহে যদি স্বাধীনতা আসতো এ দেশে...

আমাদের দেশের বিপ্লব-বিদ্রোহ? হাসালে কোলীন। যদি কখনও হয় তখনও যে বর্ণ এবং লোভ থাকবে না এ আমি ভাবতেও পারি না। ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিলো না, হয়নি। মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত অনিবার্য! শাদা প্রীতি আমাদের দেশে এখন বরং বেড়েইছে।

আমার এক নিগ্রো বন্ধু আছে। স্কুলের বন্ধু। সে বিয়ে করে এসেছে ডাচ বৌ। বললাম, কেনেথ কোন সুবাসে তুই ডাচ মেয়ে বিয়ে করতে গেলি? কেনেথ বলে, বোঝানো যায় না। ওটা যেন রক্তের তৃপ্তি। ও মেয়েটাকে যখন বিছানায় পাই হাড্ডীতে বাপ-পিতোমের রক্ত খট্ খট্ করে হাসে। বলে ওদের শান শৌকত গুঁড়ো করে সেই গুঁড়োয় জুতো পালিশ কর।

উত্তেজনা সয় না। থামিয়ে দিয়ে বলি, আমি বুঝি। আমাদের এক ললনা দেবরের রক্তে চুল ধুয়েছিলো; এক ভাই জ্ঞাতি ভাইয়ের রক্ত পান করে বলেছিলো অমৃত পান করছি।...কিন্তু তুমি তো নিগ্রো নও। এ উত্তেজনা কেন তোমার?

হঠাৎ আমার চোখে চেয়ে বলে, আমি? আমার কী জানো তুমি গুরুজী, পণ্ডিতজী! আমি পরিচয়হীন। চলো। আমি আজ ঘুমুবো। বড়ো ঘুম পেয়েছে।

আমি চমকে উঠে বলি, মদ খেয়েছো!

হঠাৎ রেগে কোলীন বলে, বেশ করেছি! তোমার মতো ভণ্ড নই আমি।

আমি ঘাঁটালাম না। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। যেতে হবে গায়ানায়—আমার প্রথম কর্মস্থলে।

তার আগে দেখে আসি তোবাগো, ক্রুশোর দ্বীপ!

তোবাগোয় কোলীন আসেনি! 'স্কারলেট আইবিস' জাহাজ ছেড়েছিলো রাত আটটায়। গালফ্ অব পারিয়া সরে যাচ্ছে। পোর্ট অব স্পেনের শিয়রে সদা জাগ্রত নর্দান-রেঞ্জের ভাঁজে ভাঁজে ঝলমল করছে আলো। সে আলো নেমে এসেছে শহরের বুকে, জাহাজঘাটায়। জাহাজ উত্তরে বাঁক নিতেই এসে পড়ে তীরে তীরে জেলে পাড়া। রাতের কোল পেরিয়ে ঢেউ আছড়াচ্ছে পাহাড়ী তীরের গায়ে। শাদায় শাদায় বিকীর্ণ সেই মেখলা। আর টিমটিম করছে জেলে পাড়ার আলো।

জাহাজ চলে যায় আরও উত্তরে। তখন ওপরেও আলো। দিগন্ত থেকে দিগন্ত জোড়া অন্ধকারের সমুদ্র ভেদ করে ঐ যেখানে নক্ষত্রলোকে জ্বলছে হাজার হাজার আলো, কালপুরুষের গাঁয়ের পাশে ছড়িয়ে আছে নীহারিকার ফেনা ওখানে কেউ কি লক্ষ্য করছে আমাদের এই ভেলা-খেলায় ভাসানো লোহার তরণী?

আশ্চর্য মনে হয়। মানুষ কতো সামান্য, কতো তুচ্ছ, কতো ছোটো, কতো অসহায়। করুণ মনে হয় মানুষের তৃষ্ণা, স্পর্ধা, অহঙ্কার, স্ফীতি। মনে পড়ে যায়, উপনিষদের সেই কাহিনী—এই তৃণখণ্ডটি কি তুমি সরাতে পারো? পোড়াতে পারো? ভেজাতে পারো? হে ইন্দ্র, হে বায়ু, হে অগ্নি, হে পর্জন্য, হে নামধারী, বিত্তশালী, শক্তিধর শত শত, পারো কি এক চুলও বিচলিত করতে সত্যকে? সেই অখণ্ড অবিনাশী সত্যকে? তুমি যদি মহান হও, সত্য তার চেয়ে মহৎ; যদি গুরু হও, সত্য তার চেয়ে গরীয়ান; যদি অণুতায় অণুত্বে তোমা অহং তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে, হে অহং, সত্য তারও চেয়ে অণুতর। কিছু হয়েই তোমার শান্তি নেই। তুমি অশান্ত তোমার অহং-এর তাড়নায়।

গান গাইছি—আমারে তুমি অশেষ করেছো···

এরা ভালো। ডেকে শুতে দেয়। আমার গান শেষ হতে যাঁরা সরে গেলেন তাঁদের আমি চিনিনি। কেবল ইঞ্জিনের ধক ধক শব্দটা ধীরে ধীরে কখন যেন আকাশের গায়ে ইন্দ্রলেখার মতো মিলিয়ে গেলো।

সকালে স্কারবারা। চারটেয় উঠে আলো দেখলাম। এবারে বাঁ দিকে। বুঝলাম তোবাগো দ্বীপ। কেবিনে গিয়ে স্নান সেরে নীচে নেমে এক কাপ কফি খেয়ে ডেকে এসে বসলাম।

আটটায় স্কারবারাতে নামার ধুম।

নামছে বেশীর ভাগ ব্যবসায়ী। তরিতরকারী থেকে, মনোহারী, ওষুধপত্র, কাপড়-জামা, মায় নতুন গাড়ি মোটরসাইকেল, সাইকেল সব নামছে। এই যাওয়া আসায় কোনো শুল্ক নেই। দেশের মধ্যে এ-পাড়া ও-পাড়া।

সবাই নেমে যাচ্ছে। আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ভীড়টা দেখছি। হঠাৎ চোখ পড়লো

দূরে সকালের রোদে ফুলছাপ গাউন পরে মাথায় উড়নী বেঁধে দুটি মহিলা দাঁড়িয়ে আমায় দেখছেন, হাসছেন। চোখ পড়তে হাত তুলে স্বাগতম্ জানালেন। ভদ্রতার খাতিরে আমিও হাত তুললাম। কিন্তু চিনলাম না।

ওঁদের গাড়ি ছিলো। স্টিমারে যে যার গাড়ি নিয়েই আসে। তখন চিনলাম মিঃ এবং মিসেস কিসুন,—সেই মারাভালের ককটেল্-এ আলাপ। সঙ্গে কিসুনের মা শাইরুন।

আপনি তো চমৎকার গান! কী গাইলেন বুঝি না, জানি না। কিন্তু খুব যে আধ্যাত্মিক গান বুঝি।

মিঃ কিসুন বললেন, ট্যাগোর! না হয়ে যায় না। শুনুন আমি অপেক্ষা করে আছি। যদি অন্য কোথাও কোনো কথায় আবদ্ধ না থাকেন দু দিন মানে এই উইক এণ্ডটা আমাদের গাড়িতে আসুন। আমরাও স্রেফ বেড়াতে এসেছি।

আমি সবিনয়ে বলি, ক্রুসো হোটেলে আমার সীট বুক করা আছে। তবে বেড়ানো তো চলতেই পারে। এ দেশের লোক সাথী হলে বরং চোখের দেখা মনের কবিতা হয়ে যাবে। তাই না!

দুদিন খুব বেড়ালাম। ছোটো দ্বীপ বিশ মাইল একদিকে উত্তর-দক্ষিণে ১২ থেকে ৮ মাইল। কিন্তু অপূর্ব দ্বীপ। এমন দ্বীপ আমি একটাই মনে করতে পারি,—মাদীরা, আফ্রিকার উত্তরে, স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিমে।

প্রায়ই আমায় লোকে প্রশ্ন করে, সারা পৃথিবীতেই তো ঘুরলেন। কোন্ জায়গা ভালো? জবাব সেই বাদশাহী—কোহিনুরের কতো দাম?…পাঁচ পয়জার! ভালো লাগার জাতিভেদের যে সীমা নেই। কতো কারণে কতো ভালো লাগা। কিন্তু বহু প্রখ্যাত হওয়াইয়ের চেয়ে ঢের ভালো লেগেছে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সল্ট লেক্স আইল্যাণ্ডের পুঁতির মালার মতো দ্বীপগুলি—যে কোনোটা। সংসারের বন্ধন না থাকলে তোবাগোয় গিয়ে হয়তো বাসা বাঁধতাম না, কিন্তু মদীরায়? বোধহয়। ত্রিনিদাদে, বিস্ময়কর পরিবেশ মায়াজাল বিছিয়ে রেখেছে। কালিফোর্ণিয়ায় মেক্সিকো অঞ্চল কালিফোর্ণিয়া উপসাগরের পশ্চিম তীরে আর সব মিলিয়ে ভালো লাগে কেরালায় নীলগিরির উপকণ্ঠে কোনো সমুদ্র ছোঁয়া গ্রাম।

কিন্তু তোবাগো বড়ই রমণীয় আর অগুনতি উপসাগরের জন্য। তোবাগো রমণীয় তার শান্ত সৈকতের জন্য। তোবাগো রমণীয় তোবাগোনীয়ানদের স্পষ্ট, সোচ্চার, সরল জীবনছন্দের জন্য।

নাইলন পুল একটি অবিশ্বাসনীয় সমুদ্রখণ্ড। তলায় শাদা প্রবালের বালি। জলের ওপরে রোদ পড়লে সিল্কের মতো টলমলে ঝলকে তুঁতে রংয়ের দোল। কোমর অবধি শান্ত জল দু-তিন মাইল। জলে নামলে উঠতে ইচ্ছে করে না।

আর আছে বাক্‌কো কোরাল্ লাগুন। ডাইভিং করার মতো চশমা ইত্যাদি নৌকো-ওলারাই দেয়। মাথায় টুপী এবং চোখে চশমা এঁটে কোমর জলে চোখ মেলে ডুব দিয়ে রীফ ধরে চলে গেলে রঙের হাট, রঙের মেলা। হাজার হাজার নানা বর্ণের মাছ। নির্ভয়ে নিরাপদে এরা ঘোরাফেরা করছে। আগন্তুকদের কখনও হতাশ করে না।

কিন্তু এবার হোটেলে ফিরতেই কোলীনের চিঠি পেলাম। বিকেলে নিয়ে যাবে কুইনস হলে। কী একটা শো আছে। আমার সীট বুক হয়েছে আর একদিন পরে। সেই বিকেলটা. আরও একটা পুরো দিন।

কোলীন তার কাজে গেছে। আমি দিনমানটা ঘুরে বেড়ালাম। পোর্ট অব স্পেনের বুক ছেড়ে উঠেছে দুটি পাহাড়ী এলাকা। ল্যাভেন্টিল এবং বেলমণ্ট। ত্রিনিদাদের পরম গর্বের কথা প্রাইম মিনিস্টর ডঃ এরীক উইলিয়ামস ইতিহাসের সুপণ্ডিত। পণ্ডিতের আদর করেন। ধুরন্ধর কূটনৈতিক হিসাবে উইলিয়ামসকে সকলেই মেনে চলে। তাঁর এলাকা এই ল্যাভেন্টিল এবং বেলমেণ্ট। সেই সুপ্রাচীন স্পেনের সমৃদ্ধির দিনগুলোয় যখন গালফ অব পারিয়ার জল আজের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স স্কয়ারের বুক বয়ে ভেসে যেতো তখন এই সব পাহাড়ের তলায় ছিলো বন্দর। পাহাড় ভর্তি ছিলো বন্দর সংলগ্ন "রিফ্-র‍্যাফে"র বাসস্থান। আজও প্রায় তাই। যতবার যতো বিপ্লবের ধুয়া উঠেছে ত্রিনিদাদে এই ল্যাভেন্টিল বেলমণ্ট তার পুরোধা। আজও তাই। 'যে ল্যাভেন্টিল শাসন করে সেই ত্রিনিদাদ শাসন করে'। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যদি ভয় খায় তো এই মহাসংগ্রামী, সদা বিপ্লবী, অকুতোভয় দীন দরিদ্র বেপরোয়া ল্যাভেন্টিল বেলমণ্টকে ভয় করে।

এই পাহাড়ের শিখরে সী লেভী ল্যাভেন্টিলের গির্জা। এমনি সী লেভীর গির্জা আছে কালো দেবীর কালিফোর্ণিয়া গ্রামের পিছনে, এবং বিখ্যাত সিপারিয়ায়।

সিপারিয়া নামই এসেছে কেউ বলে শিউ-পিয়ারী মাঈ, কেউ বলে সুসারী মাঈ, কেউ বলে কালীর কালো দেবীমূর্তি থেকে, কেউ বলে আফ্রিকার উর্জুলা মায়ের মূর্তি থেকে। সে যে নামই হোক খ্রীস্ট ধর্মের সঙ্গে এসব মূর্তির কোনো যোগাযোগ নেই। তবে ধাক-ধমকের জোরে যে কোনো প্রসিদ্ধ মন্দির, মায় দেবীসুদ্ধ, খ্রিস্টীয় করে তা থেকে পৌরোহিত্যের ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করার ফিকির সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা এবং মেক্সিকোয় প্রবল।

খুব গরম। বন্দরের কাছে সরকারী এগ্রিকালচারাল প্র ডিশনস কেনার মস্ত দপ্তর। তার লাগাও ফলের বাজার। সেখানে সামনে নেবুর রস বার করে গ্লাস ভরে বেচছে। তাজা ফল; তাজা রস। এক গ্লাস খেয়ে, দ্বিতীয় গ্লাসে চুমুক দিতে যাবো, দোকানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো কোলীন।

এক গাল হাসি। ফ্রেঞ্চ এমবাসীর দুটো বাকসো খালাস করতে এসেছিলাম। তেষ্টা পেলো ঢুকে পড়েছিলাম, তোমার দেখলাম খুব তেষ্টা পেয়েছে।

এবারে সোজা চলে গেলাম শাগুয়ারেমাসের পথে একটা চীনা রেস্টুরাণ্টে। সমুদ্রের ওপরে রেস্টুরাণ্ট। বারান্দাটা ঝুলে আছে সমুদ্রের ওপর। অদূরে জলের ওপারে সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়। ঢেউ ছোটো ছোটো। দলে দলে আঘাত করছে বারান্দার দেয়ালে। শব্দ হচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ। স্বাভাবিকভাবেই গুনগুনিয়ে উঠলো কোলীন।

আমি বলি, কি সুন্দর ত্রিনিদাদ। যেদিকে যাও প্রকৃতির অকৃপণ দান। রোজই দু-এক পশলা বৃষ্টি। তখুনি সব পরিষ্কার। টেম্পারেচার বরাবর ৬০° থেকে ৮০°-র মধ্যে। বাতাস কখনও থামে না। খাদ্য নানাবিধ, অফুরন্ত। ফলের তো কথাই

নেই। আম, কাঁঠাল, লেবু, আনারস, কলা, তরমুজ, নারকেল—কী নেই! অথচ মানুষ কী নোংরা করে রেখেছে। দেখে আমার কষ্ট হয়। পথে যতো মোটর ততো মোটরের কংকাল।

কোলীন বলে, এ বিষয়ে আমরা পুরোপুরি ভারতীয়। এ নোংরা যা দেখছো তার চেয়েও বড়ো নোংরামী আমায় কাঁদায়। এই তত্ত্বের ব্যবসা।...বুঝলে না? ভারত থেকে সাধু সন্ন্যাসী আসার হিড়িক লেগেছে। প্রচার করবে দর্শন-গীতা-ব্রহ্ম-কচুরঘণ্ট! কিন্তু বেঁধে নিয়ে যাবে ডলার। ফলে এ কালের ভারতীয়েরা সারা ভারত ধর্মটাকে, যার বলে এবং আশ্রয়ে এরা বেঁচেছিলো এবং আছে, এখন উপহাস করে। শুধু তাই নয়, রীতিমত এ বুজরুকীর প্রতিপক্ষী হয়ে দলে দলে খ্রীস্টান বা মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। এ নোংরামী বন্ধ হয় কিসে?

আমি এ কথার জবাব দিতে পারি না। বললাম, যদি আমি এ দেশে এসে কখনও বাস করি কোলীন, কেবল এই জন্যই বাস করবো।

কি জন্য?

আমি এ দেশের ভারতীয়দের শেখাবো যে তাদের জীবনে ভারতের চেয়ে ত্রিনিদাদ অনেক বড়ো সত্য। কিন্তু সে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে কেবল ত্রিনিদাদ নিয়ে থাকলে হবে না। একটা বাঁচবার মতো আদর্শও চাই। সেই আদর্শ হবে গীতা, উপনিষদ। সেটা ভারতবর্ষ বা হিন্দুধর্ম নয়। তারও বড়ো ধর্ম মানুষের ধর্ম। বোঝাবো এ ধর্ম রাখলে রইলে; না রাখলে থাকবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। রক্তের জারজতা, সমাজের জারজতা—কোনো জারজতাই নয়। আসল জারজতা ধর্মের জারজতা। মানুষ হয়ে পশুধর্মকে আশ্রয় করার বড়ো জারজতা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার ডিকসনারিতে 'ধর্ম' আছে কিন্তু রিলিজন নেই। সাংঘাতিক চীজ রিলিজন! পুরুতের তৈরী। আমার আছে ধর্ম, শাশ্বত, সনাতন। যেমন জলের ধর্ম নীচের দিকে ধায়, আগুনের ধর্ম তাতায়, বাতাসের ধর্ম গরমের দিকে বয়। এমনি ধর্ম। যা আমাদের চিরকালের। যা আমাদের বেঁধে রেখেছে প্রাণে প্রাণে, মনে মনে।

কোলীন হঠাৎ আবেসভরে আমার হাত টিপে বললো, এসো, এসো তুমি ত্রিনিদাদে। তোমায় ত্রিনিদাদ ভালোবাসবে। এখন চলো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যাই।

বলছিলে কুইন্‌স্ হল?

হ্যাঁ গো। চান করে ডিনার। তারপরেই তাড়াতাড়ি কুইন্‌স্ হল। সেখানে খুব রসিক এক বন্ধু আছে তোমার এবং আমার। আর্ট জগতে পাক্‌কা ঘুঘু, ধুরন্ধর। কুইন্‌স্ হলের ম্যানেজার ফস্টর বেয়ার্ড।

খুব মজার মানুষ ফস্টর বেয়ার্ড। বেঁটে না হলেও লম্বা নন। নিগ্রোদের তুলনায় শান্ত, ভব্য চেহারা, কোমল পরিমিত বচন।

আমায় ভারতীয় অভিনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। দেখলাম ভারতীয় সিনেমা সম্বন্ধে কোনো আশা পোষণ তিনি করেন না। বলেন, লোকের রুচি গড়ে তোলার দায়িত্ব যখন কোনো শিল্প হারায় তখনই শিল্পের আসল সার্থকতা ফুরিয়ে যায়।

শিল্পীর অসাধারণ দায়িত্ব আছে জনতার কাছে।...আমাদের এই স্টেজে, কার্নিভালে দিনের পর দিন যা চলছে দেখলে মনে হবে আফ্রিকান মানেই ঘাসের ঘাগরা, অনাবৃত বক্ষ, এবং অশিষ্ট, দীন, অপরিচ্ছন্ন পোশাক।...এ সত্য নয়। গরীবও অপরিচ্ছন্ন নয়। হলেও সেটাব মধ্যে মানুষটার প্রাণ নেই। যে অপরিচ্ছন্ন সেও অপরিচ্ছন্ন হতে চায় না। আমি যা তাই, এটা যেমন ছবি, তেমনি আমি যা হতে চাই সেটা সে ছবির বাণী।

ভালো লেগেছিলো কথাটা।

কোলীন বাধা দিয়ে বললো, "মুন অন্ এ রেনবো শল" তো ডেরিক ওয়ালকটের বহু কীর্তিত নাটক।

মিস্টার ফস্টার বেয়ার্ড মুখের পাইপটা সরিয়ে বললেন, বহু কীর্তিত! শ্যান্টি টাউন, ছেঁড়া প্যান্ট, ক্যালিপ্সো এবং মুর্গীর পাল—এ ছাড়া যেন নাটকে রিয়ালিজম্ আনতেই পাবে না এরা। ত্রিনিদাদ জীবনটা কি কেবলই মহা দুঃখের? কুল্যে দেশটায় হয়তো দশ লাখ লোক। গত ইলেকশানে খরচ জুগিয়েছি আমরা তিন লক্ষ ডলার। প্রতি বর্গমাইলে মাত্র বড়জোর ১৫৬ জন লোকের বাস। এমন গরীবি কোথায় মশায়? কিন্তু ঐ এক অজুহাত—রিয়ালিজম্। স্বপ্ন নেই, ধারণা নেই, খরচা নেই, চেষ্টা নেই। যা হচ্ছে নিউইয়র্কে, ৪২-৪৩ নং স্ট্রীটে, ব্রড্ওয়েতে তাই আদি ও শেষ। হেড়া গ্যাবলার, রেইনা, গ্যাস লাইট—এরা কি রিয়ালিস্টিক নয়? বিকৃতি মশায়, বিকৃতি। স্টেজের গান শুনবেন?—ক্যালিপ্সো। বিখ্যাত বিখ্যাত ক্যালিপসো শুনলে কান মাথা ঝিম ঝিম করবে। "দি ইয়াঙ্কী ডলার সুইট সুইট সুইট!" শুনেছেন? হি পেড্ দি মদর, হি পেড দি ডটর, হোয়াই? দি ডলার ওয়াজ দি সেম! ওন্লি ইট ডবলড্, ওনলি ইট্ ট্রেবল্ড্, দ্যাট্জ্ এ প্রাইস্,—নো শেম!!.. অথচ নিগার প্রাইড্ নিয়েও অহংকার কম নয়। স্পারোর ক্যালিপ্সো আছে—

ওয়েল দি ওয়ে হাউ থিংগস্ শেপিং আপ
অল দিস্ নিগার বিজনেস গোয়িং টু স্টাপ্
এ্যান্ড সুন ইন দি ওয়েস্ট ইন্ডীজ্
ইট উইল বি, "প্লীজ, মিস্টার নিগার প্লীজ।"

আমি বাধ্য হয়ে বলি, ক্যালিপ্সো আছে বলেই তবু ত্রিনিদাদে পাবলিক ওপিনিয়ন বলে কিছু আছে।

মিটি মিটি চাইলো বেয়ার্ড। বোধহয় ভাবলোও আমি বিচ্ছু। আপনি ভালো ক্যালিপ্সো শুনেছেন?

হেসে বলি, হ্যাঁ। সেই হোম মিনিস্টার আর প্রাইম মিনিস্টারে নট-খট নিয়ে ক্যালিপ্সো, "লে—দেম গো টু হেল্" ক্যালিপসোটার কথা মনে হয়। আপন দেশের প্রাইম মিনিস্টারকে অমন করে কেউ ব্যঙ্গ করেনি। অপূর্ব। আমাদের দেশে বাউলরা, চারণরা, কবিগানের কর্তারাও জীবন্ত দিনে অমন করতেন। তোমাদের দেশে দু সপ্তাহ ধরে যে সব ক্যালিপ্সো চলে সারা বছর ধরে তার রেশ বজায় থাকে।

কার্নিভ্যাল সীজনের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ, দু-দিনে যা পার্গেশন হয় তার ধাক্কা চলে তিনশো তেষট্টি দিন। কার্নিভ্যালই ধরুন। আর্ট বলে খ্যাতি লাভ করেছে। জার্মানীর কার্নিভ্যাল, রায়ো ডি জানেয়োর কার্নিভ্যাল। সে সব মনে রাখার মতো।

কিন্তু মিঃ বেয়ার্ড কী খরচাই করে কার্নিভালে এখানকার লোক! সালডীনার "চায়না টাউন"-এ অন্তত শ' চারেক ডান্সার ছিলো। প্রত্যেকের পোশাক অন্তত দেড়শো ডলারের। এমনি ব্যাণ্ড অন্তত গোটা চল্লিশ।

আর্ট তাই? ও নইলে সরকার ট্যুরিস্ট পেতো না। হোটেল মোয়াক্কেল পেতো না। ত্রিনিদাদ এণ্টারটেনার সাপ্লাই করে পয়সা করে। এ দেশের লোক শিক্ষা বিস্তার করার কথা ভাববে, সে এখনও ঢের দেরী। আপনি দেখছি কার্নিভ্যাল এবং ক্যালিপসোর গুণগ্রাহী। শুনুন ক্যালিপসো, মনে করুন যে মা-মেয়ে নিয়ে ক্যালিপসো শুনছেন। বুঝবেন এদেশের আর্ট রুচি শৃঙ্গারও নয়, আদিরসও নয়, পচা, পচা, পচা।

টেল ইওর সিস্টার টু কম্ ডাউন বয়
আই হ্যাভ সামথিং হিয়ার ফর শী
টেল শী, ইজ্ মিস্টার বেন্ উড ডিক্
দি ম্যান ফ্রম সাংগ্রে গ্রাণ্ড।
শি নিউ মী ওয়েল্… আই গিভ শী অল্‌রেডী!
হ্ম্… ম্! শী মাস্ট রিমেম্বার মী…গো অন্ গো অন্…
টেল শী মিস্টার বেন উড কম্।

লাল হয়ে উঠেছে কোলীন। কিন্তু বেয়ার্ড থামে না:

সিন্স দ্য ইয়াঙ্কীজ কেম টু ত্রিনিডাড্
দে হেভ্ দ্য ইয়ং গার্লস্ গোয়িং ম্যাড্…

কোলীন থামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি বাতাশারিয়াকে যা বোঝাচ্ছেন তা একটা দিক। খুব ভালো ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয় নিয়েও ক্যালিপসো আছে। টেস্ট বদলাচ্ছে।

নিগ্রোদের মধ্যে যখন জাতীয়তা বোধের কথাটা আসে তখন ওদের রংটাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। আসলে কৃষ্টি এবং মানবতার মাধ্যমে নিজেদের চরিতার্থতা খুঁজে পাবার হদিস ওরা হারিয়েছে। পশ্চিমী পর্যটকরা যখন নিগ্রোদের 'নেটিভ' বলে, ওরা মেনে নেয়। যেন আরাওয়াক, কারীব এরা কেউ নয়। কবি, নিগ্রোকবি কবিতা লিখছেন—

সূর্যে ধোয়া এ দ্বীপখানি আমার,
এখানে আদিম কাল থেকে
ঝরিয়েছে ঘাম আমার পূর্বপুরুষরা।

'আদিম-কাল থেকে!' এ আবার কোন আদিম কাল? নিগ্রোরা দাস জাহাজে এলো তো

এলিজাবেথের সময়ে ১৭শ খ্রীস্টাব্দে ! শাদা-স্বর্গ থেকেই এরা চাবুক থেকে চামর অবধি কোড়া থেকে ঘোড়া অবধি পেয়েছে। শাদা বাইবেল ওদের বাইবেল ; শাদা চার্চ ওদের চার্চ ; শাদা ভাষা ওদের ভাষা ; শাদা রান্না ওদের রান্না ; শাদা বিয়ে ওদের বিয়ে ; শাদা তালাক ওদের তালাক। ওদের স্বপ্ন, গান, সাহিত্য, শিল্প, এতো শাদা যে শাদাদের শত্রু ওদের শত্রু ; শাদারা যাকে ঘৃণা করে ওরাও তাকে ঘৃণা করে। "আমাদের আলাদা কৃষ্টি যে নেই, আমরা যে আজ মহৎ পশ্চিমী সভ্যগোষ্ঠীর অন্যতম, এটা যতো তাড়াতাড়ি আমরা বুঝতে পারি ততোই আমাদের মঙ্গল ! আমাদের কৃষ্টির মূল পাশ্চাত্য কৃষ্টি—সেই গ্রীস এবং খ্রিস্টীয় কৃষ্টি —যার তত্ত্বকথা তিনটি—নীতি, প্রজ্ঞা এবং বিশ্বাস।" বলেছেন লেখক বরেণ্য নিগ্রো পণ্ডিত !!—সি. এল্. আর. জেম্স্।

আমি বলি, কোলীন তুমি তো ফরাসী ! ত্রিনিদাদের আঁতের কথা জানলে কি করে ? এবং ত্রিনিদাদের দুর্বলতার কথা বলতে গেলে তোমার এতো জ্বালা কেন ?

কোলীন বললো, আমি ফরাসী কি-না সেটা বড়ো কথা নয় ; বড়ো কথা এই যে থালায়-করে মেঠায়ের মতো স্বাধীনতা পেয়ে দেশটা গোল্লায় গেলো। পচে গেলো। পূর্ণত্ব পাওয়ার আগে প্রসব যেমন সর্বনাশা, বেদনাবিহীন প্রসবও তেমনি প্রাণহীন।

তোমার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি সমগ্র ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান সাহিত্যের প্রাণ সম্পদ যে বিক্ষোভ, সেটি রঙের বিক্ষোভ ; অর্থনীতি, সমাজনীতি কিংবা রাজনীতির বিক্ষোভ নয়। এখনও ওরা বই লিখে দুনিয়ার সহানুভূতি চায়। এটা শুধু দারিদ্র্য নয়, দীনতা। সাহিত্যের প্রাণ দীনতা হতেই পাবে না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বলিষ্ঠ সাহিত্য কবে হবে ? কবে এ সাহিত্য পিছন পানে চাওয়া ছেড়ে সুমুখপানে দৃষ্টি মেলে ধরবে ?

সুমুখে কারা তাকায় বন্ধু ? যাদের সুমুখ আছে। তোমাদের দেশের কথা যখন বিদেশীরা লেখে তখন তারাও 'জাত' নিয়েই তোমাদের দেখে। থাকো ত্রিনিদাদে বুঝতে পারবে, জাত এখানকার আষ্টেপিষ্টে। সিভিল সার্ভিস বলে জাত, ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে জাত, দৈনিক শ্রমিক বলে জাত ; মাস-মাইনে পাওয়া জাত ; এ পাড়ার জাত ; ও পাড়ার জাত ; আইনজীবী-ডক্তার এক জাত ; চাষী-মজদুর অন্য জাত। টাকার জাতটা হয়তো টিলে ; তেমনি যতদিন সেটা থাকে, লোকে এঁটেই সেটা ধরে থাকে। বাপের পরিচয় ছেলে দেয় না, ভায়ের পরিচয় ভাই দেয় না। এককাল ছিলো এই সমাজে মিলেমিশে থাকতো দুটো জাত—একটা নিগৃহীত, একটা আনন্দিত ; একটা প্রপীড়িত, অন্যটি পীড়ক। এখন সে ব্যবস্থা নেই। এখন একটা সম্পন্ন ধনী, অন্যটা ধনহীন অপাংক্তেয়। পংক্তি বিভাগ পদে পদে এখন। সিনেমা, কমার্শিয়াল রেডিও, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বিজ্ঞাপনের সুর, জিনিসপত্র বেচার দোকানদারীর ভঙ্গিমা—সব, সব যেন আমাদের মানুষ সমাজের মনুষ্যত্ব গুঁড়িয়ে দিয়ে আমাদের রোজগার ধান্ধার কলকব্জা করে দিচ্ছে। আমরা বুঝছি। কখনও আপোষ এই পংক্তি নিয়ে ; কখনও সমাজে রং নিয়ে ; কখনও রোজগারে ধন-সাম্য নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধ চলছে ঠাণ্ডা। বিঘোষিত যুদ্ধ আসছে না।

বিঘোষিত যুদ্ধ এলো ত্রিনিদাদে। সেটা ১৯৭১। সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা

করলো। পুলিসরাজের যথেচ্ছাচার, শ্রমিক সংঘর্ষ এবং সরকারী যদৃচ্ছাচারিতা এক সময়ে ব্যারাকের নীতি শৃঙ্খলার মধ্যে ফাটল ধরালো।…আমেরিকান জাহাজ হুমকি দিলো 'সো নহী হোগা'। সরকার সারা দুনিয়ার অস্ত্র চেয়ে বেড়ালো। সে এক সসেমিরা পরিস্থিতি। বিদ্রোহ থামতো না। থামলো এক অভূতপূর্ব সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যস্থতায়। কিন্তু ফল হলো বিশ্বাস হনন। সৈন্য বিভাগকে বিভাগ বরখাস্ত হলো। বিদ্রোহের নেতারা কারারুদ্ধ হলেন।…জনমত গোমড়াতে লাগলো।…ফলে কারারোধের আদেশ উঁচু মহাল থেকে বাতিলও হলো। বহ্নি ধূমায়িত। পাহাড়ে জঙ্গলে গেরিলা শিকাব চললো। গেরিলা হনন হতে লাগলো জনমতের বিরুদ্ধে। ১৯৭৫-এ আবার হলো সামূহিক ধর্মঘট। জল, কল, তেল, চাষী, মজদুর, ডাক সব অচল। সেটাও চাপা হলো সমঝোতার মাধ্যমে। সবিক্রমে ন্যাশানালাইজেশন চলছে। কিন্তু বহ্নি যে প্রজ্বলিত তা ধোঁয়া থেকে এখনও প্রকট।

শো ছিল এক জর্মন মহিলার পিয়ানো। শেষ অবধি থাকিনি। ক্লান্ত আমি। পথটা নির্জন। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। কুইন্‌স্‌ রয়্যাল কলেজের ঘড়িটা জ্বলজ্বল করছে। শ্বাভেস্ফীল গির্জার ওপর অজস্র চাঁদের আলো। কাল সকালে প্লেন। কোলীন যেন চুপ করে গেছে।

আমিও।

হঠাৎ কোলীন বললো—জানো, ফ্রান্সে আমি যদি যেতামও, আর আমার যাবার ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ ফ্রান্সের কথা কেন কোলীন?

আমাকে যে ফরাসী বলো তুমি।

ফরাসী তোমার নাম, চেহারা,—এবং

হ্যাঁ, ফরাসী দূতাবাসে কাজ করি।

তাও।

কিন্তু রং?

ফরাসীরা রং নিয়ে অতো উদ্ব্যস্ত হয় না বলেই জানি।

ঠিকই জানো। সে ফ্রান্সের ফরাসী। আমার বাবা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফরাসী। মাও ছিলেন ভারতীয় ফরাসী।

ভারতীয় ফরাসী?

হ্যাঁ; হতে দোষ? চন্দননগরের মেয়ে।

তোমরা বাঙালী?

নইলে তোমাকে ধরেছি কি কন্দর্প বলে? তোমার চেয়ে ঢের সুঠাম কন্দর্প আছে। বাক্যবাগীশ বলে? তাও ঢের!

তোমার বাবা কোথায়?

ফ্রান্সে, ফরাসী মেয়ে বিয়ে করে জাতে উঠেছেন।

মা ?

সেণ্ট জেম্‌সে রুটি বেচেন !

হঠাৎ যেন সব দেখতে পাই।…বলি, আগে বলোনি ?

কি হতো ?

তুমি হোটেলে থাকো কেন তবে ?

মা !

মা—কি ?

মা ভাবেন—ঐ রং ! যদি হোটেলে থাকি হয় তো শাদার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। কিন্তু রুটিউলী ধুমসী কুলী মেয়ের কাছে থাকলে তো স্বর্গে চড়া হবে না।

এ দেশেও তো ভালো ছেলে, ভারতীয় ছেলে আছে।

এ দেশে ভারতীয় ছেলে কুলী। মা কুলী নাম খণ্ডাতে চান। জাত বদলাতে চান।

ভালো ভারতীয় দেখে—

চুপ করো তো তুমি। ভারতের কোন্ ছেলে কুলটার সঙ্কর জারজ মেয়ে বিয়ে করার তাকৎ রাখে। বাজে বকো না। তোমরা সবাই পাষণ্ড, ধড়িবাজ।

গাড়ি চালাচ্ছিলো কোলীন। হাতে স্টিয়ারিং।

সামনে থেকে মোটরখানা আসছে। তার আলোয় দেখি কোলীনের গাল চিক চিক করছে।

প্রথমবারের মতো ওর গায়ে হাতখানা রাখি।

ও হাত সরালো না। সাড়া দিলো না।

কথা বলিনি।

কুইন্‌স্ পার্ক হোটেলে গাড়ি থামলো। নামলাম।

ও নামলো না।

বললুম, নামবে না ?

না ! কাল আমি বিমান বন্দরে যাবো না। আঁ-রিভোয়া।

কিছু বলার আগেই গাড়িখানা একেবারে ফার্স্ট গীয়ার থেকে থার্ড গীয়ারে তুলে উধাও হয়ে গেলো কোলীন।

গায়ানা

যখন গায়ানায় প্রথম এলুম তখন তার নাম ব্রিটিশ গায়ানা ; বী-জী। অনেকেই এ দেশটার খবর রাখে না। কেউ ভাবে আফ্রিকার গিনী কোস্ট, কেউ ভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের নিউ গিনী। গায়ানার আদিবাসী আরাওয়াকদের ভাষায় 'গুয়ানা'। কথাটার মানে—নদীমাতৃক দেশ। সত্যিই নদীমাতৃক। বিশাল বিশাল নদী গায়ানায়। দেখলে চোখ জুড়োয়। চোখ জুড়োয় ; মন তৃপ্তি পায় না। জলের চেহারাটা বেশ সজল নয়। প্রচুর মাটি। কারণও স্পষ্ট। এসব নদীর জল পাহাড় চোঁয়া নয়, বরফ চোঁয়া তো নয়ই। হাজার হাজার মাইল স্যাভানা পেরিয়ে বন বাদাড় পার করে কেবল মাটি ধুতে ধুতেই আসছে। ফলে সারা গায়ানার মাটি স্যাঁতসেঁতে। কাদা। এমনকি টিউবওয়েলও বসানো যায় না। আর্টিজেন ওয়েল আছে। আখের ক্ষেত মাত্রেই জল নিকাশীর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। পান্টস্ অর্থাৎ চ্যেপ্টা-তলা বিশাল বিশাল লোহার পাতের নৌকো চলে সে সব নিকাষী খালে। আখ বোঝাই হয়ে আসে। আগে টানতো খচ্চর, এখন ট্রাক্টারে টানে, যেমন গুণটানা নৌকো চলে। এই কাদার জন্যই জঙ্গল যেমন তরতরিয়ে গড়ে ওঠে, পথ তৈরী করা তেমনই দুরূহ। কেবল বসে যায়। গায়ানার পথ-ঘাট ত্রিনিদাদের তুলনায় একশো বছর পিছিয়ে আছে। এবং একশো বছর ধরে একই ভাবে আছে। এই নরম মাটি এবং জলের জন্যই গায়ানায় চালের চাষ অতি সমৃদ্ধ। এককালে গায়ানা ছিলো চিনি সাম্রাজ্য, কেবল বিলিতি কোম্পানীর একচেটিয়া। এখন গায়ানা চাল সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের প্রতি দানা ভারতীয়। বর্ধিষ্ণু এবং ক্ষমতাপন্ন "গায়ানা রাইস্ মার্কেটিং বোর্ড"। এককালে বোর্ড ছিলো ভারতীয় চাষীদের। এখন সোস্যালিস্ট সরকারের বোর্ড গেছে সরকারের তত্বাবধানে। মেম্বররা নিগ্রোই বেশী। তারা চাষ করে না। চালে এবং চিনিতে এখন জবর কম্পিটিশান। চালের টিকি গায়ানার ধরা। চিনির টিকি ইংলণ্ডের শেয়ার হোল্ডারদের ধরা ছিলো। সম্প্রতি ন্যাশনালাইজড।

চাল চিনির লড়াই রাজনৈতিক, অর্থনৈনিক—দিশী ভারতীয় এবং বিদেশী ইংরেজদের মধ্যে আপোষে অর্থনৈতিক লড়াই। চালই শ্রমিককে স্বাধীনতা দান করে চিনি কল থেকে সরাচ্ছে। ফলে, চিনির কলে শ্রমিক সমস্যা বাড়ছে। অ-ভারতীয়েরা মাঠে কাজ করতে চায় না। সাম্প্রতিককালে ডক্টর ছেদী জগনের সোস্যালিস্ট সরকার ব্লাক-ব্রুশ-পোল্ডার স্কীম করে একুশ হাজার একর জমি আবাদ করেছেন। অন্য স্কীমও তাঁরই কীর্তি ;— তাপাকুমা স্কীম। তাতে আবাদী ৩৬,০০০ একর। ফসল চাল। অন্য লড়াইটি

আরও গভীর, ব্যাপক, সর্বনাশা। চাল-চিনি অর্থাৎ ভারতীয় চাষীর বিরুদ্ধে বকসাইট এবং সরকার অর্থাৎ নিগ্রো চাকুরের সংগ্রাম।

গায়ানার রাজনীতি অবধারিত ভাবে সোস্যালিস্ট পথে চলছিলো। গায়ানার অবিসম্বাদী নেতা ছেদী জগন। আমেরিকান রাজনীতিতে সোস্যালিজম মানেই কম্যুনিজম। তাই জগনকে বদলে অন্য কারুকে বসানো দরকার। আমেরিকান গোলার্ধে ম্যাকারথিজম্‌ ছাড়া অন্য কিছু চলবে না। এ জন্য পর্তুগীজ ধনকুবের শিল্পপতি ডী-গারকে এগিয়ে দেওয়া হলো রাজনীতিতে। কিন্তু তাতে ফল শুভ হলো না। তখন চোখা বাচস্পতি এবং চোখাতর অহং-বাদী বার্নাম 'সাহেবকে' তুলে ধরা হলো নিগ্রো নেতা হিসেবে। কনজারভেটিভ্‌ ইংরেজ এবং কেনেডী শাসিত আমেরিকা উভয়ে মিলে নিগ্রো-ভারতীয় সংগ্রামকে জাতীয়তাবাদ থেকে অনেক দূরে এনে ফেললো। রেস-রায়টের বর্ণবিদ্বেষ রাজনীতিকে কলুষিত করে দিলো। জননেতাকে কারচুপি করে সরানো হলো। বেইমানীকে সাজিয়ে আইন বলে ধরা হলো। এখন ছেদী জগনের কর্তৃত্ব গেছে। নিগ্রো বীর বার্নাম ডি-গারের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। শাসনের ভার পেলেন। অবশ্য এ এক হয়ে থাকা দা এবং কুমড়োর এক হয়ে থাকা। কাজও শেষ হলো, ডি-গারকেও বিদায় নিতে হলো।

এ নাটকের প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে শকুনি ভারতীয় ব্যবসায়ী মহল। প্রত্যক্ষে ভারতীয়; শাদা জুলুমই অপ্রত্যক্ষে। সেই ভারতীয় অশুভবুদ্ধির ফলে ভারতের বাইরে যে ভারতীয় সোস্যালিস্ট জন জাগরণ সম্ভব হয়েছিলো সেটি নষ্ট হলো। আমেরিকায় যে সোস্যালিজম মানেই 'কমি'—কম্যুনিজম্‌! সফেদ বাণিজ্যের মুনাফাকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪-তে গায়ানায় যে গৃহবিবাদ রচিত ও অভিনীত হলো, তারই আগুনে পুড়ে গেল সোস্যালিস্ট সরকার। পুড়ে গেলো; মরেনি। চরিত্রবল এবং স্বাভাবিক উদারতার জন্য আজও জগন গায়ানার অবিসম্বাদী নেতা। পার্লামেন্টে জগন পার্টি ডি-পি-পি-র সদস্য সংখ্যা ২৪, বার্নামের ২২ এবং ডি-গারের ৪। আশ্চর্য সোস্যালিস্ট বার্নাম রাইটিস্ট ডি-গারের সঙ্গে সমঝোতা করে কোয়ালিশন রাজত্ব কায়েম করলো। যদিও সারা দেশের জনমত চায় সোস্যালিজম্‌। এ ধরনের রাজনৈতিক সুলুক সন্ধান, ফিকির, যথাকালে আবিষ্কার করার বুদ্ধি ধরে বলেই ইংরেজ, ইংরেজ। ধুরন্ধর বণিকজাত।

বণিকজাত না হলে এতখানি বোদা অসভ্য আচরণ অন্য ধর্মে মানায় না। গায়ানায় ভারতীয় জনসংখ্যাই ৫৪%; এ ছাড়া চীনা এবং পর্তুগীজরা কেউই নিগ্রো-তন্বী চায় না। আফ্রিকার টালমাটাল, ঘরের পাশে দ্বীপে দ্বীপে কালো মেঘের আড়ম্বরিত গর্জনের নির্জলতা। এ সব দেখে, এবং নিগ্রোর 'বর্তমান' বাদী মননতার ফল জানা থাকায় বিদেশীরাও সন্দিগ্ধ। তবু জগন চালিত মতবাদকে আমেরিকী পৃথিবীতে স্থান দেওয়ার বিপদ অনুমান করে নব আবিষ্কার হলো "পী—আর"। লণ্ডনে স্বাধীনতার সমঝোতাতে জগনের "হ্যাঁ" অত্যাবশ্যক। জগন জানতেন "পী—আর" অর্থাৎ প্রপোরশন্যাল

রিপ্রেজেনটেশন—অর্থাৎ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দেশের শান্তি এবং ব্যবস্থার চরম হন্তারক। ঘোর আপত্তিও করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা আটকে যায়। দেশদ্রোহিতা হয়। তিনি তাই ইংরেজ সরকারকে বললেন—ডেমক্রাসীর চূড়ান্ত পূজারী তোমরা। মনুষ্যত্ব এবং ইতিহাসের দোহাই দিয়ে তোমাদেরই বিচারক করলুম। আমার পার্টি তোমাদের সকল বাধা সত্ত্বেও গত ষোল বছর ধরে ন্যায্যত বারবার আমাকেই এগিয়ে দিয়েছে। সেই আমি তোমাদের হাতে মুখ্য দলের নামে বিচারের ভার দিলাম। ডানকান্ স্যান্ডস্, চার্চিলের জামাই এবং ডগলাস হোমস্ তখন ডলারে তম্বীতে জুজু। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন জাঞ্জীবারে, এডেনে, সাউদী আরাবিয়ায় সর্বত্র যে রাজনৈতিক দুশ্চরিত্রতা চলেছে ব্রিটিশ গায়ানায়ও তাই হবে। সেদিন ডাক্তার জগন বিশ্বাস করেছিলেন ডেমক্রাসীকে। পারেনি ব্রিটিশ কূটনীতি সেই বিশ্বাসের সম্মান রাখতে। ৫৪%-এর বেশী ভোট পেয়েও জগনকে "আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব"-র (Proportional Representation—P. R.) কবলে মার খেতে হলো। সারা গায়ানায় আজ ডলার আধিপত্য। গায়ানায় এখন অ-গায়ানিক ব্যবসার প্রসার। জর্জটাউনে যে ইমারতের গায়ে লেখা গায়ানা ব্যাঙ্ক, তার মধ্যে রং বদলে বাস করছে চেজ মানহাটান ব্যাঙ্ক; প্যান-আমেরিকান হাওয়াই কোম্পানী; ইণ্টার নাশেন্যাল ওয়্যারলেশ এবং টেলিগ্রাফ কোম্পানী। খুঁজেই পাওয়া যায় না গায়ানা ব্যাঙ্ককে। প্রত্যেকে মিনিস্ট্রি, এমন কি গায়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েও, আমেরিকান পীস্ কোরের সদস্য ভর্তি;—ওভারসীস ভলেণ্টীয়ার্‌ সার্ভিসের বিশেষ বিশেষ সেবকরা সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। গায়ানার পথে পথে লুঠ, রাহাজানি, গুণ্ডামী, ছিনতাই চলছে অবাধে। কেউ কিছু বলে না। সাহস নেই। বুকে ভয় ঢুকেছে। গায়ানা অধীনতা মুক্ত হয়ে অধীনতরতায় ভুগছে। ডাঃ জগন বহুদূরের আকাশে চেয়ে অসীম সাহসে এবং ধৈর্যে ভর করে এই অসম বিষম লড়াই করে চলেছেন। তাঁর সাধের গায়ানা হতে চলেছে চিলি, হেইতি, সান্দোমিঙ্গো, ত্রিনিদাদ, হণ্ডুরাস, গুয়েটামালা!

ব্রিটেশ গায়ানা, বী-জী; ঠাট্টা করে বলতো বুকার্স গায়ানা। এখন বুকার্স কোম্পানী জাতীয়করণের ফাঁপরে পড়ে ধুঁকছে। ধুঁকছে দেশের অর্থ-জীবনও! চিনি চাল আমরা দশগুণ দামে কিনলেও চাষী না পাচ্ছে দাম, না বাজার। ইম্পীরিয়ল সুগার সিণ্ডিকেটের মারফত ব্যবসা এখনও চালু। ফলে গায়ানার দুর্দশা ভয়াবহ। বিদেশী মুদ্রা ঠন্ ঠন্। আলু-দাল অবধি পাওয়া যায় না। বেবাক ইম্পোর্ট বন্ধ। যখন আমি ছিলাম ১৯৫৭-১৯৬১ তখন চিনি-চালের দৌলতে বুকার্স গায়ানা রমরম করতো। হঠাৎ যখন থেকে মিঃ বার্নাম প্রধানমন্ত্রী হয়ে চীনের দিকে হেললেন, জগন রুশের দিকে, তখন এই কাণ্ড। ঠাণ্ডা লড়াই চলছে।

যদি ব্রিটিশ গায়ানা নামক ইংলণ্ড-সম-কলেবর ভূমিভাগকে এক ঝলকে দেখতে হয়, প্লেন থেকে দেখা যায়, এবং চেনা যায়। কেবল জলা, কেবল বন। ওরিনোকোর মোহানা, ডেমেরারার মোহানা, বিস্তীর্ণ মোহানা। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, বৃহত্তম এবং ভীষণতম পয়ঃ-প্রণালী-প্রকীর্ণ জলা। ওরিনোকোর জলের রং এবং স্বাদ সমুদ্রের

জলের রং এবং স্বাদকে বদলে দিয়েছে। গায়ানার চারপাশের সমুদ্র ঘোলাটে জল। গায়ানাবাসীরা অনেকেই ভাবে সমুদ্রকে নীল বলা হয় আদর করে। ওটা পোশাকী ভাষা। চিত্রে নীল রং দেওয়া হয় চিত্রকে বর্ণাঢ্য করতে। আসল সমুদ্র বস্তুত ঘোলা-ই। নীল সমুদ্র তারা দেখেনি।

বন দেখলে সুন্দর বন মনে পড়ে। রয়্যাল বেঙ্গল নেই; পুমা আছে, জাগুয়ার আছে। কুমীর তো আছেই; জল-সাপ, জল-অজগর, কুখ্যাত আনাকোণ্ডা আছে, আছে বিশালাকায় কচ্ছপ, কাপিবারা, পিকেরী, পিপীলিকাভুক। আছে বহু শুশুক, ডলফিন এবং মাণ্টিস্। আছে ড্রাগনস্-মাউথ জুড়ে হাঙর ক্ষেতে মুক্তোর ফসল।

বন দেখলে মনে হয় সেকালের বম্বেটেদের দল, পিজারো, রালে, বেরিয়া, মর্গ্যান। কী অসাধ্য সাধনই তারা করেছে। এই কাদা, জলা, সাপ, ময়াল, ম্যানগ্রোভ ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর সব কিছুর দাপটকে তুচ্ছ করে সেই সব দামালরা এই ভূখণ্ড অধিকার করেছে। সাম্প্রতিক একখানা বইয়ে এক পণ্ডিতম্মন্য ভারতীয় আর্তনাদ করেছেন যে ভারতের রক্তে যাবৎ য়োরোপীয় আর্যরক্ত সংক্রামিত পুনশ্চ না হবে তাবৎ প্রাচীন ভারতের পশুভূত অবনতি নাকি ঘুচবে না; ভারতীয় উৎক্রমণ স্তব্ধ থাকবে। প্লেন থেকে আশ্চর্যভাবে ভয়াবহ এই বন দেখার পরেই যে সব নাম আশ্চর্যতরভাবে মনে জাগে সে সব নামও তো শাদাই! তারা তবে এদেশে এসে যোদো মোদো হয়ে গেলো কেন? কেন এলো পুওর হোয়াইটস্এ বীজে তেজ থেকে ঢের তেজী এই কর্কটের সূর্য। এই ট্রপিক্স্।

এই বনে বসতি। যে কোনো জায়গায় হঠাৎ বসতি। মনে পড়ে বসতির কারণ চিনি। বহু তিক্ত, বহু বিষাক্ত চিনি। দাসত্ব, আলস্য, বর্বরতা, সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদ, বিনাশ্রমে অনায়াস প্রাচুর্য, মদিরা, খুন, যৌন-ব্যভিচার, অত্যাচারের জননী এই চিনি। যে কোনো জায়গায় খানিকটা বন চিরে আঁচড়ে সাফ করে আখ পুঁতে দিলেই চিনি। কালো চামড়া, লোহার কড়া, জঙ্গলের কাঠ কাটা আগুন, কাদা-মাটির ঘর ব্যস্, দিনান্তে আটা, ময়দা, নুন, আর কিছু নোনা মাছ, এই হলেই যা বার হয় তার নাম চিনি। কোন্ আফ্রিকায়, চীনে, ভারতে, কোন্ গ্রাম জ্বলে গেলো, কোন্ সংসার পুড়ে গেলো, কোন্ সতী পতি হারালো, কোন্ মা ছেলে, এ ভাববার সময় নেই। "সিড্ল্ প্যাসেজ" ভর্তি কেবল যাতায়াত করছে, 'স্লেভার' জাহাজ, যার পুঁতিগন্ধে যে কোনো বন্দর অসুস্থ হয়ে পড়তো। চিনি বিস্বাদ; চিনি কালো; চিনি বিষাক্ত; চিনি তেতো। ছেদী জগনের হাঁকপাড়া বই "বিটার সুগার"।

গ্যাঙ্গ-ওয়ে থেকেই লোকদের ভীড় এবং হাতছানি প্রত্যক্ষ করছি। জানি ওরা কেউ আমাকে চেনে না। আমার পরনে সম্পূর্ণ পশ্চিমী পোশাক, মাথায় হ্যাট সুদ্ধ। গায়ানা-ত্রিনিদাদ ক্যারাভালে বহু ভারতীয়ই যাতায়াত করে। ঐ যা-তা-'কাট্' কোট-প্যাণ্ট। টেরেলিনের শার্টের উপর ঝুলন্ত 'নটে'র টাই। অব্যর্থ একটা ফেল্ট হ্যাট। এ পোশাক ক্যারাবিয়ানী ভারতীয়ের অনিবার্য। যে স্বাতন্ত্র্য সেই অপেক্ষমান জনতার

আশা করছিলো, সে স্বাতন্ত্র অবলুপ্ত। আমার চরিত্রহীন পোশাকে আমাকে 'আমি' বলেই ওরা ধারণা করতে পারেনি।

ছোট্ট ঘুপসী সেই এ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ এরোড্রোম গায়ানায় সিভিল-রায়ট্‌সের যুগে পুড়ে গেছে। এখন আছে 'তুমাহারী' এরোড্রোম।

আমেরিকান সৃজনী-সিক্ত। বিশালতা। ডলার-দানবের 'এক রাতের' সৃষ্টি! তেমন সৃষ্টি বিশাল টাওয়ার হোটেল, আমেরিকান কাৎলাদের মেদ পাৎলা করার হারেম কাম্‌ রোমান বাথ্‌ল।

কিন্তু তারই মধ্যে গলাবন্ধ ভারত-সরকারী কোট এবং ঐ বাবদেই প্যান্ট পরিহিত যুবকটি এসে নমস্কার করে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ভট্টাচার্য মহাশয়, আমি মহাতম্‌ সিং।"

মনে পড়লো ডক্টর রাজকুমার মহাতম্‌ সিংয়ের নাম করেছিলেন বটে। গায়ানার ভারত-কৃষ্টি অফিসার। কাশীতে বিয়ে করেছে। মৌনাথ ভংজনের ছেলে। হিন্দীতে এম. এ. পাশ করেছে। উগ্র হিন্দীপন্থী। "হিন্দী-হিন্দু-হিন্দুস্তান" ধ্বজাধারী গান্ধী টুপী ঢাকা ব্যক্তিত্ব (এখন সে টুপী পরিত্যক্ত)। মহাতম্‌ সিং সুরিনামের স্থায়ী বাসিন্দা। ভারতীয় খানার রেস্টুরাণ্টে মন দিয়েছে।

মালা পেলুম। পরিচয় পেলুম বিদ্যালয়ের অগ্রণীদের। সবই ভারতীয় মুখ।

এ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ থেকে জর্জটাউন পঁচিশ মাইল পথের বেশির ভাগটাই আমেরিকান বেশ-এর মধ্যে পড়ে। সে পর্যন্ত পথ কংক্রীটের এবং সুন্দর। আজও গায়ানায় মোটর রেস হয় এ্যাট্‌কিন্‌সন্‌ বেস-এ। এই সঙ্গে মনে পড়ছে ত্রিনিদাদের মোটর রেসও হয় আমেরিকান-পরিত্যক্ত ওয়ালার ফীল্ড বেস-এ। হোক উঞ্ছবৃত্তি; কিন্তু আমেরিকান 'ধাক' বজায় না রাখলে মেকী ইজ্জৎ থাকে না।

পথের উপরে জর্জ টাউনের কাছাকাছি বিরাট চিনি-কল 'ডায়মণ্ড'। বুকার্স কোম্পানীর ব্যাপার। ওদের আরও দুটো চিনি কল আছে। 'রোজহল' এবং স্প্রিং-লাণ্ডস্‌। রোজহলের কাছাকাছি পোর্ট মারানক্‌ চিনিকল এখন নেই। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ দশ বছর ধরে ক্রমাগত ডক্টর ছেদী জগনের নেতৃত্বে চিনির কলগুলোতে বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ। অতিরিক্ত হয়ে কর্তৃপক্ষ জগনের জন্মভূমি পোর্ট মারাণ্টের চিনিকল বন্ধ করে দেয়। ক্রিকেটার কালীচরণ, কানাহাই পোর্ট মারাণ্টের ছেলে।

পোর্ট মারাণ্টে ছেদী জগনের মা এখনও তেমনি ক্ষেতে বেগুন শসা আর্জান। হাটবারে হাটে বেচেন। জগন হাসতে হাসতে আমাকে একদিন বলেছিলেন—আমার মা যেন বসুন্ধরা। দিন বদলেও বদলান না। এখনও যখন মার কাছে এসে থাকি—বিষ্যুৎবার রাত্রে সব্জীপাতি ধুয়ে মুছে থোক থোক গোছাতে হয়। সকালে মা যদি হুকুম করেন ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে চল্‌, হাটে যেতেই হয়। মায়ের অবাধ্য হই না বলবো না; সেটা সত্যি নয়। বলবো এমনই আমার মার ব্যক্তিত্ব যে অবাধ্য হওয়া যায় না। কি বলেন, যায় কি? বলেই শক্ত মোটা ভ্রূতে ঢাকা চোখে-হাসি-হাসি চেয়ে থাকেন

আমেরিকান স্ত্রী জ্যানেটের দিকে। জ্যানেট উগ্র কম্যুনিস্ট। জগন উগ্র সোস্যালিস্ট। জ্যানেট ইনটারন্যাশনালিস্ট, কুবা এবং চীনের দোসরা। ছেদী জগন পুরো ন্যাশনালিস্ট না হলেও রুশ, ভিয়েতনাম, যুগোশ্লোভিয়াপন্থী।

জ্যানেট জবাব দেন—হয়তো যায়, কিন্তু তারপর মায়ের বাড়িতে থাকা যায় না, এবং সেই আদরটি খোয়াতে হয়। মিস্টার ভট্টাচারিয়া, আমার শাশুড়ীকে আপনি দেখেননি ; —তাঁর স্নেহ এবং যত্ন কোনো মানুষই সহজে হারাতে রাজী নয়।

তাই বোধহয় জগন সোস্যালিস্ট হয়েও বিনয়ী ; বিদ্রোহী হয়েও সদালাপী।

ডক্টর জগন হেসে বলেন—আমার মা আসলী হিন্দুস্তানী এবং গোঁড়া হিন্দু।

জ্যানেট বলেন—ঐ যদি হিন্দু হয় আমরা সবাই হিন্দু। কম্যুনিস্ট মাত্রে হিন্দু। পোর্ট মারাণ্টে জগনের রাজত্ব। সে রাজত্বের ভিত মা। গোটা পোর্ট মারাণ্ট মায়ের কথায় ওঠে বসে। গোর্কীর সেই 'মাদার'।

আমি বলেছিলাম—হিন্দুত্বা 'ধর্ম' নয়, যে অর্থে 'মঠ'-পন্থীরা ধার্মিক। 'ধর্ম' কথার মানেই হলো জীবন-ধারার শুভ-কে সংরক্ষণ করার বৃত্তি। হিন্দুত্বা জীবন-ধর্মের গতি নিয়ামক। জীবন ধারার পথ।

হাসেন জ্যানেট। এ অর্থ করে আপনি গায়ানায় হিন্দু বলে পরিচিত হতে পারবেন না।

পারিনি।

ভারি কষ্ট গেছে সে-সব দিন।

তা যাক। স্বামী বিবেকানন্দের চেয়ে বেশী কষ্ট নয় তা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর কিংবা শিবনাথ শাস্ত্রীর বেদনার কাছে কিছু নয় তা। রাজা রামমোহনের কথা মনে হলেই মনে হয়, এহ বাহ্য আগে কহ আর।

ডেমেরারা একটা নদীর নাম। তার দুধারে বহু চিনি কল। এসিক্যুইবো নদীর পাড়ে চিনির কল। ছোটোখাটো অনেক কল। গায়ানায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন না হলে অর্থনীতি ব্যবসা-বাণিজ্য টলমল। গায়ানায় প্রাইভেট আখ-চাষী কম। প্রাইভেট চাষ সবই চাল, নারকেল—কিছু কিছু কোকো, কাজু, ফল। সে সব পামেরুন নদীর ধারে। করেণ্টিন এবং লাগুয়ান, এসিক্যুইবো এবং ডেমেরারা চালের জায়গা, অর্থাৎ ভারতীয়দের জায়গা। ভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। নিগ্রো প্রায় দু লক্ষ। অন্যান্য মিলিয়ে এক লক্ষ। তার মধ্যে আমেরিণ্ডিয়ান প্রায় সতেরো হাজার।

অথচ, এই আমেরিণ্ডিয়ানরাই ছিলো গায়ানার আসল মালিক। আরাওয়াক্ অথবা 'বাক্'—এই জাতির নাম। মঙ্গোলয়েড। নানা উপজাতিতে বিভক্ত। 'গায়ানা' জঙ্গল ; গায়ানা কাদা-দেশ ; গায়ানায় তেমন সম্পদ-শ্রী নেই। তবু বোধহয় এলিজাবেথীয় যুগ থেকে এ তল্লাটের যতো দেশের নামডাক, তার মধ্যে গায়ানার মতো বহুখ্যাত, বহু কথিত দেশ আর নেই।

কারণ রালে, এবং তার এল ডোরাডোর স্বপ্ন। সোনার স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন যখন সফল হলো না গায়ানা পড়ে রইলো। তর্দেসীলাস্-এর সন্ধি অনুযায়ী স্পানিশ এবং পর্তুগীজরা আপোষে ভাগ করেছিলো দক্ষিণ আমেরিকা। গায়ানা পড়ে গেলো সীমান্তে। এবং সীমান্তে হাঙ্গামা হুজ্জৎ লেগেই থাকতো। অথচ দেশটা তখনকার দিনে এমন কিছু লক্ষ্মীমন্ত মনে হয়নি যে সেই হাঙ্গামা হুজ্জৎ পোয়ানো যায়। গায়ানা পড়ে ছিলো। তখন চোখে পড়লো ডাচ্‌দের।

ডাচেরাই মালিক ছিলো। তারা সমুদ্রে বাঁধ বেঁধে জঙ্গল কেটে বসতি করার পর ইংরেজরা হালুম করে পড়লো। ফরাসীরা যোগ দিলো। গায়ানা তিনভাগে ভাগ হয়ে গেলো। এখন বি-জী—ব্রিটিশ গায়ানা স্বাধীন দেশ, নাম গুয়ানা; ডাচ গায়ানা রিপাব্লিক, নাম সুরিনাম; ফরাসী গায়ানা, ফ্রান্সের কলোনী এবং নিকৃষ্টতম কলোনী। এ ছাড়াও গায়ানা আছে। সেটা ভেনেজুয়েলার অন্তর্গত।

আদিবাসী কারীব এবং আরাওয়াক। আজ এরা জঙ্গলের নিবিড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। 'সভ্য'-দের প্রতি বিজাতীয় অবিশ্বাস। হবে না কেন? ডাচদের সময়ে ধরে ধরে বেচে দিতো ওরা। আরাওয়াক বেচে দিতো যবদ্বীপে, বোর্নিওতে। বোর্নিও, যবদ্বীপের বাসিন্দাদের বেচেছে ডাচ গায়ানায়। তারপর যতো পেরেছে মেরেছে। এরও পরে য়োরোপীয় রোগ এনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে সভ্য দুনিয়ায়। এখন গুয়ানায় আরাওয়াক সতেরো হাজার। প্রায় সকলেই খ্রিস্টায়িত! ক্যাথলিকরা এ নিয়ে ভারী গর্ব করে।

চিনির কল ডায়মণ্ড। তারপরেই পথের ধারে ডেমেরারা 'রাম' ফ্যাক্টরি; মিস্টার ডী-গার এর ব্যাঙ্কস্-ব্রুয়ারী বলে এ পথটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা। নোংরার অবধি নেই।

ঢুকলাম শহরে।

এনে তুললো ভিক্টোরিয়া হোটেলে।

প্রথমেই গন্ধ।

জিনিসপত্র আসার আগেই বাথরুমে গেলাম। নোংরা গন্ধ।

বিহ্বল হয়ে জানলা ধরে চেয়ে দেখি কোথায় এলাম। তিন বছর একা থাকতে হবে। নীচে যতদূর যা দেখছি সব কাঠের একতলা দোতলা বাড়ি। মায় সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত। সবই টিনে ছাওয়া। যার কোর্ট-হাউস তাও ওই রাঙ্গা টিন ছাওয়া। যেন সিমলা-দার্জিলিং। মাঝে মাঝে বিলিতি কোম্পানীর পাকা বাড়ি যে নেই তা নয়। সমস্ত ওয়াটার স্ট্রীটটা দেখা যাচ্ছে। ভীড় নেই। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ৮৩০০০ বর্গ মাইলের দেশের এবং প্রায় সাত লক্ষ লোকের চাহিদা মেটাবার এক মাত্র হারবার-শহর এই ওয়াটার স্ট্রীট।

ওপর থেকে মনে হচ্ছে তাসের ঘরবাড়ি। অত্যন্ত অস্পষ্ট শহর। সাময়িক।

তা সাময়িক। গত একশো বছরে কুড়িবার আগুন লেগেছে এ বাজারে। যুদ্ধের আগে ভীষণ আগুন। সারা বাজার ভাগ্যক্রমে পুড়ে যায়। তখন পত্তন করে নতুন

করে শহর গড়ার ফলেও তব্ দ্-চারখানা পাকা এবং বাকী সব স্দৃশ্য দোকান হয়েছে। তারই মধ্যে লোহার-দানবের মতো শেয়ালদার বাজারের চেয়েও কুৎসিত একটা লোহার জবরজঙ্গ খাঁচা—নাম স্ট্যাব্রুক মার্কেট। ঘড়ি লাগানো আছে ; চলে না।

ও হোটেলে থাকা কবুল করলাম না। আমার কর্তৃপক্ষ এনে ফেললেন পার্ক হোটেলে।

পার্ক হোটেল চমৎকার হোটেল। মেন্ স্ট্রীটের দ্ পাশে পথ ; মাঝখানে হাঁটা পথ। আগাগোড়া কৃষ্ণচূড়ায় ঢাকা। শহরের শ্রী এবার দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে জর্জ টাউনকে ক্যারাবিয়ানের 'রানী' কেন বলা হয়। ওপরতলা থেকে দেখা যায় শহরের আসল রূপ। বাগানগুলোয় বড় বড় গাছ। তার মাঝে মাঝে কাঠের বাড়ি হলেও নানা সাজ, নানা ভঙ্গী, নানা রং—'অন্য' দেশ বলেই মনে হয়। ভাগ্যিস ইংরেজদের আগেই ডাচেরা এ শহরের ভিত এবং আগ্-মাটি করে রেখে গিয়েছিলো। নৈলেই ব্রিটিশিয়ানা এ শহরকেও 'সিভিল-লাইন্স' করে ছাড়তো। জর্জ টাউন শহরটা সমুদ্রের 'তলা'য়। তাই শহরময় খাল। খালের দ্ ধারে পথ। খালগুলো মেশে 'সী-ওয়াল্'-এ। সেখান থেকে পাম্প করে জল বার করা হয়। শ্লুইস গেট আছে।

মনে পড়ে বাগবাজার খাল। সেখানেও দ্ধারে পথ। এখানে সেটা রমণীয় ; সেখানে সেটা—থাক্। স্বদেশ। বলা উচিত নয়।

ফটোগ্রাফাররা এলেন। রিপোর্টারেরাও। জর্জ টাউনের কাগজ 'ক্রনিক্ল্' এবং 'আর্গোসী'। প্রথমটা শাসন বিভাগীয়, দ্বিতীয়টা ব্যবসাদারী। সত্যিকার জাতীয় কাগজ নেই। পার্টি কাগজ 'মিরর' প্রগ্রেসিভ পার্টির। ডঃ জগনের। 'নেশন' তারই প্রতিবাক্য, বার্ন্হামের। সম্প্রতি আর্গোসী সরকারী চাপে পড়ে উঠে গেছে। 'ক্রনিক্ল্' সরকার কিনে নিয়েছে। ফল একই। স্বাধীন কাগজ নেই।

যেখানেই ইংরেজ গেছে, পৌত্তলিকতাও গেছে। সেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি, পায়রা এবং নোংরার সমাহার ; সেই একখানা করে কুইন্স্ কলেজ ; একটি মুজিয়াম ; একটি হাসপাতাল ; এবং ছুটির তালিকায় করোনেশন ডে, কুইনস বার্থ ডে। অব্যর্থ। অব্যর্থ পপি-ডে। অব্যর্থ ছোটা হাজরি, বড়া হাজরি, হুইস্কি। অব্যর্থ চীনা ক্লাব, ভারতীয় ক্লাব, পর্তুগীজ ক্লাব ; সিটি ক্লাব ;—এবনী ক্লাব। আলাদা, আলাদা, আলাদা।

এই কুইন্স্ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার এস্ডি-র কাছে গেছিলাম শিক্ষক সংগ্রহের আশায়। তিনি সাগ্রহে কলেজের অর্বাচীনতম কীর্তি দেখাচ্ছেন। কলেজের নব নির্মিত থিয়েটার হল।

আমি গোমরা মুখে চুপ করে আছি দেখে বললেন, কেমন দেখছেন ?

আমি বলি, বলতে চাই। বলবো কি-না ভাবছি।

"বলুন, বলুন !—সাজেশন দিন !"

"তাই যদি তবে সাহস করে আগুন লাগিয়ে দিন এতে। জ্বলে ভস্ম হয়ে যাক !"

"কেন বলুন তো ?" মিঃ এস্ডীর চোখে মুখেই তখন আগুন।

"চলুন অফিসে বসি। বলছি। বলতে দিলেন, ধন্যবাদ।...কিং এস্‌ডী, প্রিন্সেস মার্গারেট গায়ানায় আসছেন। জর্জ টাউনে তাঁর সমারোহের যোগ্য, বিশেষ বল-ড্যান্সের যোগ্য কোনো বৃহৎ হল নেই। টাউন কাউন্সিল, ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, মিনিস্ট্রি অব ট্রেড এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি, হোম মিনিস্ট্রি—কোথাও টাকা ছিলো না। কাগজে এ নিয়ে কতো আলোচনা আজও চলছে। ধীরে ধীরে সবার অজ্ঞাতে শিক্ষা বিভাগের টাকায় কুইন্‌স্‌ কলেজের মতো কলেজে, যেখানে ছাত্র সংখ্যা আটশো-ও নয়, সেখানে তিন হাজার লোক নাচার মতো হলের এই সময়ে প্রয়োজনীয়তাটাকে কি আপনি দাস্য এবং চৌর্য বলেন না? আপনি শিক্ষাবিদ্‌, গুরু। তিন লক্ষ ডলারে তিনটে কলেজ হতো। করেণ্টিনে, এসিক্যুইবোতে—একটা কলেজ নেই। এ সময়ে প্রিন্সেস্‌ মার্গারেটের নাচ বাবদ এ টাকা শিক্ষা বিভাগ থেকে টেনে এনে খরচ করার কলঙ্ক কি প্রিন্সেসকে একটুও স্পর্শ করবে না?"

একটি কথা তখন। "আপনি রেভল্যুশনারি।"

"পৃথিবীও; জগৎ সংসার। সূর্যদেবও। ও কথা তো নিন্দার্হ নয়! সত্যি যদি বলে থাকেন স্তুতিই। আপনিও স্থিতিশীল কি? জড়? পিণ্ড?"

আমি হাসি।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন তখন, "আপনার বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক বাছা দায়। নিশ্চয়ই আপনি আফ্রিকান শিক্ষক চান না।"

"না!"

"বুঝেই ছিলাম। আপনি চান ভারতীয়।"

"তাও না!"

"তাও না! কিন্তু স্পানিয়ার্ড বা চীনা তো করেণ্টিনে গিয়ে থাকতে চাইবে না।"

"চাইলেও আমি নেবো না।"

"আপনার কথা বুঝছি না মিস্টার বাটাচারিয়া!"

"বোঝার কথা সত্যিই নয়। আমি চাই গায়ানীজ! না আফ্রিকান, না ইণ্ডিয়ান, না পর্তুগীজ, না চীনা। এটা গায়ানা। এখানে এদের ভাগ করে রেখে বদান্যতা করা, ভাগাভাগি থাকার শিক্ষা সঞ্চার বড়ই নোংরা ব্যাপার মিস্টার প্রিন্সিপ্যাল।...মিছেই দেশটাকে ছয় জাতির দেশ বলে গান গেয়ে ভুলিয়ে রেখেছি। ভারতের কবিরাও এমনি ভুলিয়ে রেখেছিলো ভারতকে—ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না, সুজলাং সুফলাং চিরকল্যাণময়ী তুমিই মা ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন। মিথ্যে, মিথ্যে। রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভ্‌সের মতো মিথ্যে। ফাঁকা প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌।"

"আপনি প্যাট্রিয়টিজমে বিশ্বাস করেন না?"

"আমি ফরাসী বিদ্রোহে বিশ্বাস করি; নেপোলিয়নে করি না। দেমক্রাসীতে বিশ্বাস করি, ডলারক্রাসীতে করি না। আমি সোশ্যালিজমে বিশ্বাস করি, হিটলারে করি না। আমি বিশ্বাস করি সাম্য; মানবপ্রেম। তার কাছে দেশপ্রেম, খেলা—আগুন নিয়ে খেলা। য়োরোপ দেড়শ' খানেক বছর ধরে খেলছে।"

হাসে এস্‌ডী। আমার ওপর তাঁর আশা তিরোহিত। "দুঃখিত। আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না।"

"তারও চেয়ে দুঃখ করোণ্টনকে সাহায্য করতে পেলেন না। মিস্টার এস্‌ডী আপনার নিয়োগ এখানে গবর্নর করেছেন কলোনিয়াল অফিসের সুপারিশে। আপনি সাউথ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষী বিদ্যালয় গড়েছেন। এখান থেকে আপনাকে এখন মাদাগাস্কারে যেতে হবে।...কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এই ক্ষয়িষ্ণু (ডেকেদাণ্ট্‌) কলোনিয়ালিজম্‌-কে আঁকড়ে ধরে না থেকে সত্যিই কি য়োরোপের বাইরে য়োরোপীয়নরা য়োরোপের বহু-বিচিত্র উদার মনকে প্রসারিত করে দিতে পারে না ?"

ঘড়ির দিক চেয়ে মিস্টার এস্‌ডী বলেন, "আমার মিটিং আছে একটা। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

গায়ানা পাব্লিক লাইব্রেরিতে এমনি একবার আলোচনা হয়েছিলো গায়ানীজ কবি মার্টিন কার্টারের সঙ্গে। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন 'কালচার'-এর ওপর।

ঘটা করে 'শ্রীমতী' লেখেন এবং ঘনঘটা করে সিঁদুর লাগান এক ধরনের ললনা। ও দুটোর আবডালে তাঁদের অনেক কিছু ঢাকা দেওয়া দরকার হয়। কেতাবে যারা দীন, খেতাবে তাঁদের লোভ; বামুন বলে পরিচয়ে যার যতো সন্দেহ পৈতেটায় তাঁর ততো প্রীতি। ক্যারাবিয়ান সমাজে এখন হা-কৃষ্টি, জো-কৃষ্টি একটা আর্ত-ধ্বনি। কৃষ্টি তো কচুপোড়া। কালচারের মধ্যে সত্যি কালচার এগ্রিকালচার। খানায় কৃষ্টি 'চোখা' অর্থাৎ বেগুনপোড়া এবং কুমড়ো সেদ্দর মতো ঘ্যাঁট এবং 'রোটি', কিংবা শুকনো মাছ এবং 'ব্রেড'। পোশাকে বিজেতাদের পোশাকের বাতিল সংস্করণ। ভাষায়, বিজেতাদের ভাষার গাড়ল ভাষ্য। ধর্মে, বিজেতাদের শেখানো কপচানো তত্ত্বকথার গোবর। গিলটি-কালচার এবং বহুরূপী নক্‌সাই এখানে কালচার।

এবং সেটা এখন এরা বোঝে। বদলাতে চায়। 'নিজের' কিছু একটা চায়। ভিদিয়া নাইপলের মতো শিল্পীও 'নিজের' সত্তার অবলোপে তাঁর সৃষ্টিকর্মকে ভরিয়েছেন নিছক অনাস্থা দিয়ে।

জন ক্যারু, ব্রেথওয়েট, মিটেলহোলৎজর, মার্টিন কার্টার, অর্থার সীমুর গায়ানা সাহিত্যে প্রখ্যাত নাম। কিন্তু এখনও এরা গায়ানার বর্ণ-সঙ্কুল, মন্থর জীবনের শিয়রে কোনও একটা দীপ্তসীমন্ত প্রত্যক্ষ করতে পারছেন না। গায়ানার মন এখনও অধ্যাত্মকে পায়নি। জাহাজ এখনও দিক খুঁজছেন।

বক্তৃতার মধ্যে তাই প্রাণ ছিলো না। ধ্বনি অনেক, শব্দ অনেক; মনীষাও দীপ্ত। শুধু প্রাণের জৌলসটুকুরই অভাব। বক্তৃতান্তে প্রশ্ন করার অবকাশ দেওয়া হলো। জিজ্ঞাসা করলুম, "যাকে কালচার বলা হয় তার মধ্যে সত্যের স্পর্শ কী করে খুঁজে পাওয়া যায় ? কতোটা মিথ্যার সাঙ্কর্য কালচার সহ্য করে ? কালচারের মেকীত্ব ধরা পড়ে কিসে ?"...

কথাটা পরিষ্কার করার জন্য বলি—জাপানে মুক্তো কালচার করা হয়। পারস্য-

উপসাগরে করা হয় না। জর্মনীর ফ্যাক্টরিতে চমৎকার মুক্তো জন্মায়। যে বাজারে কেউ কখনও খাঁটি মুক্তোর ব্যবহার করেনি, জানে না—তার কাছে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য কোথায়? থেকে লাভ কি? সত্যকে পাবার রুচি তার হবে কেন?—মহার্ঘতাই যদি একটি কারণ হয়, তা হলে অর্থের অপচয়কে কৃষ্টির ধারক বলা সঙ্গত হবে কি?

সে মিটিংয়ে তারপর যে আলোচনা চলেছিলো তাতে গায়ানার দুজন, সুরিনামের একজন মিনিস্টার, ভেনেজুয়েলার শিক্ষা সচিব, কবি আর্থার সেমুর, নিজে জ্যানেট জগন—সবাই যোগ দিলেন।

কৃষ্টি নিয়ে ভারী উৎসাহ শুধু গায়ানাতেই নয়, সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জায়মান সচেতনতায়।

আজ মনে হয়, এ দেশে যৌনি-চিন্তা, উদর-চিন্তা এবং অর্থ-চিন্তা করার পর অবসর বিনোদনের জন্য ধর্ম-চিন্তার স্থান হলেও হতে পারে কিন্তু মুখ্যত ধর্মত্ব এখানে কৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হিসেবে, উপকরণ-উপচার হিসেবে ধরে রাখা হয়। শিশুর যেমন নেংটি, চুষী, তেমনি যাবৎ কিশোর-কিশোরী বাপ-মায়ের অনুগত তাবৎ তারা ধর্মস্থানে যাওয়াকে ফ্যাশন বলে মনে করে। এবং পুনশ্চ যখন দ্বিতীয় শিশুতার বয়স আসে, তখন পিতৃপুরুষের ধর্মকথা শুনতে চায়। মনে হয় সেটা অতীত রোমন্থন বিলাস; অস্তমান জীবনের অবশ্যম্ভাবী উপাদান।

জর্জ টাউনের পশুশালা খুবই সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। নয়। ব্রাজিল এবং গায়ানা জুড়ে যে বিশাল আমাজোনীয় অরণ্য তার জীব-জন্তু-পুষ্প-শ্যামলতা আজও অজ্ঞাত। বিচিত্র এই অরণ্যের দেহ। বিচিত্র বিচিত্র মানুষ ভরা এক গভীর অন্তর।

পরে যখন যখন অবকাশ পেয়েছি আমি নৌকোয়, মোটর বোটে, ষ্টীমারে, জীপে, প্লেনে, পদব্রজে তো বটেই গায়ানার ভীষণ অরণ্যবনের জঠরে ঢুকে গেছি। পামেরুণে, এসিক্যুইবোতে, পোটারোয়, মাহাইকোনীতে, মাজারুণীতে, ইতাং নদীর ধারে চলে গেছি। আরাওয়াক, আকাওয়াইও, মাকুশী, কারীব, ওয়াপিসিয়ানা—ইত্যাদি আদিবাসী ষোলো থেকে বিশ-ত্রিশ হাজার থাকে এরই মধ্যে। জঙ্গল কেটে পুড়িয়ে ক্ষেত-খামার করে; শোর-মুর্গী পোষে; মাছ ধরে। ক্ষেত যখন কিছুদিন আবার জঙ্গলের আওতায় পড়ে যায়, সরে গিয়ে অনত্র জঙ্গল কাটে। বসত বাঁধে। অন্তহীন এই চক্রমণ। মাঝে মাঝে ওরা আসে ওদের শালতি-ডুঙ্গা বেয়ে। নিঃশব্দে আদিবাসিক জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ শিকারের সময়েও যেমন, বন্য পশুর শত্রু-উপজাতির হাত থেকে বাঁচার জন্যও তেমন, নিঃশব্দতা উপজাতি জীবনের বর্ম-বিশেষ।

ওরা শহরে এসে বলাতা, কাজু, চামড়া হ্যামক বেচে। তখন কেনে কাপড়, নুন, তেল—এবং অন্যান্য মনোহরণ সামগ্রী। শহরে শহরে জাহাজঘাটা, খেয়াঘাটার ধারে উপজাতিদের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত ধর্মশালা আছে। দু-চার দিন থাকতে পারে ওরা।

মেয়েরা বড়ই লাস্যময়ী। মাঝে মাঝে কলেক্টর, পুলিস অফিসার যারা অনেকদিন বড় মহালে থাকে, ফিরে আসে আমেরিণ্ডিয়ান-উপজাতি বিবাহ করে। তাদের জীবনধারা নিয়ে জন্-ক্যারুর এবং মিটেলহোলৎজার কিংখাবী উপন্যাস লিখেছেন।

সেই বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনের একটা আগুন ঝরা পরিচ্ছেদ। 'কান্তার কান্তি' উপন্যাসে তার অনেকটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বিধাতা পুরুষের কাছে যদি এই দুর্মর জীবন বাবদ কোনো ঋণ সবিনয়ে এবং মুগ্ধ অন্তরে স্বীকার করি তার অনেকখানি জুড়ে থাকবে আমার গায়ানার কান্তারে বাস।

সেই অপূর্ব ভয়ঙ্কর রূপের দহনজ্বালা থেকে ধরে এনে যাদের খাঁচা-স্থ করা হয়েছে জর্জটাউন পশুশালায় তারা যেন অঙ্গার। পিপীলিকাভুক আছে, তার ক্ষিপ্রগতি নেই, তেজ নেই। দুর্গন্ধ। ক্যাপিবারার বৈশিষ্ট্যই দলের মধ্যে। হরিণ দেখতে হলে এক পাল হরিণ ছুটে যাচ্ছে এই দৃশ্যটাই চমৎকার। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরতর করে ওপারে চলে যায়। আগে-পিছে বড়ো বড়ো শিংওলা দলপতিরা মোতায়েন থাকে। পুমাকে দেখতে হয় উঁচু গ্রীন হার্ট-এর ডালে ওৎ পেতে বসে আছে ঘন পাতায় গা মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়ে। জলের মধ্যে কাদায় গা ঢেকে পচা ডালের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে অপেক্ষা করছে আনাকোণ্ডা, ময়াল, অজগর। হঠাৎ ভীরু পিকেরীর চলন দেখে চাইলে অজগরের দিকে চোখ পড়ে। সেই অজগর কেমন করে পিকেরীর গায়ে ফাঁস জড়ায়, চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়। দেখতে হয় বুনো তিতিরের ঝাঁক; জলার শরবনে সারসের নিবিষ্ট দল, হ্রদের তালাশ দেওয়া হাঁসের পাখার আকাশ-সাঁতার। প্রথম যদি পশুশালায় আসতাম, কেমন লাগতো জানি না। জর্জটাউন পশুশালায় এসেছিলাম দু'বারই বন-মহল ঘুরে আসার পর।

পশুশালার বাইরে রাস্তাটা মনোরম। আদ্যিকালের শামৎ-গাছে ঢাকা পথ। দিনেও যেন অন্ধকার। তার গায়ে গায়ে জটা, ছাঁৎলা, দাড়ি গজানো বুড়োর পাহারা যেন। এ দিকটায় যেমন ঘন গাছের আস্তানা, তেমনি গায়ানায় আছে ৮০০০ বর্গমাইল বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সর্বকালের পর্যটকের আতঙ্ক সাভানা। সাহারা যদি বারিহীনতায় হিংস্র, রুকুনুনী সাভানা, ব্রাজিল সীমান্তের সাভানা তার চেয়েও হিংস্র তার জলময়তায়। এতো হিংস্র যে এ তল্লাটে সীমান্ত-সামলানোর কোনো সরকারী প্রয়োজনীয়তাই নেই। এ জলার ওপরে আট থেকে দশ ইঞ্চি জল। পায়ের তলায় সিমেন্টের মতো কাদা। এক জায়গায় দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পা ভেতরে টেনে নেয়, যেন শুষে নেয়। তৎক্ষণাৎ পা-কে টেনে বার করে আনতে হয়। ফলে অন্য পায়ে যে জোর লাগে তাতে সে পা ডুবে যায় আরও গভীরে। এমনি প্রতি পদক্ষেপ হয়ে ওঠে মরণ-সঙ্কুল। মাথার ওপরে বিষুব-সূর্য। খাড়া তার অমিত তেজ। জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। জল যেন ফুটে ভাপ ছড়াচ্ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে। কিন্তু ও জল পানীয় নয়। পান করলে অবধারিত মৃত্যু। কোনো পশু-পাখি এ তল্লাটে থাকে না। ঘাস, ঘাস আর ঘাস। তলোয়ারের মতো খাড়া, ক্ষুরের ধারের মতো মসৃণ, লোহার তারের মতো শক্ত। তার পাশে লাগলে

ট্রিলের ট্রাউজার, রাবার গাম জ্যুতোও কেটে যাবে। তার মাথায় পা রেখে পা ফেললে তবু একটু দাঁড়াবার ঠাঁই মিলতে পারে।

এই সাভানায় আধ ঘণ্টার মতো পথ হারিয়েছিলাম একদিন দুপুরে। সঙ্গে কেবল আমার চার বছরের কন্যা। সে দিনটি আমি কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। পা টেনে নিচ্ছে জলা-কাদা। মেয়েকে কাঁধে নিয়েছি। জোঁকে ধরেছে। দিশা নাই। মাথার ওপর মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড কৃপা, তলায় জলের মরুভূমি, কান্তার। কোথা থেকে এক আদিবাসী এসে বাঁচায়।

কিন্তু জর্জ টাউনের পথে রাতে বেড়াতে বেড়াতে দিল্লীর কার্জন রোড মনে না পড়ে যায় না। এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে, স্বপন হয়ে এসো চলার পথ। এখানে আরও আছে পূব সাগরের হাওয়া, উত্তর সাগরের নীলমিষ্টতা। আরও আছে ছোটো ছোটো ছবি-বাড়ির জালিদার খড়খড়ি দিয়ে ঝরে পড়া আলো। গেঝো-ব্যাঙের ডাক, বড়ো বড়ো জোনাকীর চমক।

সকালে মেন স্ট্রীট ঝলমল করছে। ভাবতাম জ্যাকারাণ্ডার মতো গাছ হয় না, অমন ফুলের সাজ আর পরে কে? ভাবতাম চৈত্রে দিল্লীর রীজে পলাশের বন যেমন রাঙা ভালোবাসা দিয়ে আদর করে এমন বুঝি কোথাও নেই। কিন্তু দেখিনি তখন এতো বিশাল, বিস্তীর্ণ, এমন দীর্ঘপথ আচ্ছন্ন করে রাখা কৃষ্ণচূড়ার চমৎকার। ফ্ল্যাস-বোয়াণ্ট নামটিতেই যে চপলতার, মিথ্যার আভাস—কৃষ্ণচূড়া নামটিতে তা নেই। রাধারাণীর নয়ন কমলের আদরে ঝলোমলো কৃষ্ণের মাথায় এ চূড়ার আভাস বৈষ্ণব কবির পরমরমণীয় এক সৃষ্টি।...তবে এ-ও ঠিক, এরা সকলে, সব সব সব,—তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলো যখন আমি ত্রিনিদাদের নর্দান রেঞ্জের গায়ে খাড়া খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা পোঙ্গ গাছের হলুদ শোভায় মন দিয়েছিলুম। হায় পোঙ্গ, তুমি কি কেবলি পোঙ্গ?

পথে পথে একটা ভাষা শুনি। পার্লারে, কফি হাউসে, ভাষাটা বেজায় বাজে। অত্যন্ত স্বরবর্ণ বহুল। কাদা-কাদা-ভাষা। ওরা বলে টাকি-টাকি (talkie-talkie), আসলে ক্রিওলিজ্। অর্থাৎ সেকালে, আকবুরী জমানায় উর্দুর জন্ম যে ভাবে হয়েছিলো। খলিফা রাঁধুনীর হাতে পড়ে সেই উর্দুই হয়ে গেলো পাকা সাহিত্যিক ভাষা; অরাঁধুনীর হাতে পড়ে স্পানিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরিজী, হিন্দী, মাকুশী, আশাণ্টি মিলে মিশে প্রথমে হলো বোম্বেটের-ভাষা, এখন তার নাম 'পাতোয়া'—ক্রিয়লিজ-ভাষা। অক্সফোর্ড ডিকসনারী বলছে 'ক্রিওল' অর্থে "descendants of European or negro settlers in West Indies." কথাটার জন্ম স্পানিশ যে শব্দ থেকে তার অর্থ domestically bred; ট্যাঁশ গোরু গোরু নয়, সেই বিত্তান্ত আর কি! European or negro একটা অতিশোয়াক্তি। ওটা European and negro! ভাষার একটি সেণ্টেন্স তুলে দিই!

মান্! আ-ক্যুমা-সিতিম্ বা,—মন্নে বেত্তা দান্না-কা-কাওয়ে। অর্থাৎ?

ইংরেজীতে ম্যান্, আই কম বাই স্টীমার, মোর বেটার দোন রেলওয়ে। করেণ্টিন শহর থেকে বহুদূরে গ্রাম্য তল্লাট। সেখানে বাজারে হাটে এই ভাষা। আমি যদি শুনি আমার গৃহস্বামিনী পুত্রকে বলছেন—

"কোম্-না-বেটা, আবি গো, টেনা আপ হোয়া বী হাভ্। দেব্বা আল্ কম্ না কাম হু গো বেট বেট। মী হাভ গো রামনারেস শিস্টা বেডিং না। লে বি কাম এন ফিনিস্ না"—শুনে চেপে যাবে।

মাথা ঠিক রেখে এ ভাষার তরজমা করা দায়; পরে বুঝতাম। মানেটা করতে গেলে কথাটাকে সাজাতে হবে এইভাবে—কম্ না বেটা! লেট্ আস্ গো এণ্ড টেক্ ('না'—এটা হিন্দীর অভ্যাস থেকে আসা কথার মাত্রা) হোয়াট উই হ্যাভ ফর আস্। অল অব দেম মে কম্; মে নট, দোজ্ হু ওয়ানট্ টু ওয়েট, মে ওয়েট! আই হ্যাভ্ টু গো টু দি ওয়েডিং অব দি সিস্টার অব রাম নরেশ (না!)। লেট আস গো, এন্ড্ ফিনিস্ আওয়ার (মীল্) (না!)।

বোট্যানিক গার্ডেনস এবং পশুশালা পাশাপাশি। চমৎকার সাজানো। মস্ত এক কৃত্রিম জলাশয়ের মধ্যে আজব জানোয়ার 'জলগরু'—'ম্যানাতী'! আমাদের "বাংলায় 'মেনু' মানে পেয় দুধেলা স্তন। 'ম্যানু—মানে স্তন, আরাওয়াক ভাষায়। 'ম্যানা' মানে 'সুধা'। 'ম্যানাতী'—মানে জলের গরু। কদাকার পশু। পায়ের বদলে মস্তোবড়ো মস্তোবড়ো পাখনা। জলের মধ্যে ডুবে থাকে। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস নিতে ওঠে। ওদের স্তন এবং দুধের জন্য, বিশেষ ওদের মেয়েলী কণ্ঠস্বরের জন্য ওদের প্রচলিত নাম।

কিটী থেকে কুইন্স্ কলেজ পর্যন্ত আগাগোড়াই 'সী-ওয়াল' শহরকে সমুদ্র থেকে আলাদা করে রেখেছে। সীওয়ালে বিকেলে বেড়াতে আসা একটা কায়দা। পুলিসকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এখানে মদনপীড়িত ব্যক্তিরা সহসা এমন সব কাণ্ড বাধান যে বর্তমানের চতুরিকা মালবিকারাও বিভ্রাটে পড়ে যেতে বাধ্য হন।

জর্জ টাউন থেকে পূবে রোজিগনল পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে ম্যাকান্ধীর বকসাইট খনি পর্যন্ত এককালে ছিলো রেললাইন। আজ সুন্দর পথ হয়েছে ডলার সাহায্যে। ফলে এখন ব্রাজিল, ভেনেজুয়েলার সঙ্গে গায়ানার সরাসরি যোগাযোগ আমেরিকা পাকা করে ফেললো বলে। এই রেলপথের এক ইতিহাস আছে। এঞ্জিনীয়র ফ্রেডেরিক ক্যাথারউড আরবের ওপর পুঁথি লিখে যশস্বী হয়েছেন। ওস্তাদ লোক। রেললাইন গড়ার মজদুর মেলে না। মিললেও ভাগে। চমৎকার বুদ্ধি ফাঁদিলেন।—লাইনের ধারে ধারে বেশ্যালয় এবং মদ্যশালা খুলে দিলেন। অন্যান্য দ্বীপ থেকে শ্রমিক আনালেন। ব্যস্—খ্রীস্টান শ্বেতাঙ্গ কাম ফতে করে গেলেন। যখন মেক্সিকোর মায়া-সভ্যতা সম্বন্ধে পৃথিবী প্রায় অন্ধকারেই ছিলো তখন ঐ ক্যাথারউডের মেক্সিকো ভ্রমণবৃত্তান্ত যেন একটা নবদিগন্ত মেলে ধরেছিলো। অর্থের অনটনে অবশ্য সেই ক্যাথারউড কোম্পানী ফেল হয়; কিন্তু প্রথম পাঁচ মাইল রেলপথ খোলার উৎসবের দিনে লণ্ডনের স্যাকরা দিয়ে গড়িয়ে আনা হয়েছিলো রুপোর শাবল এবং রুপোর ময়লা ঠেলা হাত-গাড়ি।

সেই ট্রেনে চললাম। কোথায় সিক্সটি-ফোর গ্রাম! কিছুই জানি না। পরে জেনেছিলাম জরীপ বিভাগ করেণ্টিন নদীর তীর জরীপ করে প্রতি ৫০০ গজের একটা করে নম্বর দেয়। প্রতি ৫০০ গজের পর পশ্চিম-পূবে টানা একটা করে খাল। ভেতরে কেবল সাভানা আর জঙ্গল। গ্রামের লোকেরা বলে ব্যাক-বুশ্। এক এক পাঁচশোয় ভাগ করে প্রত্যেককে দেওয়া হয় বাড়ি করার মতো এক 'লট' জমি। এমনি চার 'লট'-এ এক একর। সমুদ্রের ধারে সী-লট। তারপর সড়ক। তারপর ইন লট্। ইন লট্-এ কখনও কখনও দুই বা তিন বাড়ির সার। নৈলে তার পেছনে জমি। যতো যাও জমি, জমি। পুরো গায়ানা পার হয়ে গেলেও চার পাঁচশো মাইল অনাবাদী জমি। যে যতো পারো নাও। চাষ করো। আমি সেই মাহাইকোনী থেকে রোজিগনল, ন্যু এ্যাম্স্টার্ডাম থেকে স্প্রীং ল্যান্ডস সর্বত্র দেখেছি এই জমির দৌলতে ফেঁপে গায়ানার ভারতীয় চাষী সম্প্রদায় এখন বর্ধিষ্ণু। প্রত্যেকের ট্রাক্টর ; প্রায় গ্রামেই দুটি তিনটি 'কম্বাইন্' আছে। হারভেস্টর কম্বাইন। ধান কাটছে, ছাঁটছে, ব্যাগে বোঝাই করছে, সেলাই করছে এবং মাঠেই ঝেড়ে যাচ্ছে। ট্রাক এসে সব নিয়ে যাছে।

গায়ানার চাষ মানে আখ। আখই সম্রাট। সেখানে চাল কেন? চাল কেউ লাগালে নষ্ট করে ফেলা হতো। চাল আর মাছ হলে 'কুলী' কাজ করা ছেড়ে দেবে। কিন্তু ১৯১৪-১৮-র যুদ্ধে খাদ্যে টান ধরার ফলে চাল চড়লো হাঁড়ীতে। ১৯৩৭-এর যুদ্ধে তখন চার্চিল জে'র সাবাসী দিলেন চালকে। ভারতীয়রা ধান চাষ এমন ফাঁপিয়ে তুললো যে আজ আখের তখ্ত্ বাটোয়ারা করতে চায় চাল। সতরাং আজ চাল নিধন যজ্ঞই গায়ানার রাজনীতি। ভারতীয় দাঁতকে খাট্টা করতে গেলে চাল-মাৎ করা চাই। গায়ানার বর্তমান সরকার চালের আড়ৎদারী করতে নারাজ। ধান বেচতে চান আমেরিকাকে। অথচ চাল-মিলের মালিকরা ভারতীয়। তারা মাথায় হাত দিয়েছেন। শুনছে কে?...গায়ানায় অভারতীয়েরা নিগ্রো দুনিয়া রচনায় ব্যস্ত। ভারতীয়েরা ভাবছিলো বিশ্ব-ধর্মাধিকরণ বোধ করি একটা গোটা কৃষ্টিকে এমন করে পিষে মেরে ফেলতে চাইবে না। তাদের সে বিশ্বাস শিথিল হয়ে আছে। ভারত সরকার এতো নন্এলাইন্ড যে লাইনের পাশে ভাই মরছে দেখলেও লাইন পেরুবেন না। ট্যাঁ-ও করেন না আন্তর্জাতিক পরিষদে। অথচ শহর বাদ দিলেই গায়ানাময় ভারতীয় আর ভারতীয়। ধর্মে, খাদ্যে, স্মৃতিতে, মননে ভারতীয়। বিবাহে, গানে, স্বপ্নে, দীক্ষায় ভারতীয়। ভারতের নির্বীর্যতায় আজ তারা অপমানিত, ব্যথিত। তাদের চোখে ভারতীয়তার অপদার্থতা দিন দিন প্রস্ফুট।

এক এক সময়ে আমায় ভাবতে হয়েছে যে আন্তর্জাতীয় সাপের ল্যাজে পা না দিয়েও তো তারা ঢোঁড়ার মাতব্বরী সেই নবদ্বীপে মায়াপুর থেকে বৃন্দাবন, গোয়া, পুনা, বারাণসীতে খোল কত্তাল থেকে গাঁজার চিল্‌হম পর্যন্ত আশ্রয় করেছে। সারা ভারতের ইহ পরকালকে ঝরঝরে করে দিচ্ছে। অথচ এই হরিনামের মালা নিয়েই আমরা কেন বিদেশনীতি নামক ভাদর বৌয়ের চৌকাঠ না মাড়িয়েও সাগরপারের ভারত কৃষ্টির অঙ্গনে

গিয়ে একটু ভারত কীর্তনই করতে পারি না ? এ আমাদের কী আত্মবিস্মৃতি ? কী উপেক্ষা ?

কিন্তু ডেমেরারা নদী এবং বারবীস নদীর ভেতরের অববাহিকা সবটাই ভারতীয়দের বাস নয়। যেখানে শহর, সেখানে নিগ্রো। হাতে-গতরে খেটে কাঁচা পয়সা সপ্তাহান্তে চায়, মদের ভাঁটি, জুয়ার আড্ডায় শনি রবিবারে সব উড়িয়ে দেয়। সোমবার সকালে পুনশ্চ,—"বস, কাজ আছে ?"

রাজনীতিতে এই সমাজ এবং কালা-বাদামী বিভাগ গায়ানাকে (তথা সুরিনাম এবং ত্রিনিদাদকে) নষ্ট করেছে, করছে। একটু কিছু হলেই শহরে উপদ্রব। শহরের উপদ্রবের প্রচার মূল্য প্রবল। কলকাতার উপদ্রব যেমন ভারতের উপদ্রব হয় না, নিউ-ইয়র্কে বার্লেম-এর উপদ্রব যেমন সারা স্টেট্‌সের উপদ্রব হয় না—এ তা নয়। জর্জ টাউন মানে গায়ানা, গায়ানা মানে জর্জ টাউন। গায়ানার সংখ্যা লঘিষ্ঠ নিগ্রোরা শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত ইলেকশনে ছেদী জগন শহরের সীটগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করেননি।...যখন সারা গায়ানাই প্রায় শান্ত ছিলো তখন জর্জ টাউন পুড়ছিলো, বকসাইট শহর ম্যাকেন্জীতে প্রকাশ্যে ভারতীয় ধর্ষণ, ভারতীয় নিধন হচ্ছিলো। পৃথিবীময় খবর ছড়ালো 'গায়ানা'য় অরাজকতা। অথচ সে অরাজকতা যে বাইরের পয়সায় বাইরের লোক খাটিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিলো এ কথা আইনত জানাজানি হলেও (পরে C. I. A.-র স্বীকৃতিও প্রকাশিত হয়ে পড়েছিলো) প্রচার করার জন্য কাগজ ছিলো না। গায়ানায় যা হয়েছিলো, হয়েছে, প্রত্যক্ষ করার পর আজ আর আমি খবর পড়ে বিশ্বাস করতে পারি না ঘানায়, কঙ্গোয়, নাইকারাগুয়ায়, ইস্রায়েলে, চিলিতে, ভিয়েতনামে। উপদ্রবের সত্য স্বরূপটা কী। এ দিককার কাগজে দুটো কথা ভারত সম্বন্ধে পড়েছি সাম্প্রতিককালে ; এক—ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারত গোহারণ হেরেছে, এবং ভারতই অপরাধী ; (অন্যথায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তান হেরেছে, এবং ভারতই অপরাধী !) বেশ হয়েছে !! দোসরা—ভারতে এমনি দুর্ভিক্ষ যে উড়িষ্যায় মায়েরা এক টাকায় ছেলে বেচছে।

একটা কথা ভাবি—আমরা কি সংবাদ পরিবেশনেও অহিংস ? মিথ্যাকেও আঘাত করে হত্যা করতে চাই না ? আমাদের বৈদেশিক দূতাবাসের লাইব্রেরী ভরতি কি কেবল রীপ্ ভ্যান্ উইঙ্কল ? আমাদের রাষ্ট্রীয় দূতেদের কি কুম্ভকর্ণ যোগ শিক্ষা দেওয়া হয় ? তাঁদের চর্মকে যোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য কি গণ্ডার তৈল মর্দন করানো হয় ?

ভারতের বাইরের ভারতীয় ঔপনিবেশিকরা বরাবর ভারতকে নিয়ে গর্ব করে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতা দিবসে এ তল্লাটের দু-তিন লক্ষ ভারতীয় একটা 'গগনভেদী' জলসা করেছিলো, হাইওয়ে ভেদী জুলুস বার করেছিলো। এক কাঠ্‌ঠা দশ হাজারের মণ্ডলী-এক ক্রিকেট খেলার বাইরে মাত্র ভারত প্রজাতন্ত্র দিবস মানাবার দিনেই লোক গড়েছিলো। ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল হাজারে, মানকড়, উমড়ীগড়, মার্চেণ্ট, গাভাসকার, বেদী,

ভেংকট, সারদেশাই—এদের খেলা দেখে এখানকার ভারতীয়েরা প্রমত্ত হয়েছিলো। ভারতীয় গানে এদের গর্ব; ভারতীয় পোষাকে এদের গর্ব, ভারতীয় দর্শনে ধর্মে এদের গর্ব, ভারতীয় খাদ্যে এদের গর্ব। ভারতীয় সিনেমায় এদের গর্ব। গর্বই। ঠুনকো নয়, সত্য গর্ব। অথচ পুষে রাখে, চর্চা করে, সে সুযোগ সরকার দেয় না। এরা মুখ তুলে চায় ভারতীয় দূতাবাসে। সেখানে যখন দেখে পশ্চিমী পরিচ্ছদ, ইংরেজী ভাষা, অঢেল মদ্যপান, এবং বিস্তর ভয়সঙ্কুল রাজনীতি—এরা যেন 'নীচে নেমে যায়'—মানে বোধ করে 'লেট্-ডাউন'! আমি পাক্কা ভারতীয়। আমাকে বলতে দেয় না, জানতে দেয় না। তবু বুঝি। এদের বুকের কথা, (মুখের নয়)—'আরে—ঐ ভারতীয় দূতাবাস তো! ওটা একটা কুলী দূতাবাস ছাড়া কিসসু নয়।'

মন রী পোজ, বাক্সটন, মাহাইকা, মাইকোনী পর্যন্ত সবই কালো গাঁ। কালো গাঁ হলেও বহু ভারতীয় চাষ আবাদ করছে। বাক্সটন নামটায় আমি যেন চমকে উঠি।

সঙ্গে ব্যারিস্টার জেফ্রীজ শ্যাঙ্গোর। কলেজের সেক্রেটারি। দ্বিতীয় জন মেথর,—চুনীলাল। আমি শ্যাঙ্গোরকে জিজ্ঞাসা করি, "এই বাক্সটন কি সেই বাক্সটন?"

খানিকটা আমার দিকে চেয়ে চতুর ব্যারিস্টারটি বললেন,—"হ্যাঁ। আপনি জানেন বাক্সটনকে?"

"তার চেয়েও বেশী জানি রেভারেণ্ড স্মিথকে।"

১৮০৮-১৮২৩-১৮৩৩ কতো ঘটনা। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে চার্লস্ জেমস্ ফক্স দাসপ্রথা বিরোধী বিল আনলেন পার্লামেণ্টে। ভেস্তে গেলো। তখন তো পাকাপাকি ভাবেই এ সব তল্লাটে 'দাস' আমদানী করা ছেড়ে দাস 'ব্রীড' করানোর ব্যবস্থা সভ্য-প্রথায় চালু হয়েছে। ভিক্টোরিয়ান যুগের উদারনীতির দেবতা গ্লাডস্টোনের পিতৃদেব এই ব্যবসায়ে বেশ টু-পাইস কামিয়ে ছিলেন। ১৮১২ থেকে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দুগাছা পাক্কা গবর্নর আসেন গায়ানায়—কারমাইকেল এবং মারে। ডাচেদের শাসনে গায়ানায় শিক্ষা-দীক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা তবুও হয়েছিলো—এদের তালিম-মতো সে সব বন্ধ করা হলো। 'পশুদের' বাইবেল পড়ালে সে আর পশু থাকতে চাইবে না। তখন লাঙ্গল-গাধা হবে কে?

এদিকে ১৮২৩ ক্যানিং পুনশ্চ 'দাস' সমস্যা নিয়ে পার্লামেণ্টে ফুচুক-ফাচুক শুরু করেছেন। সেই সুবাদে বাক্সটন সাহেব পাঠালেন ইংরেজ মিশনারী।

নাম তার জন স্মিথ। সদ্য বিবাহিত। স্ত্রীর নাম জেন। তাঁকে দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হলো যে তিনি আধিদৈবিক ব্যাপারের নিয়ামক হওয়া ছাড়া আদিভৌতিক এমন কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও হাত দেবেন না। ইহকাল তাঁর এলাকার বাইরে। পরকালের সমস্যাই তাঁর জিম্মায়।

গবর্নর তখন জন মারে। তাঁর নামে নানা কথা লেখে গায়ানার ঐতিহাসিক। "স্বশরীরে মারে একটি সদর মহালী নীলকর—পিটে এবং পিটিয়েই তাঁর আনন্দ। হিটলারের স্যাঙাৎ হিমলার তাঁর কাছে অপরিণত খেলুড়ে মাত্র। গায়ানার উদারতম

ঐতিহাসিকের চোখে গবর্নর মারে 'একটি অপরূপ জানোয়ার'। তিনি শুনলেন স্মিথ নাকি দাসেদের লেকাপড়া শেখাচ্ছে। সর্বনাশ! চিনি-সামন্তরা গবর্নরকে ভোজ দিলো। বললো তাদের সর্বনাশ হলো বলে। দাস যদি পড়তে শেখে, বাইবেলও পড়বে। তখন আর দাস থাকবে কোথায়? চিনি জ্বাল দেবে কে? গবর্নর মারে বললো, একথা ভারী অন্যায়। বিদ্যাটা পরকালের। অবিদ্যাটা ইহকালের। বকরায় আমার ভাগে যা তাতেই তো আমি আছি। রাগ পড়লো পড়ুয়েদের ঘাড়ে। চার্চের ধারে কাতরানি শুনে জন স্মিথ চেয়ে দেখে একটি নিগ্রোর গায়ের ছাল চামড়া আর নেই। স্মিথ বললো, চামড়া ইহকালের। চিকিৎসা ইহকালের। বৎস ইহকাল যে আমার তত্ত্বাবধানের বাইরে। তবে মদীয়া জায়া যদি···

জেন তখন মরহম পট্টি করেন।

ফল?

পরের রবিবার—প্রাতঃ। জেন এবং জন তাঁদের কক্ষস্থ। সপাং! এক শব্দ। অর্থ একেবারে স্পষ্ট। সপাং। দুই!! জেন বলে, "জন গুনছো!" জন বলে, "জেন গুনো না।"

মন গোনে। সপাং! তিন!···বারো!!···আশী!!!

জেন বলে, "জন জন, একাশী।"

জন বলে, "জেন বড্ড অঙ্ক ভুলিয়ে দেও তুমি; ছিয়াশী!!"

জেন হাত ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদতে থাকে।

জন নীচে নেমে, মেম সাহেবের হাতের চাবুকখানা কেড়ে নিয়ে বলে,—"চার্চের চৌহদ্দির মধ্যে আঘাত করার মানে লোকটাকে কি পুনশ্চ মার্ডার করে দ্বিতীয় ক্রাইস্ট করবে নাকি?"

জনকে সে চার্চ ছাড়তে হলো। ম্যানেজারের মেমের হাতের চাবুক কেড়ে নেয়; এই রাবিশ পাদ্রী কে চায়? চার্চ তবে গড়া কেন?

জনও নাছোড়বান্দা। প্রভু যীশাশের বাণী ওর মাথাটি কুর কুর করে খেয়েছে। অন্যত্র চার্চ গড়লো। নিজে চার্চ থেকে দূরে কানা-পাড়ায় বাসা বাঁধলো।

অতঃপর জনের কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড সবই হলো অপরাধ? সেই সব নিগ্রো ক্ষেপেছিলো। সমগ্র জনপদ বিক্ষুব্ধ হয়েছিলো। কিছু শাদা চামড়া কালো আগুনে ঝলসেছিলো। শাদারা বললেন সে বাবদ নাকি জনই দায়ী; কারণ সে-ই নিগারদের উসকেছিলো। জন হাজতে বন্ধ হলেন। বিচার (!) হবে।

জনের তখন শরীর অসুস্থ। জন যক্ষ্মায় পীড়িত। বিছানা ছাড়তেও পারেনি।

কিন্তু আদালত তা স্বীকার করেনি।

জেন বলেছিলো—পাদ্রীর বিচার তো তোমরা করতে পারো না।

মারে বলেছিলো—পারি না সত্যি কথা। কিন্তু দেখো কেমন পারছি।

জেন গিয়েছিলো গবর্নর মারের বাড়ি। মারে-পত্নীকে বলেছিলো, যক্ষ্মায় মৃতপ্রায় আমার স্বামী। আর কেউ না বুঝুক, তুমিও তো স্ত্রী; বুঝবে। ফিরিয়ে দাও, দেশে চলে যাই।

মারে-পত্নী বলেছিলেন—যক্ষ্মায় যখন মরবেই, তখন শোকেন অলং। এক জন গেলে বহু জন পাবে। এসো একটু পান করা যাক।

জেন বলেছিলো, "স্যাৎসেঁতে জেলো ঘরে বিনা আলো বাতাসে মারা যাবে যে ও!"

সেদিন মারে-পত্নী বলেছিলেন, "ভেবো না। এখন আর তাতে ওর বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। ও মারা গেছে।"

এবং পাছে দাসেরা সেই দেহ নিয়ে আবার একটা হাঙ্গামা হুজ্জুৎ করে তাই রেভারেণ্ড জন স্মিথকে লুকিয়ে কবরস্থ করা হয়। কোথায় করা হয় কেউ জানে না। কেবল ক্যাথিড্রালটার নামকরণ করা হয়েছে জন স্মিথ ক্যাথিড্রাল। গায়ানার কালো ইতিহাসে শাদা জন স্মিথ একজন মার্টার।

কিন্তু দাস-বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। ফলে দাসরা যখন মুক্ত হলো ওরা জমি কেনার অধিকার পেলো। সব দাসেরা মিলে এককাট্টা হয়ে জমি কিনে গ্রাম পত্তন করলো 'বাক্সটন'। দাসপ্রথার বিপক্ষে যিনি পার্লামেণ্টে বক্তৃতা করেছিলেন সেই বাক্সটন।

আর মাহাইকা। এখানে মস্ত হাসপাতাল। কুষ্ঠ হাসপাতাল। ত্রিনিদাদের শাকা শাকারি যদি হয় স্বর্গ, মাহাইকা নরক।

কিন্তু মাহাইকায় ঘুমিয়ে আছে যেন সমারসেট মমের একটি ছোটো গল্প। আমি সে গল্পের প্রথম থেকে শেষ জানি। সেটা বলবো। কেবল গল্প নয়। গল্পটার ভেতরে গায়ানা সমাজের একটা গভীর তত্ত্বও ডুবে আছে।

সে জর্মন মহিলাটি ছিলেন আরবী কবি খলিল জিব্রানের ভক্ত।

চিঠিপত্রে আলাপ এগিয়েছিলো।

অতঃপর বিস্মৃতি।

অতঃপর এক চিঠি। জানো, তোমার দেশ ঐ গায়ানায় আমার একমাত্র সন্তানের বিয়ে হয়েছে? অনেকদিন। জানাইনি তোমাকে। সম্প্রতি আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমার মেয়ের চিঠিপত্র যেন আর স্বাভাবিক নয়। যদি একটু মেয়েটার সঙ্গে দেখা করে আমায় খবর দাও।

কষ্ট হয়নি। মেয়ের স্বামী ডাক্তার। সহজেই ঠিকানা পেলাম। পরিচয় দিতেই ডাক্তারের চেহারা আলাদা। ও সব ব্যাপার মা জানেন। ওপরে যান।

গায়নীজ্ বাড়ি। ভারতীয় পরিবার। জর্মন মহিলার স্বামী দিল্লীর সর্দারজী। মেয়েটির নাম ভারতীয়—ধরা যাক নির্মলা।

মা। কোলে নাতি। নির্মলারই ছেলে। এক ঘণ্টা গল্প করলাম। চলে এলাম। নির্মলার দেখা পেলাম না। নেমে আসছি। সিঁড়ি দিয়ে নামছি। হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় খড়খড়ি খুললো যেন। অন্ধকার। দেখলাম না কিছু। দেখলাম খড়খড়ি খুললো। দুটি খড়খড়ি মাত্র—দুটি পাখী। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম। শুনলাম খড়খড়ির পাখী বন্ধ হলো।

কেন খুললো? কেন বন্ধ হলো?—ওপরে মা। নীচে ডাক্তার। তবে ও কে?

চিঠি লিখলাম উদ্বিগ্ন সেই মাকে। নির্মলাকে দেখে এলাম। বেশ আছে। চমৎকার ছেলে—ইত্যাদি।

মিথ্যে লিখলাম ;—জ্বালা।

খড়খড়ির কথা মনে পড়ে—জ্বালা।

আবার গেলাম একদিন। ডাক্তার নেই। সোজা পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি। মুখোমুখি মা।

রান্নাঘর ভরা একটি মেয়ে। ক্লান্ত চোখ। সব ভুলে গেলাম ;—শুধু দুটি চোখ। আমাকে চেনে সে আমি চিনি না।

সেদিন পরিচয় পেলাম।

পরিচয় পেলাম। কথা বললাম। মাকে লিখবেন ভালো আছি।

তুমি লেখ না কেন ?

ইচ্ছা করে না।

যাবে না ভারতবর্ষে ?

ইচ্ছা করে না।

কী ইচ্ছে করে ?

কিছু না। আসুন না একদিন, খেতে।

শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করবে না ?

তিনিই বলেছেন বলতে।

তা হলে আসবো।

আসবেন ??—ও ! আচ্ছা, তা হলে আসবেন। সেদিন যখন চলে এলাম খড়খড়ির পাখী স্থির।

নিমন্ত্রণ সাড়ে ছটা বিকেলে।

গেছি সাড়ে ছটা বিকেলে।

ডাক্তার বলেন, ও এসে গেছেন। ভালোই হলো। মাহাইকো হাসপাতালে একটা অপারেশন আছে। যেতে হচ্ছে। আমার জন্য অপেক্ষা করবেন না···আর নির্মলা ; —আচ্ছা সে মা বলবেন।

অপেক্ষা নেই। চলে গেলেন।

সস্ত্রীক আমি ওপরে আসতেই, মা !

আসুন, বসুন।

নির্মলা কোথায় ?

ওই তো ওর দোষ। ভারতীয় মানেই ঘৃণা। আমি সাধ্য সাধনা করে নিমন্ত্রণ করতে বলায় নিমন্ত্রণ করলো—কিন্তু হঠাৎ বেলা চারটেতে চলে গেলো সিনেমায়। বসুন—খাবার তৈরী। নির্মলা যেন কী !

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম—ওরা কেউ নেই। খাবার কেবল খাওয়াই হবে। যদি

ক্ষমা করেন, অনুমোদন করেন, শহরে যাই, আমরাও সিনেমা দেখিনি বহুকাল। সিনেমা দেখে বন্ধুর বাড়ি ডিনার খেয়ে যাবো।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি। খড়খড়ির পাখী চোখ চাইলো।

ভেতরে অন্ধকার।

কয়েকদিন পরের ঘটনা—

হঠাৎ রেডিওতে খবর, "কখগ নার্সিংহোমে নির্মলা মারা গেছে।"

কখগ নার্সিংহোম। লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নার্সিংহোম।

অন্য ডাক্তার বন্ধুর বাড়ি গেছি শহরে। কাজে।

কথায় কথায় নির্মলার মৃত্যুর কথা তুললাম।

বলবেন না, বলবেন না। আমাদের দেশের লোক। ডাক্তার তো নয়, গরু। সামান্য একটু হেমারেজ। আর দু মাসে, তাও নয় বড় জোর ছ'সপ্তাহেই দিব্যি বাচ্চা হয়ে যেতো। তা নয় জোর করে আগেভাগে বাচ্চা। নৈলে কোথায় সফরে যাবে ইত্যাদি। বাধা হবে। মশায়—ডাক্তার না হলে বলতাম মেরে ফেলেছে।

ডাক্তার বলে কি সাত খুন মাপ? মারতে পারে না?

অনেকে বলছে বটে। কিন্তু কি জানেন—অনেকে এও বলে যে নির্মলা নাকি ভারতীয় নয়।

ডাক্তার কী বলে?

ডাক্তার তো উগ্র ভারতীয় কিনা। ওরা মা কড়া হিন্দু। ভারতীয় ছাড়া হিন্দু ছাড়া বিয়ে উনি এককেবারে ডিস্‌লাইক্ করেন। অথচ নির্মলার মা নাকি জর্মন।

তাই নাকি?

কিন্তু তাই বলে যে মেরেই ফেলবে তা তো নয়। অতবড় ডাক্তার। এবং বৌকে এতো ভালোবাসতো, কখখনো কোথাও নিজেও যেতো না, বৌকেও নিয়ে যেতো না।

তাই নাকি! তাতে ভালোবাসার কী পরিচয়?

মানে দিনরাত ঐ বৌ নিয়েই পড়ে থাকতো? আপনি কি ওদের জানতেন?

না। এখন জানবো ভাবছি।

পরে সবই জেনেছিলাম।

জানি তো অনেক কিছু। করতে পারি কি?

ডাক্তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এখন কেমন আছে সেই নির্মলা-প্রেম-বিহ্বল ডাক্তারটি।

আর মশায়—চেঞ্জড্, চেঞ্জড্। বদলে গেছে! সেই বুনো ভাবটা আর নেই। ভেবেছিলাম নির্মলার মৃত্যুতে মুষড়ে পড়বে।...মেয়েদের মধ্যে অনেকে ওকে সন্দেহ করে।

কেন, সন্দেহ কি?

সে অনেক কথা। তবে মেয়েদের কথা।

মেয়েদের সে কথা আর কখনও শুনিনি।

ডাক্তার আবার বিয়ে করেছে সম্প্রতি। একেবারে খাঁটি হিন্দু মেয়ে—জোরাইদা মহম্মদ! ডাক্তারের কৈশোরের সাথী!

সারা বারবীস-করেণ্টিন এলাকা ভারতীয় এবং চাষী। বর্ধিষ্ণু চাষী। যে কোনো লোকের শ-দেড়শো থেকে চার-পাঁচশো একর ধান জমি। আবার মোটে জমি নেই এমন চাষীও শত শত।

এই অবস্থাটাই ডক্টর জগন দূর করতে চেয়েছিলেন। ফলে ব্ল্যাক-বুশ-স্কীম।

দেখতে গিয়েছিলাম সেই স্কীম একদিন।

একশ হাজার একর জলা জমির জল নিকাশীর ব্যবস্থা করে, পথঘাট তৈরী করে চাষের জমি, চাষীদের গাঁ, স্কুল, হাসপাতাল, বাজার, চালের কল, মজুত রাখা গোলা—সবই সরকারী ব্যবস্থায় হচ্ছে। এই স্কীমটার পত্তন করার ঠিকাদারী একটা বিলিতি কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত। আমাদের জীপ পার হয়ে যাচ্ছে খালের ধার ধরে। চাষীরা কোথাও কোথাও ধান কাটছে। একটি আদিবাসী ছেলে এগিয়ে এসে বলে, 'দেখবে মজা?' পকেট থেকে বার করে র‍্যাটল্ সাপের লেজ। আঁশের চাকতির পর চাকতি বড় থেকে ক্রমশ ছোটো। র‍্যাট্‌ল-এ মোক্ষম বিষাক্ত সাপ। যেই চলতে থাকে চাকতি-গুলো ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে থাকে। ছেলেটি সাপটাকে মেরে ল্যাজটা কাছে রেখেছে। মজা দেখাবে। আমি হাতে নিই লেজটা। পুরোপুরি স্পন্দন, যেন বৈদ্যুতিক স্পন্দন। গোরা হাতে নিলো। ছেলেটি বললো গত আট ঘণ্টা যাবৎ এটা সমানে নড়ছে এবং দু-তিনদিন ধরে নড়বে। বললো ঘরে থাকলে সাপ আসবে না। পরীক্ষা করিনি, করতে চাইও না।

টাগোর মেমোরিয়াল কলেজ করেণ্টিনের সমুদ্রতটে। সারা গায়ানার মধ্যে এই সমুদ্রতটটিই সেরা। করেণ্টিন নদী এসে সমুদ্রে মিশছে। নদীর চরে সমুদ্রের চরে একটা স্থির মিতালী। ওপার দেখা যায় ধোঁয়া ধোঁয়া। সুরিনাম; ডাচ গায়ানার তীর। একটা আলোকস্তম্ভে আলো জ্বলে নেভে। কত সন্ধ্যায় এই বালুচড়ায় সতরঞ্জি পেতে শুয়ে থেকেছি একা একা। ঐ আলোটা কেটে যেতো আকাশের মুখ, অতলান্তিকের বুক।

আধ মাইল দক্ষিণে স্প্রিং ল্যাণ্ডস্। সেখানে স্টেলিং বাধা। সেখান থেকে প্রবাহ থেকে কলেজের ছাত্রছাত্রী বোঝাই ডিজেল-বোটে চললুম আমেরিণ্ডিয়ান বসতি ওরিয়ালায়। সরকারি স্কুল আছে। মিস্টার শাঙ্কা প্রধান শিক্ষক। আমার পরিচিত। ওরিয়ালা আদিবাসী জগতের প্রথম গাঁ।

বোটটা যাচ্ছে ওরিয়ালা থেকে আরও চার মাইল দক্ষিণে জঙ্গল থেকে কাঠের তক্তা আনতে। সেই তক্তা বোঝাই হয়ে ফিরবে। আমাদের নেবে। ফিরে যাবে। সারা বিকেল এবং পুরো রাতটা আমরা ওরিয়ালায় আমেরিণ্ডিয়ানদের মধ্যে কাটালাম।

বালির পাড়। সাদা করকরে বালি। নদী কেটে নেমে এসেছে। এক পাশটা তাই খাড়া। এলাহাবাদ দুর্গের গা যেন। অন্য ধারে ঘন বনেঢাকা দ্বীপ। বদ্বীপের

পর ব-দ্বীপ। ডাচেদের। সুরিনামের অংশ। বোটের পথ তাই সঙ্কীর্ণ। চালাতে হয় খুব সাবধানে। চড়ায় বোট ফেঁসে গেলে বিপদ। জলে স্নান করতে নেমেছিলো ছেলেরা। এক পাল আমেরিণ্ডিয়ান ছেলে জলে ঝাঁপালো এবং জলকে নেড়ে নেড়ে ক্ষেপিয়ে তুললো যেন। ওরা যে ইচ্ছে করেই এমনটা করছে বুঝতে পেরে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

তখন বুঝলাম গায়ানার জলে 'পীরাই' (পিরহানা) মাছের উপদ্রব। এক কিলো-দেড় কিলো ওজনের কাৎলা মাছের মতো মাছ। হাঙরের মতো দাঁত। ঝাঁক বেঁধে চলে। রক্তের স্বাদে যেন পাগল হয়ে ওঠে। তীরে আসতে আসতে পুরো পাখানা সাবড়ে দিয়েছে এমন হয়; তবে বেশীর ভাগই তীরে পৌঁছুতে পারে না। আঙুলটা আস্ত এক কামড়ে সাফ—এ আকচারই হচ্ছে। 'মনু সংহিতা' বলেন—অজানা জলে নাইতে নামবে না। রাত্রে তো নয়ই।

এই করেণ্টিনে আমি অভিনব চারটি বছর নাগাড়ে কাটিয়েছি। করেণ্টিনের বুক বেয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের মাতাল-মদির বাতাস ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রালসতায় ভরে দিয়েছে চৈতন্যালোককে। করেণ্টিনের বুকের ওপর জেগে উঠেছে আচমকা এক খাবলা কালো মেঘ; দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেলেছে আকাশ; সাগরে নদীতে যেখানে অসংবন্ধ আলিঙ্গনে চিরকালের মিথুন তরঙ্গে ফেনায়িত; ছেয়ে ফেলেছে আকাশ, ছেয়ে ফেলেছে সাগর, নদী, সৈকতময় ভূমিভাগ, যোজন ব্যাপী নারকেল বনের সরল ভঙ্গী; নামিয়ে এনেছে বনের জটা ভূমির বুকে; ছড়িয়ে দিয়েছে ধরার ধুলো আকাশের মুখে; দেখেছি সেই সর্বনাশা ক্যারাবিয়নের ঝড়। অধীর, উন্মত্ত আগ্রহে, নিজেকে বেঁধে রেখে গাছের গুঁড়িতে। যেমন আগ্রহে উন্মত্ত ইউলিসিস বন্ধ পেশীর আর্তনাদকে অগ্রাহ্য করেও শুনেছিলো সাইরেনদের গান। এই করেণ্টিনের বুকে উদয় সূর্যের প্রতিভায় বিস্মৃত মেঘের মালা দুলে দুলে অনন্তে মিশে যেতে দেখেছি; এই করেণ্টিনের বুকে ক্যুমুলাদের প্রাসাদ অলিন্দেভরা শুভ্র-অমরাবতীর প্রাঙ্গণে শ্বেত ঐরাবতের মন্থর দেহের মৃদু আন্দোলন দেখেছি; এই করেণ্টিনের বুকে সন্ধ্যার মেঘমালায় সূর্যের রক্তবসনের আলো ক্ষণে ক্ষণে ঝলসে উঠতে দেখেছি। কাঞ্জী নদীর তীরে বক্তৃতা সেরে গভীর রাতে করেণ্টিনের সৈকতপথে গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ বন্ধুকে বলেছি, "চিনাপেন, ভাই—ওরা গাড়ি চালাক। এসো আমরা এ মাঠটা হেঁটে হেঁটে পার হই। দেখতে দেখতে যাই ঐ সাদার্ন ক্রসের বিষণ্ণ জ্যোতিঃ, ঐ বৃশ্চিক রাশির জ্বলন্ত দৃষ্টি; শুনি এই ছায়াপথের ধারে ধারে নিত্য নব জন্মের অনাহত ধ্বনি। এমন মেঘ, এমন বাতাস, এমন ধানক্ষেত, এমন নারকোল বাগানের বুকচেরা চাঁদের আলো—কোথায় পাবে চিনাপেন? অদৃশ্য দেবতার অপার করুণা তাই পায়ে পায়ে সুন্দরের নিপুণ শিল্প ধরে এনে হাত তুলে দেখান।...

এই করেণ্টিনে মালা পরেছি; এই করেণ্টিনে জ্বালায় পুড়েছি; সম্মান পেয়েছি, অসম্মানে কালো হয়েছি; আনন্দে অধীর হয়েছি; দুঃখে হয়েছি অবসিত। রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করেছি; রবীন্দ্রজীবন বারে বারে শুনিয়েছি; রবীন্দ্রজয়ন্তীতে মেলা

বসিয়েছি ; রবীন্দ্রনাথের নামে সমিতি স্থাপন করেছি। করেণ্টিন আমাকে ভ্রাতা, ভগ্নী, ছাত্র, বন্ধু, শত্রু, পুজো, নিন্দা, স্তুতি—সব দিয়েছে।

আমি কতটুকুই বা দিতে পেরেছি ? খতাই নি।

স্বর্গে বৈশ্য নেই।

করেণ্টিন! এখানে বিয়ে বাড়ি গেছি। বাঁশের মাচান বেঁধে, টিনের ছাদ বসিয়ে মস্ত মেরাপ। তার তলায় ছদিন ব্যাপী এক নয় ভাগবৎ, নয় বেদ, নয় কোরান। সারা দিন পাঠ। সকালে দু-ঘণ্টা, দুপুরে দু-ঘণ্টা, বিকেলে এক ঘণ্টা, রাতে তিন ঘণ্টা। সবাই যোগ দেয়। সেই পাঠে ভুল প্রচুর, অশিক্ষা প্রচুর, ত্রুটি সহস্র সহস্র—কিন্তু যার নাম অধ্যাস, কৃষ্টি, রাক্তিক চক্রমণতা—তারই বদৌলত পেয়েছি কাশীর গঙ্গাঘাট, বৃন্দাবনের দেবদেউল, অযোধ্যার হনুমান বাড়ি, লক্ষ্ণৌ-এর ইমামবাড়ার খোশবয়। এরা হারিয়ে গেছে, ফুরিয়ে যায়নি। হঠাৎ কোনো সন্ধ্যায় ঢোল-কাঁসীর বাজনায় তুলসীদাস শুনে যখন ছুটে গেছি, ফেরবার সময়ে একদলা মোহনভোগ নিয়ে ফিরেছি। এখানে পথের ধারে 'জনবাসা'র (বিদেশীদের পক্ষের থাকবার জায়গা) বরযাত্রীকে কনেপক্ষ এগিয়ে অভিনন্দন জানায় মালা দিয়ে, গান গেয়ে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে পূর্ণ ঘট দিয়ে আরতি করে ; এখানে বরের মাথায় শ্বার পুজোয় চাল ছড়ায় মেয়ের দল, পায়ে ঢেলে দেয় জলের কলসী। বর দাঁড়ায় রঙিন গুঁড়োয় আঁকা আলপনার ওপর। বৌ বসে পিঁড়েয়। হোমের আগুনের চার পাশে সপ্তপদী লাজ হোমের মন্ত্র বেঁচে ওঠে। সে গান অন্য দেশের গান। উচ্চারণ বদলেছে। তবু তো "গৃভ্নামি তে সৌভগত্বায়"-কে চেনা যায়। নবগ্রহ পুজা করে এরা ভাগ্য ফেরাতে চায় ; সূর্য পুজা করে স্বাস্থ্য ফিরে পেতে চায় ; হনুমানের ধ্বজা উড়িয়ে ঘরকে লক্ষ্মীমন্ত করতে চায়। দেওয়ালীতে প্রদীপ জ্বালিয়ে জয় জয় লছমীমাতা গান গায়। রামনবমীতে উপোস করে। শিব-রাত্রিতে রাত জাগে। কৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে গানের আসর করে। এই করেণ্টিনে এক নারীকে বহুবার বিবাহ করতে দেখেছি ; বৈধব্যকে অস্বীকৃত হতে দেখেছি ; হিন্দু-মুস্লিম বিয়ে দেখেছি ; পুরুষকে বহুবার বিবাহিত হতে দেখেছি। দেখিনি বহুবিবাহ, শিশুবিবাহ, জাতিচ্যুতি, পাতিত্য, ছুঁৎমার্গী বিড়ম্বনা। ভাবি এরা কি ভগবানের দরবারে হিন্দু নয় ? বেদের দরবারে ঐতরেয় নয় ?

এই করেণ্টিনে শ্রেষ্ঠ বন্ধুরত্ন পেলুম—আশ্চর্য চিনাপেন—জেম্স ওয়ালটর চিনাপেন, যে বলেছিলো আমার মা আমার নাম দিয়েছিলেন ভিলিয়েন—শুকতারা। সে নাম যেদিন ব্যাপটিজমের জলে ধুয়ে গেলো ভাবিনি কখনও আবার জাগবে মনের আকাশে। তুমি আমাকে ভিলিয়েন বলে ডেকো। চিনাপেন-কে গায়ানায় লোকে 'টাগোর' বলে ডাকতো, জানতো। চিনাপেন গায়ানার "শ্রেষ্ঠ" কবির সরকারী সম্মান পেয়েছিলো। সরকারী পুরস্কার এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের জলপানিতে সে গ্রেট ব্রিটেনে কাব্যের ওপর বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলো। তার কাব্য—"Albion Wilds" কাটায় ঢাকা মিষ্টি সুরের তিক্ত আর্তনাদ। তার রস যেন কেতকীর সুরভি। আজ সে ফুরিয়ে গেছে। গেলেও তার স্বাদ যায়নি।

এই করেণ্টিনে নিগ্রো মণীষা এড্‌গার উইলসনকে পাই। কাজু বাদাম খেতে খেতে যে মাঝ রাতে উঠে আসতো আমার সিঁড়ি বেয়ে। "দেখলুম, আলো জ্বলছে। চলে এলুম।...চমৎকার রাতটা। এমনি রাতে ট্রয়লাস ক্রেসিড্‌কে কী বলেছিলো জানিনে ভাই, এড্‌গার বলছে তোমাকে—সত্যি করে বলো তো কুলকুণ্ডলিনী চক্রের প্রাণশক্তিটা কি ? প্রাণায়াম করতে করতে হঠাৎ এতো আত্মহারা হয়ে যে যাই, এ আনন্দও কি বাধা ? ...শোনো শোনো—তুমি আর কখখনো আমাকে বোলো না ভগবান যীশু হিন্দু ছিলেন না। শুধু হিন্দু নয় বাটাচারিয়া, তিনি ছিলেন জলজ্যান্ত ব্রাহ্মণ।...শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্র ভৈরবের শিষ্য ভগবান—দত্তাত্রেয়।"

এই করেণ্টিনে মাতাল-মাস্টার রামলাল, দুর্দান্ত পুরুষ রঘুবীর, সুন্দর বর (আজও সে বর সেজেই আছে—এতো সজাগ তার সাজ, পোশাক এবং দ্বিতীয় পক্ষের খবরদারি) লুচ, পাগল-দস্যু 'জয় হনুমানজী', সিনিক বৃদ্ধ রিটায়ার্ড হেডমাস্টার 'নোবল্‌', কৃপণ লক্ষপতি বুধরামকে দেখেছি। রামলাল হারিয়ে গেছে। রঘুবীর আজও নাম করে কাঁদে। লুচ সেদিনও চিঠি দিয়েছে "তুমি বলেছিলে চালের কল করতে—করেণ্টিনের শ্রেষ্ঠ কল আমার। দেখতে আসবে না ?" জয় হনুমানজী জেলে। 'নোব্‌ল'—সমাধিস্থ,—মরার আগে অশীতিপরা স্ত্রীকে বলেছিলো 'জোয়ান্‌ যাও, বাটাচারিয়াকে ডাকো। সে কাছে বসলে আমি যেন জীসাসের গলা শুনতে পাই।' কৃপণ বুধরাম ডায়াবিটিসে অন্ধ হয়ে, দুঃখে ক্ষুর দিয়ে নিজের হাতে কণ্ঠনালী কেটে মারা গেছে।

এই করেণ্টিনে চাষী গৃহস্থ জন, মাখনলাল, উধো, ভগত, নিজাম, হারুন—সবাই মিলে বললো—দাদা, তুমি যদি সঙ্গে চলো—কায়চুরে যাবো। যতই বিপদ হোক। যাবো। জঙ্গল ফেঁড়ে, নদী উছলে—যাবো, যাবো।

সে এক অনবদ্য যাত্রা।

মোটামুটি গোটা ব্রিটিশ গায়ানার কোস্ট লাইন ধরে যেতে হবে। ২০০ মাইলের পর স্টীমার ; সারাদিন স্টীমারে। আবার বন মহলের প্রবেশ দ্বারে নামতে হবে। বার্টিকা। সেখান থেকে জঙ্গল দেড়শো মাইল। আবার নদী। আবার নৌকো। দুরন্ত নদী। পথে তিনটে জলপ্রপাত। পার হয়ে দুই পাহাড়ের ভেতরে খাঁড়ি। তারপর খাড়া চড়াই। খাড়া। পাথরের নুড়ি, ঢিবি, বিশাল বিশাল ঢিবি সাজিয়ে যে পথ তা কাশ্মীরের পিস্‌সু ঘাটির চেয়েও ভয়াবহ। তারপর আবার চার মাইল। তারপর কায়চুর জলপ্রপাত, খাড়া ৭৪০ ফুটের ওপর থেকে পড়ছে পোটারো নদী। পৃথিবীর মধ্যে গভীরতম জলপ্রপাত। অতি ভয়ংকর।

এ আশ্চর্য দেখা গায়ানায় শতকরা একজনও দেখেনি। পাঁচশোতে একজন হয়তো স্থল এবং জলপথে গেছে। বেশীর ভাগই জর্জ টাউন থেকে প্লেন নেয় ; ওরিণ্ডুইক নামক ব্রাজিল বর্ডারের বেনোতি গাঁয়ে নামে। একটু-আধটু দেখে ফিরে আসে। ঘণ্টা কয়েকের সফর।

আমাদের লেগেছিলো পেঁছতে চারদিন ; ফিরতে তিনদিন, কি চারদিনই বলা যায়।

কিন্তু সেই আটটি দিন চিরকালের মতো অক্ষয় হয়ে থাকবে, যেমন অক্ষয় হয়ে আছে জুন মাসে ভরা বরফের মধ্যে পহালগাম থেকে অমরনাথ যাবার চারদিন।

আমরা রালে, ড্রেক, ম্যাজিলানও নই ; বীতপাল, নাগার্জুন, অতীশ, চুয়েন্ হোয়াং, ফা হিয়েনও নই, নই মার্কোপোলো কি আল-বারুণী। সামান্য মানুষ আমরা। শুধু দুটি অন্ন খুঁটে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচিয়ে রাখাতেই আমাদের জীবন আড়ষ্ট। তাই মানস সরোবর, কেদার-বদরী, হিংলাজ যাত্রার মধ্যেই আমরা খুঁজি রোমাঞ্চকর মর্যাদা। বিশেষত্বে পরিপুষ্ট অহং-স্তাবকতা। কিন্তু এই কালেও দেখেছি কোন্‌টীকির দুর্ধর্ষ অভিযান ; দেখলুম স্যার ওয়ালটার চিচেস্টার-এর অদ্ভূত কীর্তি—একা একখানা পালের বোট নিয়ে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। দুর্দমকে, দুর্জয়কে, দুরতিগম্য-দুরতিক্রমণীয়কে আয়ত্ত করে তৃপ্তি সুধায় ভরে যাওয়া, একালেও অসম্ভব নয়। তেনজিং নোরগে এ কালীন ছেলে ; ইউরী গাগারীন, ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোবা, গ্রিসম্—এ কালের অমর নাম।

এ সবের কাছে কায়চুর যত্রা এমন কী ! কিছুই না।

তবু কিছু।

ডাঃ জগন বলেছিলেন, থামুন ! হাঙ্গামা আছে। আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হবে।

মিনিস্টব বলবাম সিংরয় বলছিলেন—বলেন কী, সস্ত্রীক এবং বাচ্চাদের নিয়ে ? আপনি মার্ডার কেস-এ পড়তে চান নাকি ?

ব্যারিস্টার সিং বলেছিলেন, মাথা খারাপ নাকি ? এই তো সেদিন প্লেন চার্টার করে ত্রিনিদাদের ভবেশ মহাবাজকে নিয়ে ঘুরে এলুম। দিব্যি মজা। তা নয়—হ্যাটোরো হ্যাটোরো বনে জঙ্গলে যাওয়া। জানেন, পথ নেই। কুড়ুল ঘাড়ে করে যাওয়া। জীপ নইলে অসম্ভব। ও কাজ কখখনো নয়।

এঁরা সবাই গায়ানীজ। নিজের দেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। মজা করতে কেউ আবার ঐ সব ব্যেদড়া বনে যায়, ভাবতেও পারে না। উপরন্তু সপরিবার ! আত্মঘাত ! অবধারিত !!

যদি বন্ধু এবং হিতৈষীদের কথা শুনতাম, কায়চুর-প্রপাত দেখতে যাওয়া হতো না, হলেও পাখির মতো উড়ে কেবল প্রপাত দেখে চলে আসা হতো। হতো না গায়ানার ভুবনবিদিত মহারণ্যের রূপটিকে চিরদিনের স্মৃতিতে ধরে রাখা।

এজন্য প্রথম ও প্রধান ঋণ আমার হাজি নবী মুহাম্মাদের কাছে। নবী ব্যবসায়ী। লক্ষপতি। বিশেষ শ্রদ্ধা করতো। তার কাছে কেবল বলতে গিয়েছিলাম যে তার জ্ঞাতিভাইয়ের জীপটা ভাড়ায় আমাকে পাইয়ে দেওয়া।

সব শুনে নবী চমকায়। বলো কী ! সেই জীপে চড়ে যাবে পোটারো. পরিক্রমায় ! সেরেছে ! বসো বসো। আগে খানা খাও। পরে হবে।

সন্ধ্যায় ডিনারের পর যখন ফেরার জন্য উঠি নবী বললো—জবাব দিতে হবে। এখুনি নয়। সাত আট দিন পরে।

জবাব এলো, জীপ ঠিক হয়েছে। ড্রাইভারও। তোমরা ব্যবস্থা করো।

আমরা নয়টি মাথা আমি এবং ড্রাইভার। গোরা এবং আত্রেয়ী। ওদের মা। জনি, মাখনলাল, উধো এবং ভগত। সন্ধ্যার সময় নবীর ছেলে নিজাম এলো জীপ নিয়ে। ঝকঝকে নতুন ল্যান্ড রোভার। বাবা কিনলেন। বললেন পণ্ডিত মেরে জাহান্নমে যাবো? তার চেয়ে জাহান্নমে যাই গাড়ি কিনে। সেটাই ভালো। যা, পণ্ডিতকে দিয়ে আয় গাড়ি। তবে ড্রাইভার আমি দেবো।

পথে পড়ে অ্যালবিয়ন। ভোর চারটেয় নবীর বাড়ি। ড্রাইভারের মালপত্র চড়লো। ড্রাইভারও চড়লো। এ কী—নবীর ছেলে নিজাম!

আমি নবীকে বলি, ছেলেকে কেন সঙ্গে দিচ্ছো?

যদি আনকোরা গাড়ি নিয়ে পালাও পণ্ডিত?—সে হচ্ছে না!

সবাই হাসি।

জনি বলে, আমি চালাতে পারবো, মাখন পারবে। ও ছেলেটাকে কেন কষ্ট দেওয়া? বিপদও অনেক।

তাই গো তাই। যদি কিছু হয় সবাই বলবে নবী শালা হিন্দুগুলোকে মারবার কল কিনে দিয়েছিলো। তাই ছেলে পাঠালুম। নবীর ছেলে বাঁধা থাক। বিপদ কিছু ঘটলেও খবরের কাগজে একটা অ্যালিবি থাকবে।

নিজাম বলে, চাচা, বাগড়া দেবেন না। আমার তা'লে আর যাওয়াই হবে না।

অন্ধকারেই বার হলুম বটে। নিজামের পেটে ছিলো আর এক দুরভিসন্ধি। ওর পরম বন্ধু ফারুকের বিরাট করাতকল নিউ আমস্টার্ডামে। ফারুক নিজামের ছোটো বোনকে বিয়ে করেছে। বন্ধু; ভগ্নীপতি। কৃষ্ণার্জুনের সম্পর্ক। গিয়ে হাজির ফারুকের বাড়ি। বন্দুক ধার নেবে।

ফারুক বলে, বারে আমার ইয়ার রে! নিজে যাবি শালা, আমি জোগাবো বন্দুক! কেন? গুলি করলে দোষ কি? খুন করবো আমায় ফেলে গেলে।

ফারুক নাছোড়বান্দা। চাচা আপনি ইনায়ৎ করুন। ব্যস্—ও শালার স্বার্থপরতা আমার জানা। ভালো দেখে বেছে যে মেয়েটাকে পাড়ায় সুতো বেঁধে রাখলুম—তাকে বিয়ে করলে ও, আর ওর একটা অপয়া, বিশ্রী—

হাসতে হাসতে নিজামের বোন জারীনা এসে দাঁড়ায়। কার কথা বলছো?

আমরা খুব হাসতে থাকি!

ফারুক বলে, কার কথা আবার সেই গাড়িটার কথা—সেই অপয়া বিশ্রী গাড়িটায় করে সেই বউ নিয়ে—

থাক, থাক। নিয়ে যা ওকে নিজাম। ফারুক যদি দেখে তুই যাচ্ছিস এবং ও বাদ—আমাকে তালাক দেবে।

তখন আমি বলি, শোনো বাছারা। ফারুক অথবা তুমি একজন। দুজন এবং বন্দুক—এ হবে না।

ভগত বলে, দাদা তুমি ভারী বেরসিক। জঙ্গলে যাচ্ছি বন্দুক থাকবে না?

না! জঙ্গলে, তোমাদের মতো চ্যাংড়ার দল, বন্দুক! ব্যস্ তা হলেই জঙ্গল পেরুনো মাথায়। জানো তো র‍্যাশন সঙ্গে নিয়ে পথ চলা। দিন বাঁধাবাঁধির মধ্যে। এমন কি পেট্রল পর্যন্ত বাঁধাবাঁধি। বন্দুক মানে শিকার, শিকার মানে অন্তহীন সময়ের অপব্যয়।...না, এক নয় ফারুক, নৈলে বন্দুক।

জারীনার হাতে বন্দুক দিয়ে ফারুক লাফিয়ে উঠে বসলো জীপে।

ঠিক ছটার স্টিমারে আমরা বারবীস নদী পার হয়ে গেলুম।

জর্জ টাউনে পেঁৗছে র‍্যাশন কিনে, ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চ-টী এবং ডিনার প্যাকেট তারিখ অনুযায়ী বেঁধে প্যাক করে বাক্সবন্দী করতে সময় নিলো। নিজাম ততক্ষণ জীপের মাথায় শক্ত তক্তা লাগিয়ে ছাদ করেছে, জিনিস রাখার জায়গা চাই। টারপলিন নিয়েছে। গ্যাস বাতি, স্টোভ, কুড়ুল এবং পেট্রল সঙ্গে নেবার মতো বড়ো ক্যান দুটো।

ডেমেরারা নদী ফেরীতে পার করে আট মাইল দূরে পারীকা বন্দরে এলাম। পারীকায় নতুন স্টিমার। এ নদীর নাম এসিক্যুইবো। আসলে যাবো বার্টিকায়। বার্টিকার মতো রমণীয় শহর গায়ানায় নেই। বার্টিকায় মিশছে তিনটি নদী। এসিক্যুইবো, মাজারুণী এবং কুয়ুনী। কুয়ুনী ভেনেজুয়েলা থেকে আসছে, মাজারুণী আসছে ব্রাজিলের জঙ্গল থেকে। এ সব নদীর উৎস কোথায় কেউ জানে না। অন্ধ-দুর্বিপাক জঙ্গলের তল্লাট। শত শত নদীনালা যোগ দিচ্ছে এ সব নদীতে। সেই বেগবতী ধারা এসে সংগত হয়েছে বার্টিকায়। প্রখ্যাত ধনকুবের জমিদার দেওরূপ মহারাজ যাবেন এসিক্যুইবো পার হয়ে ওপারে। টাইগার আইল্যাণ্ড পেরিয়ে স্যাণ্ডি, অ্যানা রিজ ঈনা। তারপরে তাছে মায়াময়ী নদী পামেরুন। প্রবাহপথে চারটি নদীকে আমি পবিত্র বলে কবুল দিয়েছি। গঙ্গা, মিকং, পামেরুন এবং মিসিসিপি। পামেরুন আমার আত্মার কবিতা। জীবনের পারীকায় পর পর, পাশাপাশি দুটো স্টিমার দাঁড়িয়ে। একটাতে দেওরূপ। অন্যটাতে আমরা সব।

পারীকার স্টেলিং ভর্তি ভারতীয় ফল-উলীবা ফল নিয়ে বসেছে, যেন বাগান মেলা। আনারস, লেবু, কমলা, বাতাপী, মৌসমী, পেঁপে, কলা, আম, শসা, টম্যাটো, জাম, পামারাক, সফেদা—সব টাটকা, সব সদ্য পাড়া। কিন্তু কেনার জো কৈ? আমাদের স্থানাভাব? স্টিমার পেঁৗছুতে পেঁৗছুতে সন্ধ্যা। তবু বেশ কিছু ফল নেওয়া গেলো। সদ্য সদ্য খাওয়া হলো স্টিমারে। পেঁপে, আতা, সফেদা আর কমলা। কলা তো বটেই। মর্তমান (এখানে বলে সিল্ক ফিগ্; আর বামাশেল, সিংগাপুরী সবুজ কলা)।

পথে বড় বড় সব দ্বীপ—লাগুয়ান, ওয়াকানহাম, টাইগার আইল্যাণ্ড, মানাকা, —প্রত্যেকটাই সমৃদ্ধ বদ্বীপ। যাকে বলে উর্বর। গোটা টাইগার আইল্যাণ্ড একটি জমিদারের। গোটা ওয়াকানহামের বাসিন্দা ভারতীয়।

নামগুলো ডাচ।

এ তল্লাটে ডাচ-ইতিহাস পদে পদে! ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে যখন ডাচ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর পত্তন হলো তাদের মুখ্য কারবার হলো দুটি। পয়লা—স্পানিশ গ্যালিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বোম্বেটেপনা। দোসরা—স্রেফ আফ্রিকা, জাভা, বোর্নিও থেকে ধরো আদমী, বেচো—টাকায় টাকায় লাল হয়ে যাও। এ্যয়সা পিটান পিটুতো এরা যে ডাক্তার পিঙ্কার্ড তো দেখেশুনে বুন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। ফ্যাশানেবল বাড়ির মেয়েরা কালো নিগ্রোর গা কেটে রাঙা রক্ত পড়া শখ করেই দেখতে যেতেন। কালো মিশমিশে চামড়া ভেদ করে কেবল লাল টসটসে রক্ত পড়ছে। ত্রিনিদাদের জয়ধ্বজায়, কালোর সঙ্গে লাল রং আজও। ডঃ পিঙ্কার্ড একবার একটু কেঁপে উঠেছিলেন বেত্র-পীড়িত এক হতভাগ্যের আর্তনাদে। মেয়েরা মেনীমুখো ডাক্তারটাকে দেখে হেসে ফেলেছিলো।

ডাচেদের সময়ে এসিকুইবোর রবরবা ছিলো। ডাচ ব্যবসায়ী ফ্যান্ পেরে-ই প্রথম ডেমেরারায় গিয়ে কলোনী করেন। তখন জর্জ টাউনের নাম ছিলো স্টাব্রুক্। তার আগে নাম ছিলো লং-শাঁ। লং-শাঁ ফসাসী নাম; ফরাসীদের কাছ থেকে জিতে নিলো ডাচ; নাম দিলো স্টাব্রুক্; জিতে নিলো ইংরেজ—নাম দিলো জর্জ টাউন। আজ সে ইতিহাসের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় স্টাব্রুক্-মার্কেট নামে।

মাজারুণী, কুয়ুনী, এসিক্যুইবো—ডাচেদের তীর্থ। মাজারুণীতে ডাচেদের দুর্গ ছিলো কায়কোভার-অল্। এখন তার খণ্ডর্ পড়ে আছে। কিন্তু লেগুয়ানের জলের ধারে ডাচ কায়দায় দেয়াল। তার ওপর ডাচেদের তৈরী দুর্গের অংশ। ডাচেরা পামেরুন নদীতেও মস্ত ব্যবসায় ফেঁদেছিলো। ফরাসীরা এসে পুড়িয়ে সেই যে দিলো, আর কখনও মাথা তুলতে পারেনি এ তল্লাট।

তবু বার্টিকা দেখার পর আমি বিশবাস করেছি যে এই শহরটিই (?) গায়ানার মুখ্য শহর হওয়া উচিত। তা না হয়ে বার্টিকার ওপারে কার্তাবু-পয়েণ্টে—যেখানে কামারিয়া জলপ্রপাতের তলায় কায়ুনী মিশেছে মাজারুণীর জলে—সেখানে পত্তন করা হয়েছে গায়ানার 'পীনাল সেটেলমেণ্ট'।

গায়ানার নৈসর্গিক বিচিত্রতার রস মানুষ-বসতির এলাকায় বড় একঘেয়ে; তার কারণ দিগন্তব্যাপী ধান ক্ষেত এবং আখ ক্ষেত। বাংলাদেশের চেহারা দেখে একই কথা মনে হয় আমার। বাঙালীর চরিত্রে দার্ঢ্যের অভাব; দ্রবতা বেশী। মাৎস্যন্যায়ের প্রবলতা; নব্যন্যায়ের ঢোল। বাঙালী চরিত্রে কোমলতা, বাঙালী মানসের উদারতা, বাঙালী চিন্তায় জটিল তার্কিকতা বাঙালীকে বিচারে নিপুণ, স্বভাবে কাব্যিক যতোটা করেছে ততোটা দিয়েছে একরোখা সহিষ্ণুতার অভাব। মনে হয় সেই যে রাজমহল পার হলুম তারপর জলা আর সমতল। পাহাড় নেই বাংলার মাটিতে। শিলা, প্রস্তর, অচল দার্ঢ্য—বিরোধী শক্তির সমর্থ এবং সক্ষম বাধা—এ তো কোমলতার মধ্যে সম্ভব নয়। তাই মানসিক উপাদানে বিদ্রোহী হয়েও বাঙালী ক্ষাত্রবীর্যে পাঠান নয়। গুয়ানার নদী-মোহানা, সাগর-মেখলার বিস্তৃতির মধ্যেও সেই আর্দ্র কোমলতা। মাটি সমতল, নিপাট সবুজ, জলে থসথসে।

বার্টিকায় এসে পাহাড় দেখলুম। এখানে পাহাড়ে চড়ে সূর্যাস্ত দেখা বড়ো রকমের আমোদ।

[এই বার্টিকা-এসিকুইবো-মাগুয়ান অঞ্চলে হঠাৎ মিলেছিলেন এক 'বেঙ্গী' (ব্যানারজী-র অপভ্রংশ) এ জঙ্গলের রবিনসন ক্রুশো। আশ্চর্য সেই বাঙালী শিল্পীর আশ্চর্য কাব্যজীবনের মালগুময় ইতিহাস নিয়ে গল্প লিখেছি। এখানে তা নিরুক্ত থাক।]

বার্টিকায় একটি কাজ আমাকে করতে হলো।

বোঝাতে হবে।

বার্টিকা থেকে যে পথ আরম্ভ হবে তা শেষ হবে কাঙ্গারুমায়। জঙ্গলে দু-একখানা বাড়ি। তার মধ্যে একজন স্কটিশ ক্রিওল্; নাম জন অস্টিন। কাঙ্গারুমা নদীর ইজারা তার। তারই আছে একখানা বোট। সেই বোটটি না হলে নদীপথে বাকী ত্রিশ মাইল যাওয়া ত্রিশ দিনেও অসম্ভব।

কাঙ্গারুমার নিকটবর্তী সরকারী অফিস এবং পোস্টাফিস মাহ্দিয়া। এখানে এক আধা চীনা কালেকটর থাকেন। তাঁর কাছ থেকে সুপারিশ না পেলে নৌকো পাওয়া অনিশ্চিত। এ ছাড়াও পথে রাত কাটাতে হবে তুমাতুমারিতে। সেটি পোটারো নদীর প্রপাত। এই প্রপাতের পরেই মস্ত একটা নদী গামলায় ধরা পড়ার মতো ধরা পড়েছে। নদীর বালি মাটি জঞ্জাল এসে সেই বাটিটায় থিতোয়। এই থিতুনো আবর্জনা ছেঁকে তুলে পুনশ্চ ধুয়ে ধুয়ে বার করা হয় "সোনা"—গায়ানার বিখ্যাত সোনা। তুমাতুমারিতে ইংরেজ কোম্পানীর সোনার ইজারা। (অধুনা ন্যাশানালাইজড্) পোটারো-কায়ুনী-পামেরুন এলাকা হীরের এলাকা। এই তুমাতুমারিতে রাত কাটানো অসম্ভব, কারণ কোনো রকম হোটেল নেই। বাইরের লোকের পক্ষে রাত্রিবাসও অসম্ভব। একটা সরকারী ডাকবাংলো আছে। পাওয়া যায়। যদি বার্টিকার কালেকটর সুপারিশ করেন।

কালেকটর সাহেব তখন 'চান' করতে নদীতে ভাসমান। সে দিকটা 'একানে'। সাহেব, মেম-সাহেব এবং বন্ধুদের নিয়ে জলবিহারে মগ্ন। সেখানেই সংক্রান্তি দেবতার মতো আমি হাজির। জল থেকে উঠে এসেও সুপারিশ লিখে দিলেন।···আমার কাছে মন্ত্রীমশাইয়ের পাঞ্জা ছিলো।

কিন্তু কিছুতেই কিছু যে হয় না বুঝেছিলাম তুমাতুমারিতে পৌঁছে। আজ ভাবি ভাগ্যি ডাকবাংলোয় থাকিনি।

বলছি সে কথা।

রাতের ডিনার বার্টিকার একমাত্র হোটেলে খেয়ে রাতটা আমরা স্টীমারের ডেকেই কাটালাম। ভোরবেলা নদীর পারে সেই সূর্যোদয় অবিস্মরণীয়। ওপারে শুধু বন আর বন। সেই রহস্য-সঙ্কুল বনস্থলীর অন্তরঙ্গ হয়ে পরিচিত সূর্যদেব যেই উঠলেন মনে হলো ওই বনভূমিও আমাদের রক্তের প্রতিবেশী। হঠাৎ আকাশে বাতাসে, জলে—জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে—পরিচিতে, রহস্যে এই যে জানাজানির গান, এটাই যেন নতুন পরিবেশকেও আপন করে তোলে।

গাড়ি চললো সকালে। আগাগোড়া পাথুরে পথ। লাল পাথর, ঠিক যেন উড়িষ্যার অঞ্চল।—কিন্তু জঙ্গল ক্রমশই পথকে সঙ্কীর্ণ করতে লাগলো। এবং পথ উঠছেই।

অতঃপর সে পথও শেষ হলো। এলো জঙ্গল। বুকার্স কোম্পানীর ইজারা নেওয়া গ্রীণ হার্টের জঙ্গল। বালাটার জঙ্গল। রাবারের মতো বালাটাও একটা দ্রব্য, গাছের ক্ষীর। —গাছটার গুঁড়ি লোহার মতো শক্ত। পেরেক গাঁথা যায় না। বুলেট-কাট বলে। বড় বড় বাড়ির থাম করা হয়। ঘুণ ধরে না।

এ পর্যন্ত তবু শদো বালির পথ ছিলো। এখন কেবল গাছের গোল ডাল বিছানো পথ। দুর্গম। দিনেও অন্ধকার। আশি নব্বই ফুট খাড়া সোজা গ্রীণ হার্টের জঙ্গল। মাঝে মাঝে জীপ যেতে পারে না। কুড়ুল চলে ঝপাঝপ। পথ হয়। গাড়ি চলে। নানা পাখি কলকল করতে করতে যায়। বনমোরগ তিতির, গায়ানার প্রসিদ্ধ কড়া-বিহারিণী, পাচক-প্রণয়ী, পাক-শালা-নন্দিনী পাখি কুরাসাও ঝাঁক-ঝাঁক। উড়ছে না। স্রেফ সুমুখ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা তো জানে না মানুষ মানে কী। বিশ্বাস করে।

কটমট করে তাকায় ফারুক! ভগত বলে, এঃ, দেখো তো দাদা! তুমি অহিংস হওয়ার দরুন হিংসায় আমার দাঁত কড়মড় করছে। নিজাম বলে, ফিরে যেতে যেতে স্রেফ হিন্দু বনে যাবো।

ওদের ভারী দুঃখ ওদের বন্দুক আনেনি।

মস্ত একটা গাছ উপড়ে পড়েছে। পথ অবরুদ্ধ বা নিরুদ্ধ নয়, সংনিরুদ্ধ! ওদের এখন অনেকক্ষণ লাগবে ঐ গাছ সামলাতে।

মাখনকে বলি, ভাই শক্ত গোছের একখানা লাঠি দাও হাতে। এগুই। তোমাদের হলে এসো।

মাখন কাটলাস দিয়ে কেটে দিলো শক্ত একগাছা লগুড়। গোরাও সঙ্গ নিলো। বাবা, আমিও।

আত্রেয়ী তার মায়ের কাছে জীপের মধ্যে।

জনি এবং ভগতের নিরন্তর, অবিশ্রাম সেবার আওতা ছেড়ে আত্রেয়ী-জননী নড়তে তখন নারাজ। খুব মজা লেগেছে তার। বনের চারধারে এটা-ওটা দেখছে, কুড়ুচ্ছে, ফেলছে। চুরি এখানে চুরি নয়; জুয়াচুরির অর্থ নেই; পাওয়া চাওয়া সব নিবৃত্ত। আরণ্যক ভোজে অবিমিশ্র মুক্তির আস্বাদ।

আমি আর গোরা এগুতে থাকি। হঠাৎ বাঘের পায়ের ছাপ! বড় বড় ছড়ানো থাবা। বাঘিনী নয় বাঘ। বাঘ তো নেই; জাগুয়ার। পুমার বাস আরও দক্ষিণে; আরও গভীরে।

গোরা বলে, এগুবে বাবা?

কেন নয়? পায়ের ছাপ তো স্পষ্ট। গতি কোন দিকে তাও স্পষ্ট। সদ্য দাগ। পিছন দিক থেকে ওরা গন্ধ পাবে না। তা ছাড়া, পাখি দেখলে না? ওরা মানুষ দেখেই না বড়। দেখে সরেই যাবে। কাছাকাছি বাঘ থাকলে পাখিরা চেঁচাতো; জঙ্গলে নানা শব্দ হতো। চলো।

কিন্তু মাইলখানেক পরে আর এগুতে সাহস হলো না। ফিরলাম না ঠিক। তবে

থেমে গেলাম। খুব ধীরে ধীরে পা ফেলতে লাগলাম। মানুষের অবচেতনে ভয় বলে যে রংটা আছে তার আসল নাম আত্মরক্ষণের চাড়।

জীপ এসে গেলো।

তুমাতুমারি পৌঁছুলাম ভরা দুপুর পার করে।

যেন একটা ঘুমন্ত দেশ। পোস্টাফিস, পুলিস থানা, হাসপাতাল—সব সাইনবোর্ড। কিন্তু ফাঁকা, ফাঁকা, ফাঁকা। কেউ কোত্থাও নেই। জনমানিষ্যি নেই। কারুকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো এমনও কেউ নেই। ঘুমন্ত পুরী। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড ফতেপুর সিক্রী!

তখন মনে পড়লো গত ছ মাস ধরে তুমাতুমারির সোনা-কোম্পানী বন্ধ। ধর্মঘটের পর ধর্মঘটে বিব্রত হয়ে কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেছে। নীলামে চড়েছে। কেউ নেই।

জীপ নদীর দিকে নামছে।

হঠাৎ সে একটা চমক, শিহরণ।

গোটা একটা নদী বনের ছায়া ভেদ করে শান্ত বুকে এগুতে এগুতে প্রায় তিন চার ফুট নীচে একটা লাইন ধরে হঠাৎ নেমে এসেছে। তার পরেই প্রায় আধমাইল ব্যাসের একটা জলাধার, একটা দিকে ঢুকে গেছে অন্য বনে। চারিধার শান্ত। জলও শান্ত। আকাশ শান্ত, নদীর প্রবেশ-প্রস্থান শান্ত। ওপারে সোনার কারখানা থেকে ইঞ্জিনের একটা চাপা শব্দ।

অনবরত জল পড়ার একটা শব্দ; আর শব্দ মাঝে মাঝে পাথরের চাঙড়ে গায়ে গা দুলিয়ে নদীর চলে যাবার। সে শব্দ একটানা—যেন গান গাইছে নির্ঝর, মিষ্টি!

হঠাৎ সারা সকালের দুর্গমের পর এই জলভরা অবকাশ, এই পাথরে, নুড়িতে বনে, ছায়ায়, আলোয়, স্বপ্নে জড়ানো একটা স্বয়ংসিদ্ধ জগৎ যেন বনবাসের বেদনার পর পম্পা সরোবরের বিশ্রাম।

হঠাৎ যিনি এসে দাঁড়ালেন তিনি এক দীর্ঘকায় সরকারী উর্দীপরা নিগ্রো।

সব শুনে বললেম, ভাবনা কি, সঙ্গে যখন খাবার আছে যে কোনো বাড়িতে উঠে যান। সবই খোলা।

ঝরনার ওপরেই চীফ এঞ্জিনীয়রের মনোরম বাংলো। জনি আমাকে হ্যামক টাঙিয়ে দিলো বারান্দায়। শুয়ে শুয়ে সেই দৃশ্য দেখছি।

ওরা বাইরে খিচুড়ি রাঁধছে।

আমরা ভোর রাতেই বেরুলাম। অবশ্য চা সেরে।

ঘন জঙ্গল এবং শাদা বালি এবং তার ওপর ফালি ফালি গোল গোল গাছের ডাল। জীপ চলেছে। বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছুলাম হাণ্ড্রেড্ মাইলস্ হাট। এখানে শেষ পেট্রল পাওয়া যায়। ট্যাঙ্ক তো ভরা হলোই, সঙ্গের টিন দুটোও।

এর পরেই আমেরিণ্ডিয়ান আদিবাসীদের তল্লাটে। পদে পদে বোঝা যায় মানুষের বসতি। কিন্তু দেখা যায় না কিছু। বোঝা যায় আমাদের কেউ দেখছে। নিজেরা দেখি না কিছু। আধা মাইল না হলেও তিন ফার্লং জোড়া একটা কাঠের পুল।

তলায় যেন কেঁপে-ওঠা ফেনিল কালো জল। নদীটা পার হয়ে এলুম। এলুম থকথকে ঘন জঙ্গলে। আরও বিপদ, বালি শেষ হলো। এসে গেলো উবড়োখাবড়া পাথুরে জমি। পথ নেই আর একটুও। কিন্তু নিজাম গাছের গায়ে দাগ দেখে দেখে গাড়ি চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন তীব্র পাথুরে বাঁক যে নিজেই আর্তনাদ করছে, গাড়ি থামাচ্ছে, ঘাম মুছছে। ফারুককে বলছে তুই ধর। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। গিয়েছিলুম আর কি। ফারুক বলে, দেবো থাবড়ে। শালা মেরে ফাঁসি হব ঘরে এবং বাইরে। দুবার ফাঁসি যেতে নারাজ আমি।

মাঝে বার দুই পথ ভুল করেও কাঙ্গারুমায় পেঁাছেছি তখন বেলা দশটা হবে।

কাঙ্গারুমায় সেই স্কটিশ ক্রিওল ইজারাদার জন অস্টিন।

কিন্তু অস্টিন কিছুতেই সেদিন নৌকো নিয়ে বার হবে না।

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য সঙ্গত কারণই ছিলো না-যাবার। সবে তখন একটা দল নিয়ে পেঁাছেছে অস্টিন। দুদিন পরে ফিরেছে। "আমি রাজী হলেও আমার বোটম্যান রাজী হবে না।...বোটম্যান দেশী; আমেরিণ্ডিয়ান। পাইলটও তাই। নদীর তলায় এতো পাথর, পথ এতো সঙ্কীর্ণ, জলের ধারা এতো সঙ্কুল, তাদের ছাড়া নৌকো চালানো যাবে না।... ..এবং দুদিন পরেও হবে না। পরশু আমার বোট বুক্‌ড্‌। এক সপ্তাহের আগে হবে না !!!"

ভীষণ সমস্যা। খাবার নেই এক সপ্তাহের। ফিরে গিয়ে খাবার ব্যবস্থা হতে পারলেও ভগতের এবং নিজামের ছুটি সেই!

আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

কিন্তু মিস্টার অস্টিন আপনাকে আমি তার দিয়ে রিজার্ভ করে রেখেছিলাম নৌকো। মিনিস্টার তার করতে বলেছিলেন। বার্টিকার কলেকটরের চিঠি আছে।

তার আমি পাইনি।

অস্টিনের গলার স্বরে শয়তানী। আমার সন্দহ হলো।

নিজামকে বললাম এদেব এখানে রাখো। তুমি আমাকে সঙ্গে করে মাহদিয়ায় চলো। মাহদিয়া জঙ্গল মহালের সদর। ডাকঘর আছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আনুমানিক পথ।

ওরা রাঁধাবাড়ায় ব্যস্ত হলো।

মাহদিয়ার পোস্টাফিসে আমি তারের খোঁজ নিয়ে ফিরে অস্টিনকে বললাম, মাহদিয়া আপনাকে তার দিয়েছে, সে প্রমাণ আছে মিস্টার অস্টিন।

হয়তো সে জন্য ফাঁসী যাবো। প্রস্তুত। কিন্তু সপ্তাহের আগে কায়চুর যাবো না। অসম্ভব। সেটা হবে আত্মহত্যা।

কাঙ্গারুমা নদীর ধারে গিয়ে বসে আছি।

দু-চোখ জ্বালা করছে। রাগারাগি করে কোনো লাভ নেই। সঙ্গের প্রত্যেকের মন মুষড়ে গেছে।

পিছনে দাঁড়ালো লীলা। টের পাইনি।

বললো, এতো ভাবছো? তোমার না খুব বিশ্বাস? এতো ঠুনকো সে বিশ্বাস?

চেয়ে দেখলাম সেই অবিশ্বাসনীয় বিশ্বাসের, নির্ভয়ের দিক। নিজের ওপরে আস্থা হারিয়ে একেবারেই বসে পড়েছিলাম। কিন্তু করধৃত শুকতারাসম দাঁড়ালো শপথে যার মন ঠাসা।

ওঠো। চেষ্টা করো।

জঙ্গলে কী চেষ্টা। তবু...

চলো মাহুদিয়ায় আবার।

মাহুদিয়ায় কলেকটর আধা চীনা। তস্য পত্নী পুরো চীনা। বাংলোয় বসে আছেন। সাহেব নেই। জোর করে মেম সাহেবের সঙ্গেই দেখা করার জেদ ধরলুম।

আমেরিণ্ডিয়ান আদিবাসী প্রহরী। আমার ব্যস্তবাগীশ কণ্ঠস্বরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো।

চারধারে গভীর নিশ্চুতি জঙ্গল। তবু যেন কী করে বোঝা যায় কাছাকাছি নদী আছে। গেইন্‌স্ বরোর সবুজ ঢাকা ক্যানভাসের মতো যেদিকে চাওয়া যায় শ্যামল ছবি। মনে হয় সূর্যের আলোও সবুজ হয়ে গলে পড়ছে সবুজ আকাশের গামলা চুয়ে চুয়ে। 'পশ্য পদ্মরাগ-মরকত-সংবলিতা নভস্তলাদ বতরতি'!

শান্ত পরিবেশের মধ্যে এ আমার কী অশান্তি!

কাঠের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি খুঁটির ওপর। ওপরে চলে গেছে কাঠের সিঁড়ি। সবুজ রংয়ে ঢাকা কাঠের বাড়ির চার ধারে কাঠের রেলিং। ছাদ ছাওয়া করোগেট টিনে। টিনের চার কোণের সঙ্গে গাঁথা টিনের চোঙ নেমে এসে থেমেছে বিশাল বিশাল গামলার ওপর। গামলা সব বৃষ্টির জলে ভরা।

চার-পাঁচটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বার বার আমায় শুঁকছে। দুটো বড়ো জর্মন কুকুর বাঁধা।

শ্রীমান নেমে এসে সলজ্জ হেসে বললেন, উঠে যান।

সলজ্জ হাসির তাৎপর্য ওপরে গিয়ে বুঝলাম। দামী রঙিন হ্যামকে চীনা যুবতী অনায়াসে প্রলোভনে ত্রিভুবন জয় করার জন্য হেলান দিয়ে শুয়ে দোল খাচ্ছেন। কিছু পরে নেই বললে প্রায় এক গজ সাটীনের (টুকরো টুকরো হলেও) অমর্যাদা করবো। সম্পূর্ণ অনাবৃত সেই দেহবল্লরীর পীতাভ আনম্রতা অনতিপক্ক জামরুলের দ্যুতি নিয়ে দুলছে। চোখে নিবিড় কাজল। হাতে রাঙা টসটসে পামারাক; কামড়ালেন, মস্ করে শব্দ হলো; পামারাকটি নিটোল।

আমার আবেদন শুনে বললেন, আমার পতিদেব বার্তিকায় গেছেন বন্ধুদের আনতে। কেউ নেই। আমি একা। থেকে যান না এখানে। দু-দিন কাটবে ভালো। এদিকে কেউ আসে না। উনি এলে বলে ব্যবস্থা করে দেবো।

থাকার জো থাকলে থাকতুম, এতোই মনোরম এ পরিবেশ। কিন্তু সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুদল!

উঠে বসলেন। অকারণে মেঝেয় দাঁড়ালেন। খানিকটা ঘুরে এসে অকারণেই বললেন, তবে তো আমি নাচার। এ জঙ্গলের ত্রিসীমানায় আর কোনো কেউ নেই।

তবুও বললুম, কোথাও কোনো উপায় থাকলে বলে দিন। অস্টিন মিথ্যা বলছে। কেন বলছে জানি না। কিন্তু বলছে।

কিন্তু কোনো উপায় নেই। অস্টিন মিথ্যা ঠিকই বলছে। বলি শুনুন। আমার স্বামীর দুজন বন্ধু জর্জ টাউন থেকে আসছেন। কলেকটরের অতিথি এখন তাঁরা।

সম্ভবত তাঁদেরই আমি বার্টিকায় স্নান করতে দেখেছি।

হতে পারে। সম্ভব। আমার স্বামী তাঁদেরই আনতে গেছেন।

হ্যাঁ। কিন্তু তাঁর মত ছাড়া আমি ব্যবস্থা বাতিলই বা করি কী করে। অতিথিরা আমার এখানে আট দশদিন থাকবেন। অনায়াসেই আমরা অন্য দিন যেতে পারি। অথচ অস্টিন আমাদের খুশী করার জন্য আপনার তার পেয়েও মিথ্যা বলেছে। বুঝতে পারছি। আমি বললে অস্টিন যাবে। তবে পরশু যাবে। তার আগে নয়। আমি বড় দুঃখিত। কী করি! অস্টিনকে কিছু বলা বিপদের কথা। ও ভারী শয়তান লোক।...ওরা থাক না এ দুটো দিন ক্যাম্পে। আপনি দু দিন থেকে যান। স্ত্রীকে—নয় নিয়েই আসুন। দেখুন কী হয়।

তাঁর সহানুভূতিতে আমি অভিভূত। বললাম, আর আমার বলার কিছু নেই। আপনি যে এতোটা করতে প্রস্তুত এজন্য ধন্যবাদ। দুদিন দেরী আমরা করলেও আমার দুটি সাথী মোটেই ছুটি পাবে না। যদি ওরা দুটো দিন থাকে আপনাকে জানাবো।

চলে আসছি। পথে একটি ছেলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে ধরলো। বুঝলাম বনের পথে তাড়াতাড়ি এসে ধরেছে।

কী ব্যাপার?

মেমসাহেব খবর দিলেন একটু দূরে মাহদিয়ার কোলে সার্ভিসের দোকান আছে। তারই কাছে জর্জ থাকে। জর্জ একজন পোর্ক-নকার (জংলী নিগ্রো, হীরের সন্ধানে জীবন কাটায়)। এদিককার অনেক জমি ইজারা নিয়ে হীরে খুঁজে বেড়ায়। তার নৌকো আছে। নদীতে নদীতে সর্বদাই ঘুরে বেড়ায় সে। তার খোঁজ করুন।

নিজাম বললো, যাবেন নাকি?

আমি বলি, কোথায় যাবো কোন পোর্ক-নকারের কাছে। পোর্ক-নকাররা হয় বেধড়ক বোম্বেটে। অঘোরপন্থী, লা-পরোয়া। হয়তো মদে টং হয়ে আছে। চালিয়ে দেবে কাটলাস। পোর্ক-নকার! এঃ! ও সবে দরকার নেই। বরং দোকানটায় চলো। দেখে আসি খাদ্য কিছু পাওয়া যাবে কিনা। তখন বোঝা যাবে পরশু অবধি থাকা কি-না।

দোকানটা বলতে একটা টিন ছাওয়া ঘর। তবে চাল, ডাল, আলু, নুন, পেঁয়াজ, টিনের মাছ আছে। আছে টিনের দুধ, কফি, চিনি। দেখেশুনে ফিরছি।

জাল কাঁধে দীর্ঘ দেহ এক নিগ্রো চলেছে। কী মনে হতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম জর্জকে চেনো? পোর্ক-নকার জর্জ?

হ্যাঁ। কেন?

দরকার ছিলো। বলে নৌকোর ব্যাপার বললুম।

লোকটা একটু হাসলো।

আমিই জর্জ। এই আসছি নদীতে নৌকো ডুবিয়ে রেখে। অস্টিন সাহেব এমনটা করেন। আমার নৌকো নিতান্তই আমার। অন্যের ভার বইবে কিনা জানি না। যদি দু-তিনজনে কেবল জল সেঁচে নিরন্তর ফেলতে পারেন, আমি পৌঁছে দেবো ঠিক।

আমার চক্ষু ছানাবড়া।

ভয় পাবার কিছু নেই স্যার। কাঙ্গারুমা নদী নয়। আমার মা। ছ বছর বয়স থেকেই এই নদীই আমার নাড়ী। নৌকো ডুবেবে না। তবে বড্ড জল ওঠে। যদি দু-তিনজন বালতি করে জল ফেলেন—

নিলাম ভার। কিন্তু সেদিন হলো না যাওয়া। পরের দিন।

জর্জ সঙ্গে নিলো তার পাইলট নয়, বোটম্যান হিসেবে স্পাইককে। বুনো পোর্ক-নকার। নিগ্রো।

ফিরে এসে দেখি জঙ্গলের ধারে একটা জায়গা পরিষ্কার করে লীলা সংসার পেতে বসেছে। উধো তার হনুমানী ভক্তি দেখাচ্ছে; তার 'মা'কে সাহায্য করছে প্রাণপণ। মাখন এবং জনি তাদের দাদার জন্য আবিষ্কার করেছে একটা বেনাব।

বেনাব আর কিছু নয়। বনের মাঝে যেতে যেতে রাত্রিবাসের জন্য বনেচররা কাঠ পাতা দিয়ে একটা আস্তানা মতো করে নেয়। কাঠের ডাল পুঁতে খুঁটো মতো করে এপার ওপার মোটা কাঁচা ডাল একটা আড়াআড়ি রাখে। তার ওপর ঝুলিয়ে দেয় কাঁচা মাংসের টুকরো। তলায় আগুন দেয়। মাংস পুড়িয়ে নিয়ে খায়। বেনাবে পড়ে থাকে ছাইয়ের গাদা।

সেই একটা বেনাবের ডাল পাতা শক্ত করে ঝুলিয়ে দিয়েছে হ্যামক। আমি বিশ্রাম নিচ্ছি। খিচুড়ীর গন্ধ আসছে নাকে।

ইতিমধ্যে দশ-এগারোটির একটি দল। সবাই নিগ্রো। পোর্ক-নকারের দল। সাত-আট মাস নাগাড়ে কাটিয়েছে গভীর জঙ্গলে। গ্রীষ্মে বর্ষায় ঠায় গাছের মতো ভিজেছে। পুড়েছে। এতো দিন পরে প্রথম মানুষ দেখলো, অন্য পৃথিবী দেখলো; দেখল ভারতবর্ষের লোক, সপরিবারে। সাহস দেখে তারিফ করলো।

হঠাৎ বদান্য হয়ে যাওয়া পোর্ক-নকারের স্বভাব।

বললো, দেখবেন হীরে?

পেয়েছো?

এবার বেশীই পেয়েছি। কিসমৎ! আপনাদের দেখাও কিসমৎ!

এক এক জনের ভাগে কটা?

তেমন ভাগ করি না আমরা। যে কজন মানুষ সমান ভাগ করি। একটা ভাগ

বেশী করি। সেটা সর্দার পায়। গেঞ্জে থেকে একটা থলি বার করে আমায় বললো—হাত, না—না, দু হাত আঁজলা করে ধরুন।

আমার দু হাতের আঁজলা ভরে যা ঢেলেছিলো দেখে মনে হয় ইটে (রীঠে) মাছের মাথার ভেতরকার হাড়ের কুচি। কমার্শিয়াল হীরে। বললো, যে কোনো একখানা আপনি নিন। খুশী হবো।

হাত ভরে হীরে। কখনও ধরবো বলেও ভাবিনি। বলি, একখানা হীরে নিতে হলে যে ভাই তোমার দিদির একটা কান কাটতে হয়।

অবাক সেই দীর্ঘ দেহ সতেজ আফ্রিকা নন্দন? সে কী? কেন?

এক কানে হীরে পরবে; অন্য কান ফাঁকা; সে ভালো হবে না।

ওরা সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। নিন নিন, দুখানা নিন। বোনের কান ভাই কাটবে না!

আমার লাভ ঐ হাসির তরঙ্গ।

বললুম তোমার দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নেবো না। এই হীরেখানা বাছলুম। যদি দিতে ইচ্ছে সত্যিই হয়, ঠিকানা দিচ্ছি। জর্জ টাউনে গিয়ে বুক করে দিও। ঠিক পেয়ে যাবো।

হাসলো। সে হীরে পাইনি।

তাতে কিছু যায় আসে না। এমন সব মুহূর্তের দাম নেই, মূল্য আছে। ঠকলাম একটু ঠিকই; পেলাম অনেক বেশী।

তা বলে পোর্ক-নকার কখনও ধনী হয় না। শহরে যাবো। পর্তুগীজ বণিক, সাইরিয়ান বণিক—সব কিনে নেবে। ওদের ঘিরে ধরবে বারবনিতার দল। দু-তিন মাসে ফকির হয়ে যাবে। আবার দল পাকাবে। আবার যাবে। সাপে কামড়াবে, জলে ডুববে, পীতজ্বরে ধরবে। তবু যাবে। চিরন্তন স্বপ্ন দেখবে। টাকা আসবে, যাবে। অভাবকেই স্বভাব বলে মেনে নিয়েও রাজার রাজা, উদাসীন, ফকির জাত, ব্রাজিল-গায়ানার পোর্ক-নকাররা।

সূর্য ডোবার অনেক আগে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার আগে রাত। আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি, তাড়াতাড়ি উঠবো বলে। অর্ধেক র‍্যাশন এবং পেট্রলসহ জীপ রেখে যাই একটা আমেরিণ্ডিয়ান পরিবারের অঙ্গনে। কিন্তু বেরুতে দেরী হয়ে যায়।

সেই যাত্রার বর্ণনা দেবো সে কলম কই। পেতাম সঞ্জীবচন্দ্রের কলম, বিভূতিভূষণের কলম—আরণ্যক এই অপরূপের ভৈরব বর্ণনা দিতে পারতুম। ভীষণে নিবিড়ে, আনন্দে আতঙ্কে, প্রতি পদের সংশয়ে দোল খাওয়া সেই অনুভূতির বর্ণনা অসাধ্য। পরতে পরতে খুলে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার বিচিত্র পাহাড়ের বিচিত্র রূপ। যেন সোজা দেয়াল কেটে নদীটা নেমে আসছে। দুধারে তাই খাড়া দেয়াল। দূরে দূরে গিরিচূড়া চূড়াহীন ছাদের মতো। সেই সমতল ছাদে যেন তলার পর তলা ভাগ করা।

এরই মধ্যে মাঝে মাঝেই বহু দূরে দেখা যাচ্ছে শাদা জলধারা বিচিত্র বেগে নেমে পড়ছে

নীচের বনে। কোথায় তারা মিশে যায় কেউ তার খবর রাখে না। গায়ানার অরণ্যে আবিষ্কারও যেমন অপেক্ষমান, নামকরণও তেমনি অপেক্ষমান। শত শত পর্বত নির্ঝর অজ্ঞাত কন্দর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে গভীর নিবিড় অরণ্যালোকে আত্মগোপন করছে।

বোটের মোটরের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। শব্দ জোর তাই বোটের বহু আগে আগে পাখির দল উড়ে আত্মগোপন করছে বনের ভেতরে। কিন্তু জলের পাশে পাশে কিনারে কিনারে শ্যামল লতাপুষ্পের ছায়ার চঞ্চলতা অপূর্ব। যতো রোদ বাড়ে ততো যেন চমৎকার।

দেখতে দেখতে এসে গেলো আমাতুক ফল্‌স্‌।

পাহাড় পথে হঠাৎ যখন নদী নেমে আসে দু-তিন ফুট, তখন জলে যেমন একটা গতিবেগ বাড়ে, তেমনি নৌকো বাধা পায় এগুতে। এগুলোকে জলপ্রপাত বলা হয় না, বলে র‍্যাপিডস্‌।

র‍্যাপিডস্‌ পার হবার উপায় নৌকোর মাল বহন করে স্থলপথে ওপর তলায় পৌঁছনো। অতঃপর নৌকোও কাঁধে করে ওপর তলার জলে পৌঁছনো। আগে আগে তাই করা হতো। জর্জ তা করলো না। জর্জ তার প্রথম নৌকোখানা আমাতুক্‌-এ ডুবিয়ে রেখে গেলো। ওপর তলায় উঠলাম আমরা মালপত্র নিয়ে! সেখানে জর্জের দ্বিতীয় নৌকো সলিল সমাহিত। সেটিকে সে ভাসালো। পুনশ্চ চলা গেলো। আবার এলো অন্য র‍্যাপিডস্‌! এটার নাম কাপিতুক। এর পরে এলো তুকাইত্‌। তুকাইত্‌ পোটারোর শেষ র‍্যাপিডস্‌। কায়চুর পাহাড় এখানে আরম্ভ।

কথা ছিলো তুকাইত্‌-এ রাত্রিবাস করে প্রাতঃকালে পাহাড় চড়া! কাঙ্গাচুর দেখে নেমে এসে নৌকো করে একেবারে কাঙ্গারুমায় আসা।

কিন্তু বেলা তিনটে নাগাদ আমরা পৌঁছেছি তুকাইতে। একখানা ঘর। চাবি অস্টিনের কাছে। চাবি সে দেয়নি। কাজেই বনের মধ্যে রাত্রিবাস করতে হবে। লীলার হাত থেকে গ্যাস লণ্ঠন পড়ে গিয়ে ম্যান্টল্‌টা ভেঙে গেছিলো। আমি বলি আমরা বিকেলেই পাহাড় চড়ি। রাতটা ওপরে কাটাই। সারা সকাল মজা করি। বিকেলে নামবো।

জর্জ শুধায় স্পাইক্‌স্‌।

স্পাইক্‌স্‌ শুধায় জর্জ!

কেউ কখনও রাতে কায়চুরে থাকেনি। হু হু করছে বাতাস। শীত বৃষ্টি লেগেই আছে। আস্তানা নেই। বড়ো গাছের তলায় বৃষ্টিতে থাকা বনেচর শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।

আমি বলি, নব ইতিহাস লেখা যাক। অপরাহ্নে কায়চুর পর্বত আরোহণ।

অন্যায় করেছিলাম। কায়চুর পাহাড়ের খাড়াই সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিলো না আমার। পাহাড় চড়ায় আমি ভারী কষ্ট পাই। আমার ফুসফুস আমার শত্রু। ওরা সব উঠে গেলো। আমি প্রতি দশ-বারো পায়ের পর থামি। একটা সময় এলো যখন ক্যামেরাটাও ভার হলো। শার্টটাও বেশী বলে মনে হলো। শুধু মাখনলাল আমার সঙ্গে। তার কাঁধে একটা থলেতে বাসনকোসন আর স্টোভ। সেও তাই ধীরে ধীরে

চলছে। কিন্তু ঝপ করে রাত হয়ে গেলো। থকথকে অন্ধকার। পথ নেই। নুড়িতে পা রেখে রেখে ওঠা। আমি চেঁচিয়ে বলি পায়ে ভর দিয়ে চলো না। লাঠির ওপর ভরসা রেখো না। হাতে পায়ে হামা দিয়ে ওঠো।

জর্জ একটা টর্চ নিয়ে উঠছে আর নামছে। প্রত্যেককে ভরসা দিচ্ছে। স্পাইকস্ জিনিস নিয়ে উঠে গেছে তড়বড়িয়ে। জর্জ তা করেনি। কিন্তু অন্ধকারের গহ্বরে ওরা হারিয়ে গেলো। আমি আর উঠতে পারি না। বৃষ্টি এলো এক ঝাপটা। ক্ষতি নেই। ঘামেতে সবই সপ্সপে। মাঝে মাঝে যেন আর নিঃশ্বাস নিতে পারি না। অজ্ঞান মতো হয়ে গেলাম। মাখনলাল টেনে এনে আমাকে কোথায় ফেললো। মাথায় মুখে ঠাণ্ডা একটা জলধারা পড়ছে। দেখি আর কিছু নয়। পাহাড়ী গাছের শেকড় জটার মতো ঝুলে আছে। সেই জটা বেয়ে জল পড়ছে। আমি আকণ্ঠ পান করলাম জল। শরীর ঠাণ্ডা হলো। ওপর থেকে ক্রমাগত ওরা ডাকছে। শুনছি। শুনছি মাখনলাল জবাব দিচ্ছে। কিন্তু আমি যেন অন্য জগতে। হঠাৎ বুঝলাম অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, ফুসফুসের ক্রিয়ার ব্যগ্রতার ফলে আমার তলপেটের যন্ত্রগুলোর কীর্তি-কলাপে বিভ্রম এসেছে। কিডনিটা অসাড়। ব্লাডারটার কোনো রোধশক্তি নেই। ব্লাডারের জল উরু বেয়ে অসাড়ে পড়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি। পৃথিবী মুছে যাচ্ছে।

মাখনলাল আর একা নয়। জর্জ নেমে এসেছে। জর্জের হাতে টর্চ। আলো। মানুষ। পৃথিবী। আমি উঠি। বলি, উঠবো ঠিক। সময় চাই।

উঠেছিলাম।

আশ্চর্য পরিবর্তন। সেই মালভূমিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সব ক্লান্তি চলে গেলো। এখানে বৃষ্টি নেই। কেবল বাতাস। বড়ো বড়ো গাছের আশ্রয়। হু হু করছে বাতাস। আমরা চলেছি। জর্জ বলেছে যেখানে টুরিস্টরা বসে টিফিন খায় সেখানে টেবিল আছে, বেঞ্চি আছে, মাথার ওপর একটা ঢাকা আছে।

টেবিল ছিলো। দু পাশে বেঞ্চি ছিলো, মাথার ওপর একটা ছাদও ছিলো।

মাঝরাতে হৈচৈ! আতুকে নাকি তার মা পাচ্ছে না খুঁজে। বুকের ধারে মেয়ে ছিলো। কোথায় গেল সে। চারধারে পশু। আলো নেই। আলো বা আগুন ছাড়া বনে থাকা সদ্য মৃত্যু। তাড়াতাড়ি জর্জ এলো তার নিজস্ব হ্যামক ছেড়ে। সে ছিলো দুটো গাছের ডালে ঝুলে। তার হাতে টর্চ। আতু গড়িয়ে পড়েছিলো পায়ের ধারে একটা দেয়াল ঘেঁষে। গড়িয়ে গড়িয়ে একটা বড় পাথরে আটকা পড়লেও খুব ঘুমুচ্ছিলো।

এখনও লীলা বলে, জীবনে অমন ভয় কখনও পাইনি।

নিজেকে দিয়ে মায়ের ততো ভয় নেই, সন্তানকে দিয়ে যতো।

পরের ভোর।

শেষ রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তখন সব ঝকঝকে ফর্সা।

সেই পাহাড়ী মালভূমি যেন কেউ ধুয়ে রেখেছে। চারধারে সম্পূর্ণ অপরিচিত

এক নগ্ন পৃথিবী। তার গাছে, ঘাসে, শাখায়, রঙে একেবারেই অন্য চেহারা। বোরাইমা পাহাড়ের তলা; পাকরাইমার ওপর। পৃথিবীতে বোরাইমায় কেউ বেয়ে ওঠেনি আজও। সম্প্রতি যারা 'উঠেছে' তারা প্রকৃত 'নেমেছে', ওপর থেকে হেলিকপটারে।

নৈলে বোরাইমা অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডই শুধু নয়, পৃথিবীর অতি প্রাচীন ভূখণ্ডের অন্যতম। যুগে যুগে পাথরে জলে যে সংগ্রামের ফলে মাটির অবক্ষয়, সেই অবক্ষয় থেকে বেঁচে আছে এই একটা চৌকস খাড়া-দেয়ালী ভূখণ্ড। আদি ধরিত্রীর অক্ষত ত্বক এইটুকু মাটির গায়ে আজও লেগে। কাজেই যদি প্রাগৈতিহাসিক কালের কোনো জীব জগৎ বিধ্বংসী বিপৎপাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েও থাকে, তাদের আশ্রয় ঐ বোরাইমা পাহাড়।

তাই কোনান্ ডয়েল 'লস্ট ওয়ালড''-এর একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে উপন্যাস লিখলেন, তার পটভূমি করে দিলেন বোরাইমা পাহাড়।

তার তলার বন। এ বনে পরিচিত উদ্ভিদ জগতের কোনো চিহ্ন নেই। এদের শারীর-কোষের মধ্যে কোনো বিবর্তন সাধিত হয়নি। এরা বিবর্তনবাদের স্থান-মাহাত্ম্যতে আলোড়িত হয়নি, প্রাণ সংঘাতে ক্লিষ্ট হয়নি। এরা নিজেদের দুনিয়ায় বেঁচে আছে নিজেদের শক্তিবলে।

ভোরের দিকে নিত্যকৃত্য সেরে পাতায় করে জল নেবো। ডাঙ্গস ডাঙ্গস পাতা দেখে খুশী। যেই ছিঁড়তে গেছি সে পাতা মনে হলো যেন ইস্পাতের পাতা। বিশাল বিশাল পাতা—দেখতে যেন ভুঁই চাপা গাছ, কিন্তু পাতাগুলো ঠিক তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট চওড়া। স্পর্শে একদিক যেমন করাত, কিংবা উকো, অন্য দিক তেমনি স্রেফ কেঠো তামা। হাত দিয়ে ছেঁড়ার কথাই ওঠে না।

যে সংঘাতের ফলে ক্যাকটাস তার সরসতা সত্ত্বেও কর্কশ সেই সংঘাতই এ ভূমিভাগের আদি এবং অবিবর্তিত ইতিহাস। গত দুদিন যাবৎ কেবল বন আর বন দেখেছি। বাজী ফেলেছি, 'জনি গাছটার ডগা দেখতে পাও?' পায়নি জনি। বারোটার রোদে ফোটো তুলেছি, কালো ভূত! দেখেছি ওকোতিয়া রোড়িঘাঙ্গ (গ্রীনহার্ট), কায়াপা গুয়ানেন্সিস্ (ক্রাবউড্); এপেরুবা (ওয়ালাবা); মোরা একসেলসা (মোরা); —ব্রিটিশ গায়ানা টিম্বারর্স লিমিটেডের অতুল সম্পদ। কিন্তু এ কোন রাজ্য যেখানে ঘাস তারের মতো; ফুলের আঘাতে মূর্ছা তো দূরের কথা মৃত্যুও অসম্ভব নয়; এক-একটা পাপড়ি যেন কাঠের কাজের সঙ্গে করাতের মতো ধার।

হঠাৎ দেখি জনি আসছে। চোখে ভয়।

কী হলো!

ওরে বাস রে! আমি একা গিয়েছিলুম ঐ জলপ্রপাত দেখতে। সে.পারা যায় না; পালিয়ে এলাম। বাস্রে।

আমাদের সে বিষম হাসি।

জলপ্রপাত দেখে ভয় পেয়ে পালালে?

ওরে বাস রে !···যাই বলো ! সে ভয়ানক ব্যাপার !

মাখনলাল নেই। সে আবার গেল কোথায় ?

বেশ দ্রুতপদে শ্রীমান মাখনলাল আসছে। তারও ভাবগতিক ভালো নয়। এসো এসো, চা খাও। কায়চুর প্রপাত দেখতে যেতে হবে। কতদূর ?

মাখন বলে, পাঁচ মিনিটের পথ !

তোমার গলা শুকুচ্ছে কেন !

মানে—সবাই মিলে না গেলে সে একা একা দেখার যোগ্য ব্যাপার নয়।

আমরা জোরে হাসতে থাকি ! কেন হে ? তুমিও ভয় পেলে নাকি ?

মাখন বলে, ভয় ঠিক নয়। তবে সত্যি কথাই বলবো ; চলো একসঙ্গে।

গিয়ে বুঝতে পারি ভয়ের কারণ !

পোটারো নদীটা চওড়ায় এমনিতে শ' তিনেক ফুট। কিন্তু বর্ষাকালে সাড়ে চারশো ফুট চওড়া। পুরো নদীটা লাফিয়ে পড়ছে সাড়ে সাতশো ফুট গভীরে। সেই শব্দের কথা কথা কথাই। বোঝানো যায় না। সে গহ্বর দেখতে গেলে বুকে শুয়ে দেখার চেষ্টা করা চলে, দেখা অসম্ভব। অনবরত জলের ধারা পড়ছে। ধোঁয়ার মতো জলকণায় হাঁড়িটা ঢাকা ; অনেক তলায় সুতোর মতো পোটারো বন চিরে চলে যাচ্ছে তিন মাইলে ৮১ ফুট নেমে। নদীর বেগ খরতর। সর্বদাই জলকণার মেঘ। রোদ পড়লেই প্রপাতের এপার ওপার জুড়ে অতি-বর্ণিত অতিরঞ্জিত এক ইন্দ্রধনুর হার। আমি পরে নায়াগ্রা দেখেছি। সজ্জিতা, নায়িকা, রূপলাবণ্যবতী গণিকা। সদাক্ষিণ তার সান্নিধ্য, তিনি শুল্কপণ্যা ; পদে পদে অর্থব্যয়। এ যেন অন্তঃপ্রস্তরবর্তিনী সূর্পণখার সহগোত্রিণী। এর সাজে-সজ্জায় নাগকন্যা উলূপীর আদিম ভঙ্গিমা, লাবণ্যবতী হিড়িম্বার বন্য উদ্‌ভ্রান্ততা ; এ যেন বনেচরাণাং বনিতাসখানাং বিদ্যাধর-কিন্নরশোভা নয়—একটা আরণ্যক, দুর্বার, হিংস্র, আদিম রূপ যা শুম্ভ-নিশুম্ভের মতো দানবকেও আহ্বান করেছিলো বীর্যবান সংঘাতের অঙ্গনে।

আমি ধীরে ধীরে নেমে যাই প্রস্রবণের বুকে পা রেখে। একটু পা হড়কালেই সমাধি। 'বুড়োর জল' বলে একে আরাওয়াক বন্যরা। তারা জীবন্ত বৃদ্ধকে শেষ দশায় নৌকোয় ছেড়ে দেয় এই স্রোতে। সলিল সমাধি হয়। সেই তাদের গঙ্গাযাত্রা। ভগত বলে, না-না, ও পথে নয় দাদা। আমি ততক্ষণ মাঝের পাথরের চট্টানে দাঁড়িয়ে। গোরাকে, গোরার মাকে এনে বসালুম। ওরা ছবি নিলো। দেখা হলো কায়চুর।

তবু দেখা হয় না। মনে হয় যেন এই মাতাল-করা শব্দগহনে ডুবে যাই। মনে হয় এই ভীষণ কান্তারের একাঙ্গ হই। মনে হয় নেমে যাই খড্ডে। জলের ধারা ধনুকের মতো ফুলে নামছে। তার পেছনে মহৎ গহ্বর। সে গহ্বরে বড়ো বড়ো কাঁকড়া, যুগান্তকালীন বাদুড় ; জল-অজগরের পাল, আর পাখির দল। মনে হয় সে-সব গহ্বরের দেয়ালে আঁকা আমেরিন্ডিয়ান শিল্প। সে সব গহ্বরের শ্যাওলায় সঞ্চিত অদ্ভুত জীবনীশক্তি। হাতছানি দেয় অজানা। মনে হয় যদি একা আসতুম ছ'মাস থেকে

দেখতাম রাতে দিনে কায়চুরের রূপ। কবিতা লিখতুম গায়ানা কেন, সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বহুখ্যাত কবি আর্থার সীমুরের মতো :

Jump from above to below ! heaven to earth life
To death, innocence to guilt is the fine quash of spirit,
Very fine and ground to streamers of clouds,
and deposit of mists.
Like a warning that something in still not present,
Or substantial...

ফিরেছিলাম সেই দিনই।

ফেরার সময় দেখেছিলাম চড়ার সেই পথ, দেখেছিলাম সেই সর্বনাশের পদক্ষেপ চিহ্নিত শৈবালে আচ্ছন্ন মসৃণ শৈল-পিণ্ডের অঙ্গাঙ্গী অবস্থিতি। নামতে নামতে একটা বিশাল বাটিতে আছড়ে পড়া জলধারা দেখে সকলে লাফিয়ে পড়লো জলে। খুব হুটোপাটি লেগে গেলো। তুকাইতে এসে দুপুরের খাওয়া সারা হয়ে বেরুতে বেরুতে দুটো বেজে গেলো।

তুকাই৩ পার হয়ে যেই শেষ নৌকোয় চড়েছি ঝড় জল এল সঙ্গে। সেই তিরপল তুলে দেওয়া হলো বাঁশের বাঁখারিতে ঢাকা নৌকোয়। হঠাৎ তিরপলের ভারে নৌকোর গলুই গেলো ঘুরে, জোরে পাক খেলো নৌকো, টাল খেলো একদিকে। গলগল করে ঢুকতে লাগলো জল। জোয়ান জোয়ান মানুষগুলো তিরপলটা সরিয়ে বালতি, প্যান, কাপ যা ছিলো সব দিয়ে জল কাটে, সেঁচে আর সেঁচে—কাটে। হাত ধরে যায়, নিরুপায়! নদীর বুক পাথরে ভরা। পাইলট চেঁচাচ্ছে। শক্ত হয়ে উঠেছে জর্জের চোয়াল। মোটরটা বেয়াড়া শব্দ করছে। মোটরে জল ঢুকেছে। ক্রমাগত মিসফায়ার করছে। অন্ধকার চেপে এলো। নৌকো তখন স্রোতের দয়ার নির্ভর। গতিবেগ নেই। অন্ধকার নামছে। কাঙ্গারুমা অনেক দূর। একটা পাথরের গায়ে নৌকো ধাক্কা খেতে যায়। লগী দিয়ে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে চলা। লগী গেলো ভেঙে। আর লগী নেই।

তীর দিয়ে চলো।

তীর কই! বিশাল বন ছেঁকে আছে তীর। ঝুঁকে আছে গাছপালা। আর—

যদি সেই গাছপালার ওপরে জড়িয়ে থাকে একটা লাবারিয়া বা র‍্যাট্‌ল! সাপে ভর্তি ডাল!

জর্জ বলে, এ নদী আমার মা। কিছু হবে না।

হলো—

মোটর থেমে গেলো।

বেগে নামতে লাগলো নৌকো।

জল চাঁছা চলছে। মৃত্যুপণ করেও চলছে।

বুঝতে পারছে হয়তো লীলা। বুঝছে কিনা বোঝা যায় না। শান্ত সে। বুঝছে না গোরা। আতু ঘুমুচ্ছে।

ঘ্যাঁস্ করে অন্ধকারে নৌকো ঢুকে গেলো ঝোপে।

টর্চ জ্বললো।

জর্জ বললো, আমরা কাঙ্গারুমার মুখ হারিয়ে আরো বেরিয়ে এসেছি।. উজান যেতে হবে, বেশী দূর নয়।

তা নয়। কিন্তু উজান চলার উপায় কী। মোটর চলছে না; দাঁড় নেই; লগি ভেঙে গেছে।

দড়ি বেঁধে জর্জ লাফালো জলে।

কারমাইকেল বললো, ইলেকট্রিক ঈল্।

জর্জ বললো, এ নদী আমার মা। এর সব মাছ আমার ভাই।

তাই হয়তো ঠিক।

নৈলে কাঙ্গারুমার ঘাটে লেখা 'জলে নেমো না'; অথচ জর্জ আমাদের এনে লাগালো কাঙ্গারুমার ঘাটে।

সেই বেনাব।

কিন্তু হায়, সে বেনাব নয়।

বেনাব ভর্তি পিঁপড়ে। নিদারুণ পিঁপড়ে।

বুনোরা খাওয়াদাওয়া সেরে আগাগোড়া বালিতে আগুন ছড়িয়ে যায়। খাদ্যাবশেষ সব নিঃশেষে জ্বলে যায়। তাই ছাই ছড়ানো।

আমরা সভ্য। তা করিনি।

ফলে পিঁপড়ে। ব্রিটিশ গায়ানার পিঁপড়ে তিন ইঞ্চি। এক রাতে মা এবং সন্তানকে খেয়ে হাড় ফেলে রেখেছে একপাল পিঁপড়ে। বনপথে চলে গেছে রাতে একপাল পিঁপড়ে, সকালে মনে হয়েছে পাঁচ-ছ মাইল পথে জঙ্গল কেটে গেছে কারা! ভিনসেন্ট রথের 'জরীপ' বইয়ে এ সব ঘটনা লেখা আছে।

জীপ এবং খাদ্য আমেরিন্ডিয়ান গ্রামে।

ফারুক, ভগত এবং নিজাম চলে গেলো।

আমি উধোকে বলি, স্টোভে গরম জল চাপাতে। কেবল কফি গুলে নুন দিয়ে দিলাম। আমি খেতে লাগলাম। লীলা 'ম্যাগগো' শব্দে ত্বরিৎ মুক্তি পেলো। উধো গুরুরচনে সে কালকূট গলাধঃকরণ করে পরজন্মের স্বর্গপথ রচনা করতে ব্যস্ত হলো; জ্যানি ভদ্রভাবে 'বেশ তো! বেশ তো!' বলে খেতে লাগলো। মাখনলালই মাৎ করলো। সে একেবারে চোঁ।

আমি অবাক।

মাখনলাল বলে, আমার গিন্নীর বাক্যধারা পান করে করে জিভে আমার এ সব তেতো ল্যাগেই না।

আজও মাখন বলে আর হাসে।

ও কী মানুষের খাদ্য না পানীয়! বিষ, বিষ। দাদার নেহাত ভারতীয় জিহ্বা তাই। প্রাপ্তিমাত্রে আমি কাপকে কাপ বালিতে ঢেলেছি। অন্ধকার ছিলো তাই রক্ষে।

কিন্তু সেই গরম জল, নুন এবং কফি ছিলো তাই সেই রাতেও উধো উনুন জ্বালালো, জনি যোগাড় দিলো, লীলা খিচুড়ী এবং আচার দিলো। আমরা গোগ্রাসে ভক্ষণ করলুম।

জর্জ টাউনে যখন পেঁাছেছি সবাই দেখে আর বলে, কোনটিকি এক্সপিডিশন করে এলে নাকি? কী সব চেহারা হয়েছে?

চার বছর পরে যখন দেশে ফিরেছি সারা করেণ্টিন কেঁদেছে। লীলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ওদের বন্ধন ছিলো এমনই নিবিড়। এদের কথা বলতে সাধ হয়। কতো মানুষ! কতো অভিজ্ঞতা! সে সব আশ্চর্য, জীবনকাহিনীর মতো রসদীপ্ত, এ রক্তের মতো জীবন্ত।

দাঁড়িয়ে আছে টাগোর মেমোরিয়াল কলেজ; করেণ্টিনের গর্ব। ছাত্রসংখ্যা ৯০০ যখন এদেশে ৩০০ ছাত্রের কলেজ এ্যালবিয়ন, রোজহল, স্কেণ্ডনকে বলা হতো বড় কলেজ।

ডঃ জগনকে CIA পদচ্যুত করলেও আজও তিনি জনগণের মনের মানুষ; শ্রদ্ধেয় বিরোধীদলের নেতা। যখনই যাই গায়ানায় আদর করে নিয়ে যান। বার্নাসও ভোলেননি।

কিন্তু গায়ানায় যেন কী নেই। কী যেন সে হারিয়েছে।

নাকি আমার চোখের আলোই ম্লান হয়ে এলো?

হেইতী

ক্যারাবিয়ানে আসার আগেও যদি কোনও একটি দেশ দেখার আকুল বাসনা আমার হয়ে থাকে, সে দেশটি হেইতী।

কেন?

তার কারণ হেইতির ইতিহাস, ভূগোল এবং চরিত্র। এই তিন ভাগেই আমি হেইতীর কথা বলবো। কেবল এই হেইতীর বেলাতেই আমি বৃত্তান্তটাই বলবো; ভ্রমণ এখানে গৌণ। হেইতী ভ্রমণের দেশ নয়। এখানে ভ্রমণরসিকরা আসেন না; হেইতীও চায় না যে তাঁরা আসুন। হেইতী একটি অপূর্ব বিচ্যুতি, বিস্ময়কর অভ্যুদয়—সাধারণ ক্যারাবিয়ান ধর্ম থেকে একেবারেই ব্যতিক্রম।

হেইতীতেও আগাগোড়া নিগ্রো। নিগ্রো রাজত্ব; এবং এ রাজত্ব, খোলা তলোয়ার হাতে, নেপোলিয়ানের হাত থেকে হেইতী যুদ্ধ করে জিতেছে।

সেইজন্য হেইতী আসায় আমি নিজেকে সার্থক মনে করি। বিদেশী স্বার্থপীড়িত ভারতের নপুংশক অহিংসবাদীর অবচেতনিক বুভুক্ষার তৃপ্তি নয় তা। হেইতী আমার সতীর্থ; জ্ঞাতি। সর্বকালের বিদ্রোহী। জুলুমবাজীর বিপক্ষে গণতান্ত্রিক বিদ্রোহী।

১৪৯২ খ্রীস্টাব্দ। অক্টোবর মাসের সাতাশ তারিখ। পাহাড় দেশের পাহাড়ী ছেলে কলম্বস্ দেখলেন 'হেইতী'; "এই তো স্পেন, এই তো স্পেন"—আনন্দে আত্মহারা কলম্বস চিৎকার করে ওঠেন। পূর্ব পশ্চিমে বিস্তীর্ণ দ্বীপ। নাম দিলেন হিস্পানিওলা। উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজটা ক্যুবা এবং হেইতীর মাঝে! ক্যুবা থেকে সেই দেশে ফিরছেন কলম্বস। সামনে উত্তর-পর্বত,—"massif du Nord"—, পিকো-দুয়ার্তে চূড়া ১০২০০ ফুট উঁচু। ৯000 ফুটের পাহাড় বহু। পাহাড়ের গা ভর্তি গভীর বন। কলম্বস জাহাজ নিয়ে ঢুকতে গিয়ে ছোট্টো দ্বীপ তর্তুগার কাছাকাছি একটা রীফে একটি জাহাজ খোয়ালেন। ফলে কিছু স্পানীয়কে রেখে গেলেন। আরাওয়াকরা তাদের নিশ্চিহ্ন করলো। এ দ্বীপের শাসক হলেন কলম্বাস ভ্রাতা বার্থোলোনী। আরাওয়াকদের উপদ্রব ছেড়ে তিনি শহর গড়লেন সাঁ-দোমিঙ্গো (San Domingo)। পুব-দিকের অংশের দক্ষিণে সেই শহর বর্তমান ডমিনিকান রিপাব্লিকের রাজধানী। [মাঝে নাম হয়েছিলো 'ত্রুহিলো'; কেন হলো কেন ঘুচলো—পরে বলা যাবে। এখন এক দ্বীপ হিস্পানিওলার দুটো ভাগ; এক ভাগ কেবল নিগ্রো: হেইতী; অন্য ভাগ কেবল স্পানিশ: সান্দোমিঙ্গো।] ১৫00 খ্রীঃ থেকে সাঁ-দোমিঙ্গোর রবরবা। কলম্বস-তনয় দীগো কোলো তখন গবর্ণর। গবর্ণর কেন, ভাইসরয়। সদ্য সদ্য বিয়ে করেছেন রাজা ফার্দিনান্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী সুচরিতা সুন্দরী ডনা-মারিয়া-দা-তলেদো-এ-রোজস্‌কে।

সে তখন স্পেনের স্বর্ণযুগ। ক্যাথিড্রাল, বাজার, স্কয়ার, প্রাসাদ কেবল গড়ো আর গড়ো। সাঁ-দোমিঙ্গো যেন নতুন স্পেন। ঔপনিবেশিক স্পেনের ইতিহাসে ডাঙ্গর ডাঙ্গর, হাঙ্গর, নাম—দীগো-ভ্যালাৎকোয়েৎ, হার্নান্দো কোর্তেজ্, পঁয়্-দ্য-লিয়ঁ, এলোঞ্জো-দ্য-ওজেদা, ভাস্কো ন্যুনেজ্, ফ্রান্সিস্কো পীজারো। পর পর এরা সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে উন্নত সভ্য সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য বর্বর বলপ্রয়োগে তছনচ করে দিয়েছে। এরা প্রত্যেকে সান্দোমিঙ্গোর বন্দরে নোঙ্গর ফেলেছে। সান্দোমিঙ্গোর পথে ঘুরে ঘুরে জীবনরসের মদিরায় অধীর উচ্ছল হয়েছে।

তখন সান্দোমিঙ্গো জানেনি তার এই ক্ষণস্থায়ী অতিথিরাই তার জীবন যৌবনকে ম্লান করে দেবে। পর পর তারা যখন বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললো—সেই ইন্কা, আজটেক সভ্যতার সোনা-রুপো-মণি-মাণিক্যে স্পেন যখন পৃথিবীর সেরা দেশ হয়ে উঠলো, তখন সেই প্রভার কাছে ম্লান হয়ে গেলো ক্ষুদ্র হেইতী, ক্ষুদ্রতর সেই সান্দোমিঙ্গো।

ফলে ১৫৮৬-তে যখন স্যর ফ্রান্সিস ড্রেক চড়াও হলো সান্দোমিঙ্গোতে, তখন সান্দোমিঙ্গো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মারই খেয়েছিলো। দুয়োরানীকে বোম্বেটে মারছে। কেউ আসেনি সাহায্য করতে। স্যর ফ্রান্সিস্ শহরের ধনীদের তলব পাঠালেন এককালীন এক লক্ষ পাউণ্ডের সোনা-রুপো তাঁকে দেওয়া হোক। নৈলে—

কে দেবে এক লক্ষ পাউণ্ডের সোনা !!

ইতিমধ্যে চললো ড্রেক-এর জুলুম !

প্রতি দশ মিনিট অন্তর এক-একটা দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে সোনার অঙ্কের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। প্রতি দশ মিনিটে এক হাজার পাউণ্ড আরও।

দুর্ধর্ষ বোম্বেটে ছিলেন ফ্রান্সিস্ ড্রেক। স্যর ফ্রান্সিস্ ড্রেক—স্পেনের বিশাল পোত-বাহিনী 'আর্মাডা'র রাহু-কেতু-শনি সেই ফ্রান্সিস্ ড্রেক।

পুরোতে পারেনি সান্দোমিঙ্গো সেই দাবী। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সান্দোমিঙ্গো। অতো পুরনো, অতো উজ্জ্বল, অতো সমারোহ-পুষ্ট সান্দোমিঙ্গোতে প্রাচীন কীর্তিকলাপ ধ্বংস হয়ে গেলো মানুষের খেয়াল-খুশির তাণ্ডবে। পেলীর অগ্নিবর্ষায় একদা মার্তিনিকের সেণ্ট পিয়েরে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, আমরা জানি। (ক্যারাবিয়ানের সূর্য : ১ম খণ্ড)। কিন্তু সে ধ্বংসও সেই মোক্ষম নিশ্চিহ্নতার হাত বুলোয়নি সেই অভিশপ্ত শহরকে যেভাবে সভ্য ইংরেজ স্যর ফ্রান্সিস ড্রেকের পৈশাচিক ধনগৃধ্নুতা নিশ্চিহ্ন করেছিলো সান্ দোমিঙ্গো নামক আশ্চর্য নগরীকে।

১৫৮৩-র এক বিধুর সন্ধ্যা। আগুনে আগুনে এককালের শান্তকারীর আকাশ লাল। চারদিন ক্রমান্বয়ে জ্বলে সে লেলিহা যখন ক্লান্ত, শহর সান্দোমিঙ্গো তখন এক ভস্মস্তূপ।

নিজে ড্রেক তখন উত্তরের ক্ষুদে দ্বীপ তার্তুগায়, বোম্বেটের স্বর্গ তার্তুগায়, পানাহারে মত্ত। তার্তুগার নারী-বিপণিতে সান্দোমিঙ্গোর অভিজাত সুন্দরীরা অনাবৃতা হয়ে খোলা বাজারে পণ্য। নীলামে ডাক হচ্ছে তাদের।

এবং—এটাই লক্ষণীয়—এই সব দস্যুদের লাভের অঙ্ক দিয়ে সাজিয়ে বড়ো বড়ো ভেট চড়ছে তীর্থে তীর্থে, চার্চে চার্চে। বিশপদের আশীর্বাদ অব্যর্থ, অকুণ্ঠ।

তার্তুগা সেকালের বোম্বেটেদের আম-বাজার ছিলো। সারা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ক্যারাবিয়ান সাগরের জাহাজ লুঠ করা সোনা-জহরৎ-মদ এবং সুন্দরী রূপসী এই তার্তুগায় হাত বদল হতো। তার্তুগায় দামালপনার ইতিহাস ফরাসী সাহিত্যে বারবার মাথা উঁচু করেছে। বুকানীয়ার ইতিহাসের মক্কা দিল্লী এই তার্তুগা।

সেই বুকানীয়ররা অবশেষে তার্তুগা ছেড়ে হিস্পানিওলা দ্বীপের আসল দেহেই কামড় বসালো। সেই থেকে সাড়ে তিনশো বছর যে দুর্বিপাকের পর দুর্বিপাকে হেইতী গোঁত্তা খেয়েছে, তার আরম্ভ তার্তুগার কুখ্যাত ফরাসী বুকানীয়রদের দিয়েই! তারা এসে হেইতীর উত্তর খণ্ড দখল করে বসলো। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে রিজ্ইউকের সন্ধিতে স্পানিশ হিস্পানিওলা ফরাসী সাঁ-দমিঙ্গো হয়ে গেলো। চতুর্দশ লুইয়ের সাম্রাজ্য-পিপাসা ক্ষান্ত হলো হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া এবং স্পেনের মিলিত গ্রাণ্ড এ্যালায়েন্সের দাপটে। ফরাসী বুকানীয়রদের ডাকাতি করা হিস্পানিওলা ফরাসীদের হাতেই বিধিবদ্ধভাবে সমর্পিত হলো।

দেখতে দেখতে হিস্পানিওলায় ফরাসী প্রভাব শেকড় গেড়ে বসলো। পশ্চিম খণ্ডটার নাম সেণ্ট ডমিনিকান, বর্তমান হেইতী। উর্বর, সমৃদ্ধ। এইটার ওপরেই ফরাসীদের জোর কামড়। পূর্ব অংশ সান্দোমিঙ্গো নগরীর নামে সান্দোমিঙ্গো।

চিনি এবং দাস বাবসায়ের দৌলতে ফরাসী ধনিক-বণিক কী পরিমাণ সমৃদ্ধি যে এককাট্টা করেছিলো, আজ ভাবতে গেলে বিস্ময় লাগে। হায়, তখন বাধলো ফরাসী বিদ্রোহ। বিদ্রোহের খবর অতলান্তিকের পারে এসে পেঁছুলো। দাসেরাও ধ্বনি তুললো লিবার্তি, এগোয়ালিতি, ফ্রাতার্নিতি। কিন্তু দাসেদের ভূতো-মুখে এ রামনাম কোন্ শাদা শুনতে চায়? দমন নীতি আরম্ভ হলো।

তখনই আরম্ভ হলো আসল হেইতীর আসল মহাভারত-গাথা। দাস বিদ্রোহ; দাস-জন-জাগরণ; দাস-বিজয়; দাস-সাম্রাজ্য। হাজার বছর আগে স্পার্টাকাস রোমে যা পারেনি—হেইতী তা পেরেছিলো।

সে কাহিনী শোনার মতো।

ফরাসী বিদ্রোহের সংবাদ হেইতীতে এলো। দাসেরা তাদের দাবি যাদের দরবারে পেশ করলো হঠাৎ তারা সারা বিদ্রোহকেই নাকচ করে দিয়ে পরম ভাগবত রাজানুধ্যায়ী সাজলেন। নিগ্রোদের মধ্যে কিন্তু বিপ্লবের তাত ধোঁয়াতে লাগলো। বুকমান্ ছিলো জ্যামায়কান নিগ্রো। শালপ্রাংশু চেহারা। জাঁদরেল লোক। জাঁদরেলী শাণিত হয়েছিলো "ভূদু"-তন্ত্রের নিশাচর-পুরোহিত খ্যাতিতে। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে বুকম্যান চুপি চুপি ঝাণ্ডা খাড়া করলো আফ্রিকার প্রেস্টার জনের মতো। শত শত নিগ্রো বনের গহনে রাতে জমা হতো। শত শত যখন সহস্রে পরিণত হলো তখন এক রাত্রে কয়েকটি শ্বেত-শূকর বলি দিয়ে তাদের তাজা রক্তে স্নান সেরে সেই রক্ত পান করে এবং করিয়ে, শপথ গ্রহণ করা হলো শ্বেতকায় নিধনের। দেখতে দেখতে হেইতীর উত্তরদিকের ভূখণ্ডে পর

পর প্রাসাদ জ্বলে যেতে লাগলো। শাদা দেখলেই ধরো; জবাই করো। উত্তরদিকের শাদা প্রায় মুছে গেলো।

কিন্তু নিগ্রোরা দিনে দিনে শিখেছিলো এই সব সভ্য-শাদাদের কাছে নানাবিধ হত্যার মিষ্টি স্বাদ। এখন সেই সব বিধির প্রয়োগ তারা চুটিয়ে করতে লাগলো। করাত দিয়ে রমণীদেহ নাভি থেকে দুখানা করে কাটা; নারীর দুটি স্তন কেটে দিয়ে তার ওপর পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়ে উল্টো মাথা করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া; গাছের সঙ্গে কষে বেঁধে দু হাত দু পা চারটে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে বেগে চারটে ঘোড়াকেই চারদিকে ছুটিয়ে দেওয়া ইত্যাদি মনোরম ব্যাপার। (গায়ানার জনস্মিথ ঘটনা স্মরণীয়)।

ক্ষেত-খামার, বাড়িঘর, বাজার-হাট এমন রেটে পোড়ানো হয়েছিলো বারমুদা দ্বীপের লোকেরা অবাক হয়ে ভেবেছিলো হেইতীর আকাশ অতো লাল দেখায় কেন রাতে? ইতিহাস নজীর দেখিয়ে সাক্ষী দেয় যে নিগ্রোরা কুপিয়ে কুপিয়ে এমন হয়ে গিয়েছিলো, মনে হতো লাল রংয়ের মোজা আর দস্তানা পরে আছে। দক্ষিণবাসীরা হঠাৎ যখন জেগে উঠলো, দেখলো, সারা উত্তরের নিঃশ্বাস থেমে গেছে। কেবল জঙ্গল পোড়ার শব্দ। মাঝে মাঝে আতঙ্কপ্রদ শঙ্খধ্বনি।

দিল্লী কলকাতার পথে এমন ঘটনা দেখা এবং শোনা যায়নি তা নয়। সে সব স্মৃতি আজও ছটফট করে। ঠিক তেমনি সব কাহিনী এই দুর্বিপাকেও শোনা গেছে। পরম ভক্ত চিরকালের পুরাতন ভৃত্য বদান্য প্রভুর পরিবারকে প্রাণের মায়া ছেড়েও নিরাপত্তার বুকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ঘাতক পুত্রের হাত থেকে তরুণী প্রভুকন্যার জীবন রক্ষাকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিগ্রো মা নিজে প্রাণ দিয়েছে। যে নিগ্রো রমণী ধর্ষিতা হয়েছে বেপরোয়া প্রভুপুত্রের হাতে তাকেই রক্ষা করতে দেখা গেছে প্রভুপুত্রবধূর ইজ্জৎ।

প্যারিস থেকে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে সংবাদ এলো ন্যাশন্যাল এ্যাসেম্বলী সকলকে সমান অধিকার দিয়েছে। কিন্তু তখনও হেইতীর ফরাসীরা দমন নীতি চালাচ্ছে, সে অধিকারের কথা চেপে গিয়ে।

ডামাডোলের সময়। দক্ষিণ থেকে স্পানিশ সৈন্য তেড়ে আসছে। সেনাপতি নিগ্রো। নাম তুঁসা। বিদ্যুৎগতিতে বাহিনীর চলাচল পলকে পাল্টে দিয়ে শত্রুপক্ষের জিতকে পরমুহূর্তে হারে পরিণত করার কৌশলে মুগ্ধ জনতা তার নাম দিলো ওভারত্যুর। নিগ্রো বীরের নাম হয়ে গেলো তুঁসা-লু-ওভারত্যুর।

ওদিকে দক্ষিণে সমুদ্রতীরে এবং পশ্চিমেও ইংরেজরা নেমেছে বিদ্রোহ-বিপন্ন হেইতীর মাংস ছিঁড়ে খেতে।

কিন্তু যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে! তুঁসা-লু-ওভারত্যুর অসাধারণ সেনাপতি। হেইতী থেকে প্রতিটি শাদাকে তাড়িয়ে তবে সে ছাড়লো। পর পর যুদ্ধের পর যুদ্ধে শাদাদের হার হলো। স্পানিশ প্রভুরাও গা ঢাকা দিলেন।

•

তুঁসা-লু-ওভারত্যুরের বাপ সবে এসেছিলো আফ্রিকা থেকে। গিনী-কোস্টের বিখ্যাত রাজা আরাদার গাউ গিনো তুঁসা-লু-ওভারত্যুরের পিতামহ। স্থানীয় ট্যাশদের সে

একটাকেও রেহাই দেয়নি ; আস্‌লি ফরাসী যারা তারা দিলো রড়। সা-দমিঙ্গোতেই প্রথম বিদ্রোহী নিগ্রো জনতা প্রথম উপার্জিত স্বাধীন পতাকা ওড়ালো। আজও হেইতী নিগ্রো দেশ। (নামেই ! হেইতীর স্বাধীনতার বাঁশী বাজে ; বাঁশীটি ডলারের, ফু-টি আমেরিকার ; টেপাটোপ আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জের ; সুরও মার্কিনী ; কেবল ঠোঁটটি কালো ; দম ফুরিয়ে এসেছে।)

তখন তুঁসা আরম্ভ করলেন তাঁর দক্ষিণমুখী অভিযান। স্পানিশদের এলাকায় ঢুকে তুমুল বিক্রমে বাহিনী পরিচালনা করে সান্তো-দোমিঙ্গো রাজধানীতে পোঁছুতে না পোঁছুতে স্পানিশ গবর্ণর শহরের বাইরে এসে মখমলের বালিশে শহরের চাবি নিয়ে হাঁটু গেড়ে তুঁসাকে সমর্পণ করে তবে শহর রক্ষা করেন। একেই বলে জিসকা লাঠি উসকা ভৈঁস।

অদ্ভুত ছিলো তুঁসার কার্যক্ষমতা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা এবং নীতিপরায়ণতা। সমগ্র দেশের শাসন ব্যবস্থার নিখুঁত বন্দোবস্ত করলেন তুঁসা। সামান্যতম আলস্য, ঔদাসীন্য, নীচতাও কঠোর হাতে দমন করতেন তিনি।

তখনও হিস্পানিওলার নিগ্রো-স্বাধীন-রাজত্ব ফরাসী রাজত্বের অংশ। কিন্তু নেপোলিয়ন, উদার এবং মহৎ নেপোলিয়ন বোনাপার্টও কালা-আদমীর স্বাধীনতা সুনজরে দেখতে চাইলেন না। ভগ্নীপতি লেকলার্কের তত্ত্বাবধানে সত্তরখানা জাহাজে পঁচিশ হাজার ফৌজ পাঠালেন তিনি।

কিন্তু সেই সভ্য ধুরন্ধরেরা বুঝতেই পারেনি যে সর্বনেশে তুঁসার কথায় দলে দলে নিগ্রো মরণপণ করেও আঁটোসাঁটো সংগ্রাম করবে। পর পর যুদ্ধে মার খেতে লাগলো তারা। অবশেষে সন্ধি।

তুঁসা সে সন্ধি খোলামনেই স্বাক্ষর করলেন। ফরাসী তেরঙ্গা ঝাণ্ডার তলায়ই নিগ্রো হেইতী থাকবে, ফরাসী দেশের একাংশ হয়ে ; তবে রাজত্ব পরিচালনা ফরাসী শাদারা আদৌ করবে না ; সে ভার পুরোপুরি ফরাসী কালোরাই করবে।

শান্তি-সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। বিশেষ পান-ভোজনে আপ্যায়িত করা হলো তুঁসাকে। কাপ্‌-ফ্রাসা (অধুনা কাপ্‌ হাইতিয়া) শহরে তুঁসা এক বাটালিয়ন সৈন্যসহ নিমন্ত্রণ উৎসবে যোগদান করলেন।

…তারপর এক মাস যায়নি। নেপোলিয়নের নয়া আদেশ পেয়েছে লেকলার্ক। পুনশ্চ একদা ফরাসী জাহাজের ডেকে তুঁসাকে ভোজে আপ্যায়ন করা হলো। সে ডেক থেকে তুঁসা আর নামেনি। সে জাহাজ সোজা ভিড়েছিলো ফ্রান্সের বন্দরে।

সূর্যের দেশের সেই দামাল ছেলে জীবনে আর আলোর মুখ দেখতে পায়নি। তার বিচার হয়নি। তার নাম প্যারীর প্রথম কন্‌সালের উজ্জ্বল-নাচ-মজলিশে কেউ উচ্চারিত হতেও শোনেনি ; কোনো দরবারী তুঁসার নামও জানতে চায়নি। জেনেভা হ্রদের ধারে, চিরতুষারাচ্ছন্ন জুরা পাহাড়ের দুর্গম পাথুরে কারাগৃহের নিম্নতম প্রকোষ্ঠের অমান্ধকারে সূর্য-লালিত তুঁসা পড়ে থাকতো স্যাঁতসেঁতে মেঝেয়। ঐতিহাসিক বিস্মিত

হয়ে ভাবে সেই নয় মাসই বা কোন্ তাপে উতপ্ত হয়ে সূর্য-সন্তান মহাবীর তু'সা প্রাণ ধারণ করেছিলেন।

জুরার পাহাড়। চিরকালীন হিমাচ্ছন্ন পাহাড়। নিঃসীম অন্ধকারে মগ্ন কারা-গৃহ। মাঝে মাঝে কাতরানী শোনা যায়। মাঝে মাঝে আবেদন আসে। চিঠি যায় বদান্য সম্রাট নেপোলিয়নের কাছে। রাজার কাছে রাজার চিঠি নয়। বিদ্রোহী জননায়কের কাছে বিদ্রোহী জননায়কের চিঠি। রীতির কাছে নীতির চিঠি। কোথায় সূর্য! এক-মুঠো সূর্য দাও আমাকে। আর কিছু চাই না।

ফল? নেপোলিয়নের আদেশে তু'সার কাছ থেকে কাগজ কলম সরিয়ে নেওয়া হলো।

তবু আবেদন আসে। এবাব মেয়েলী হাতের লেখায় নির্বোধ ভাষা'র সকাতর নিবেদন। পতির প্রাণ যাচঞা করে পত্নীর নিবেদন। যশেফীন ক্রিওল-সুন্দরী। যশেফীনের কাছে আর এক সূর্য-কন্যার নিবেদন। দাস-ব্যবসায়িনী দুহিতা যশেফীন বুঝতেই পারতো না নিগ্রো আবার স্বাধীন হবে কী করে। তার আবাব আবেদন কী থাকতে পারে। বিদ্রোহের পর দাসের আবেদন? অর্থহীন।

শেষে চিঠি পেলো তু'সার অভাগিনী স্ত্রী। তু'সাকে নাকি মুক্তি দেবার উপায় নেই আর; তু'সা সম্রাটের অবসরের, সম্রাটের অনুমতির অপেক্ষা না করেই পৃথিবী ত্যাগ করেছে !!

এরও পরে তু'সার স্ত্রী অনেক কাল বেঁচে ছিলেন! নেপোলিয়ন তখন সেণ্ট হেলেনায়—যশেফীনের কথা স্মরণ করে তু'সার স্ত্রী বলতেন—"ও। কেন অমন হলো? আমি তো কখনও চাইনি আমাব মতো দুঃখ কোনো নারী কখনও পায! তবে কেন এমন হলো?

তু'সাব মৃতদেহ কোথায় পাওয়া গিয়েছিলো?

ঘরেব মধ্যে মৃত-চুল্লী।র রেলিংয়ে মাথা রেখে তু'সা শুয়ে আছে পাথুরে মেঝেয়।

ইসিহাস ভাবে, সামান্য শয্যা ছেড়ে চুল্লীর রেলিংয়ে মাথা রেখেছিলো কেন তু'সা? স্বপ্ন জেগেছিল আগুনের? মৃত্যুদীপ্ত চক্ষে কি সহসা সে প্রদীপ্ত হতে দেখেছিলো তার অগ্নিপিপাসার লোহিত স্বাক্ষর?

সূর্যস্নাত সেই ক্যারিবিয়ান সন্তান, আফ্রিকার অরণ্যের আর্তনাদে মুখর করে তুলেছিলো আত্মার আকাশ—তাপ! তাপ! জীবনতাপ! চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ সূর্য আত্মা। শুধু তাপ পিপাসার জর্জর হয়ে অগ্নিকুণ্ডে মাথা রেখে সেই দেবতাত্মা চিরসমাধিতে লয় হলো। হিমবাহ-শীতল, মৃত্যু-তুহিন জুরা শিখরের কারান্ধকারে তাপপিপাসু আত্মা নিঃশিখ অগ্নিকুণ্ডের ক্ষুধিত জঠরকে সাক্ষ্য রেখে চলে গেছে মর্ত্যভূমি ছেড়ে অমর্ত্য অবিস্মরণীয়তার চিরঞ্জীব তীর্থে। তু'সার স্বর্গে আদিগন্ত ভাস্বর সূর্য-ধার।

বিপ্লবী কবি-লেখক যারা বাথটবে লিখতে লিখতে প্রাণত্যাগ করলেন। বিপ্লবের শিল্পী দাভিদ সে চিত্র এঁকে রেখেছেন। কিন্তু জুরা পাহাড়ের অন্ধকারায় অগ্নিকুণ্ডের

হিমকোণে কৃষ্ণকায় এই বিপ্লবীর ছবি আঁকার মতো রং বিপ্লবী ফরাসী তুলিতেও ছিলো না।

আশ্চর্য লাগে ভাবতে ক্যারাবিয়ানের সূর্য যে নিগ্রোদের মুক্তি সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছিলো, সেই নিগ্রোরা পুনশ্চ দাসীকৃত হলো—আর কারুর নয়—নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অনুজ্ঞায়। কুখ্যাত কর্সিকান হীনচিত্ততা রাজপোশাকেও ঢাকা পড়েনি।

কিন্তু হেইতী হেইতী-ই!

তুঁসার পত্নী ফিরে এলেন। তুঁসার হাতে গড়া ভীমার্জুন সেনাপতির দল চমকে তাকালো! দেসালীন, ক্রিস্তোফ্, ক্রেবভো, পেতিয়ঁ, মরেপা—এক একটা দিক্পাল নিগ্রো নাম। নেপোলিয়নিক ইতিহাসে যেমন—বার্ণাডাট্, ম্যুরাট্, নে, মার্মো, দাভু, সুল্ৎ। গরম হয়ে উঠলো নিগ্রো রক্ত। আকাশের পানে তাকালো,—অতঃপর!

পীতজ্বরে তখন ফরাসী বাহিনীর অর্ধেকের বেশী শেষ। স্বয়ং লেকলার্ক ঐ জ্বরে মৃত। নেপোলিয়ন-ভগ্নী লেকলার্কের বিধবা, রাজ্ঞী কলিন তখন নিকটস্থ অন্য প্রাসাদে, সাঁ সুচীর কাছেই ব্রিটিশ জেনারেল হুম্বার্টের বাহুবন্ধ হয়ে পতিশোক উদযাপনে আলুলায়িতা। মরণের আগে কামড়ে গিয়েছিলো লেকলার্ক। এক ভয়ঙ্কর মর্মন্তুদ বীভৎস নোংরামি দিয়ে ম্লান করে দিয়েছেলো ফরাসী ইতিহাস। কিন্তু তাঁর উত্তর-শাসকটি সেই বিভীষিকাকেও তুঙ্গতর করলো যৌবন-সুলভ সূক্ষ্ম কারিগরীতে বিভূষিত করে। সুন্দর সুপুরুষ যুবা রোশাম্বো। কালোদের ঘৃণা করতো কালোতর ঘৃণায়। সারবন্দী নিগ্রোদের একসঙ্গে বন্দুক দেগে হত্যা করে অন্য নিগ্রোদের ভয় পাওয়াতেন তিনি। পথের দুধারে গাছের ডালে ফাঁসী লটকে মানুষের লম্বা-গলার মালা দোলাতেন তিনি। ফরাসী গিলোটিনের মহোৎসব লাগিয়ে দেলেন তিনি। ব্লাড হাউণ্ড লেলিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে নিগ্রো শিকার করে তৃপ্ত হতেন তিনি। স্মরণে থাকে এ সবই উদারনৈতিক নেপোলিয়নিক আমলে; যশেফীনের মা তখনও মার্তিনীকে নিগ্রোদাসের কারবারে টু-পাইস করছেন। ইতালীয়ন মধ্যযুগীয় নৃশংসতার কাহিনী ঐতিহাসিক হয়ে আছে রিমিনি-র মালাটেস্টার অপকীর্তির বিন্যাসে। তবু স্নিগস্মোন্দো মালাটেস্টা অন্তত একটি মেয়েকেও ভালোবেসেছিলেন। আজও চার্চ অব সেণ্ট ফ্রান্সিস সেই প্রেমের তাজমহল হয়ে আছে! কিন্তু অপূর্ব, অনুত্তর হয়ে আছে রোশাম্বো;—হেইতীর ফরাসী গবর্ণর রোশাম্বো।

মাত্র একটি ঘটনারই উল্লেখ করা যাক।

তখন রোশাম্বো পোর্তো-প্রিন্স-এ। অ-শ্বেত সুন্দরীদের এক পরিপাটি জলসায় আমন্ত্রণ জানালেন। প্রতি অ-শ্বেত সুন্দরী নৃত্য করলেন শ্বেত সুন্দরের সঙ্গে হাতে কোমরে কোমর মিলিয়ে। রজনী ক্রমশ বালিকা থেকে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্খলিতা-বিধুরা হলো! মধ্যরাত্রি গত হয়ে গেছে। রোশাম্বো নাচগান থামিয়ে একটু পানের ব্যবস্থা করে সমবেত রূপসীবৃন্দকে পাশের ঘরে ডেকে নিলেন। তাবৎ সজ্জনও সেই সঙ্গে।

পাশের ঘরে পর পর পাদ্রী মহোদয়গণ মন্ত্র পাঠ করছেন। পর পর সারের পর সার শবাধার ঢাকা আছে শোকবিধুর কালো বনাত কাপড়ে। মোমবাতি জ্বলছে।...সে এক বিষম পরিস্থিতি! যেমন গম্ভীর, ভয়াবহ, বিষন্ন—তেমনি হাস্যকর। জলসায় এতো কফিন ঘটা করে দেখানো। ট্রাজেডী না ফার্স?

রোশাম্বো ঘোষণা করলেন—"সুন্দরীগণ, দেখুন পাছে আপনাদের পতি, পুত্র, ভ্রাতারা কোনও প্রমাদবশত স্বর্গস্থ হতে না পারেন এই আশঙ্কায় আমি সদ্য সদ্য প্রত্যেককেই রাজকীয় অন্ত্যেষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করেছি। আশা করি এতক্ষণে দলটি স্বর্গের দরজা পার হয়ে গেছেন। আপনাদের জীবনে নাচে-গানে-রসে পরিপূর এই রজনীটি যাতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে সেই জন্যেই বন্ধু রোশাম্বোর এই স্বর্গীয় ব্যবস্থা।" আতঙ্কিত ভয়ার্ত মেয়ের দল ছুটে গিয়েছিলো কফিনের দিকে। কফিনের ঢাকা খুলে প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ করেছিলো কফিনে কফিনে তাদের আত্মার আত্মীয়, দেহের বন্ধন, সংসারের মায়া, পিতা, পতি, পুত্র, ভাই—চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন। যুবা-তরুণ-বৃদ্ধ প্রত্যেকটা পুরুষ!!

ঝুঁকে 'বাও' করে পিছু হেঁটে আদবকায়দাদুরস্ত রোশাম্বো সেই আর্তবিলাপমুখর কক্ষ থেকে পরম পরিতোষ সহকারে বিদায় নিয়েছিলেন।

এটি মাত্র 'একটি' ঘটনা।

এমনি আরও আছে···তবু শাদা রোশাম্বো মেগালোম্যানিয়াক নয়। শাদা ইতিহাস লেখে নিগ্রো ক্রিস্তফ্ই মেগালোম্যানিয়াক।

এর পর বিদ্রোহ আর থামানো গেলো না। ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি খাড়া লড়াই চললো। ভার্তিয়ের-এর রণাঙ্গনে রোশাম্বো বন্দী হলো। গোনাইভে শহরে হেইতীকে নিগ্রো স্বাধীন দেশ বলে ঘোষণা করা হলো। এই বিজয়, অবিশ্বাস্য বিজয়, রুশের ওপর জাপানের বিজয়ের চেয়েও বিস্ময়কর, যুগান্তকারী। অবশ্য ইংরেজ এবং আমেরিকান সহায়তা না পেলে নিগ্রো বীরেরা এই অসাধ্য সাধনে সক্ষম হতো কি-না বলা সুকঠিন।

দেসালীন, সম্রাট প্রথম জাক্ উপাধিমণ্ডিত হয়ে, স্বাধীন হেইতীর স্বাধীন সম্রাট হলেন। সেটা ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের ৬ই অক্টোবর। ১৮০৪-এর আঠারোই মে,—তারই মাত্র পাঁচ মাস আগে কর্সিকার অখ্যাত পরাজিত এক উকীল সেনানীর পুত্র নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। সেই সদ্যোজাত স্বয়ং-প্রতিষ্ঠা সম্রাটটির রাজ-পরিষদবর্গের মধ্যে মুচি, ধোবানী, কসাই এরাও খ্যাতি প্রতিপত্তি পেয়েছিলো।

দেসালীনের মনে কি নেপোলিয়নের এই সব নাটুকেপনা নিয়ে কোনো কৌতুক হয়েছিলো? ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নিগ্রোরা অত্যন্ত চপল এবং ভারী সুরসিক। শ্লেষে, ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে এদের অসাধারণ মুন্সিয়ানা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে ব্যঙ্গ করার জন্যই হেইতীতে এই রাজসংস্করণের প্রয়োগ হয়েছিলো কি-না কে বলবে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রো রসিকতার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা জানে কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রকে জীবনে ফলিয়ে অতিরঞ্জনকে শিল্পোত্তরতায় তুলে ধরতে এরা ওস্তাদ। অনুকরণের

তোষামুদী ভাষাতেই এরা অনুকরণীয়কে অননুকরণীয় লজ্জায় সহস্রের উপহাস করে তোলে। ত্রিনিদাদে বছরে বছরে কার্নিভালের সময়ে এই রস আমি ভোগ করেছি।

শাদা ঐতিহাসিকরা অন্য ব্যাখ্যা করে থাকেন। ব্যাখ্যাকার ঐতিহাসিকরাই হ্যাক্কাকার ইতিহাস লিখে থাকেন। তাঁরা বলেন—নিগ্রোরা বাঁদরদের মতো অনুকরণ-পটুত্বে অভিনব। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বলেন, প্রতিটি অনুকরণ মাত্রেই প্রকারান্তরিত স্তুতিবাদ; এবং প্রতিটি স্তুতিবাদের অত্যবচেতনিক কারণ স্তব্ধ মর্মবেদনাপ্রসূত প্রতিহননেচ্ছা। বোবা অনির্বচনীয় লোভের অতিবাচনিক সংস্করণ অনুকরণ এবং বিদ্রূপ।

লম্বা-চওড়া কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে ক্যা কাম। সোজা কথায় আসা যাক। দেসালীন সম্রাট হয়ে বসেই দুটো জবর কাজ করলেন। জানুয়ারী মাসে (১৮০৪) একটি রাজতন্ত্রের ব্যবস্থাপক নীতি লিপিবদ্ধ করলেন; এবং সদ্যোজাত স্বাধীন হেইতীর অতিশূন্য কোষাগার থেকেই প্রচুর সাহায্য পাঠালেন ভেনেজুয়েলায় সীমঁ বোলিভাবের স্পেনাশ্তিক বিদ্রোহের স্বপক্ষে। হেইতীর সাহায্য ছাড়া বোলিভারের বিদ্রোহ কতোদূর সার্থক হতো বলা কঠিন।

১৮০৩-এ দেসালীন যখন প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তখন একটি শুভকার্য সমাধা করেছিলেন। তারই ফলে আজও হেইতী স্বাধীন। সত্যিকারের স্বাধীন। দেসালীন শ্বেতকায় মাত্রকেই কোতল করেছিলেন। হেইতীকে নিঃশ্বেত করলেন নিঃশেষে। হিস্পানিওলার পশ্চিম অংশটের নব নামকরণ করলেন হেইতী।

শ্বেতযজ্ঞ নিঃশেষে সম্পাদনা দেসালীনের যে একটি অতিবড় কৃতিত্ব পৃথিবীব্যাপী ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে। ইন্‌কা, মায়া, আজতেক, মাওরী, এস্কিমো, রেডইণ্ডিয়ান সভ্যতার কথা তুলবো না। তুলবো না দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গো, রোডেশিয়া, ঘানার ইতিকথা। কেবল দেখাবো দু-একটি ঘরের পাশের ইতিহাস। সিরাজ "যদি" নিঃশেষে তুলে দিতো হুগলী, বাগবাজার, কলকাতার কুঠী; "যদি" হায়দার-টিপু নিঃশেষে শ্বেতী-কবলানো সন্ধি করতো; "যদি" ভাস্কো-জামোরিণের বিবাদে জামোরিণ পুনশ্চ শ্বেত রোগকে পুষতে না দিতেন; "যদি" দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে আর্গাওনের সন্ধিসূত্রটাকে চরমে নিয়ে যাওয়া হতো; যদি, যদি, যদি…। যেখানে যেখানে মানবতার সুবিধা নিয়ে অনিয়োরোপ ভূখণ্ডের সমৃদ্ধতর এলাকায় শীতজর্জর ক্ষুধাকাতর ফিরিঙ্গীরা বোম্বেটে অপকৃষ্টি নিয়ে চড়াও হয়েছে সেখানে সেখানেই তারা এমন একটা কৃতঘ্ন ইতিহাস ফেলাও করে রচনা করেছে যে যস্য শিল এবং নোড়া তস্য দন্ত পংক্তিকে নড়বড়িয়ে দিয়ে বাজীমাৎ করেছে। পাদ্রীর দল, "মানুষ" করে তোলার দল, ভাড়াটে সৈন্যের দল, বেপরোয়া বণিকের দল, রাজার এবং শ্বেতদেশীয় রাজনীতির কুট সমর্থন পর পর এগিয়ে এসে যখন অনিয়োরোপিক সভ্যতার গলা টিপে মারার প্যাঁচে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে, তখন একদল স্বাক্ষর, স্বাক্ষরতরো পণ্ডিতদের দিয়ে লিখিয়েছে সাফাই; তার নাম হয়েছে ইতিহাস। তামাম সভ্য দুনিয়াকে বুঝিয়েছে, বোঝাচ্ছে যে তারা আসলে অ-সভ্য;

এবং তাদের 'উপকার' (ধিক্) করাই এই সব লুঠেরার আসল খ্রিস্টীয় কামনা। কুকুরের উপকারার্থেই শেকল এবং খাঁচা।... এবং আশ্চর্য যে আমরা ঐ সব রাংতা-মোড়া মিথ্যা ভাষণগুলো হজম করে অবিকল ওদের গানই গাইছি, ওদের হাতই চাটছি, ওদের কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নানা প্রকার মান-সম্মান (ছাই), সুযোগ-সুবিধা শিরোপার মতো ধারণ করেছি। আজও করছি; সব সংস্করণে।

আজ ক্যারাবিয়ান অঞ্চলে হেইতীকে ভারী নোংরা, ভারী গরীব, ভারী পিছেয়ে-পড়া দ্বীপ বলা হয়। ওখানে ট্যুরিস্ট বাহারী চমচমা জাঁক নেই। ওরা বারবনিতাসুলভ সজ্জা পরে সাময়িক পতি আরাধনাও করে না; এবং সেই বিত্তের গরবে সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের সর্বস্ব বিকিয়ে দেয় না। হেইতীর অনৈশ্বর্যে এবং সান্দোমিঙ্গোর ঐশ্বর্যে, একই দ্বীপের পশ্চিমের এবং পূবের বিস্তীর্ণ ব্যবধান অতি উদগ্র ভাবে স্পষ্ট। এই দ্বীপটির দুটি স্তনপিণ্ডের মধ্যে একটি পিণ্ড মুক্ত, নিরাবরণ, শিশু পোষণে ব্যস্ত; অন্য পিণ্ডটি ন্যাংটা আভরণে সমৃদ্ধ এবং যুবজনদের রমণ ক্ষুধা জাগিয়ে চমচম্ করছে। প্রথমটিকে বলতে হবে অসভ্য। দ্বিতীয়টিকে বলতে হবে প্রগ্রেসিভ!! নবীনা ভাষার এই বাণী!

ক্যুবায় ক্যাস্ট্রোকে ঐতিহাসিক কারণেই কাস্ট্রো হতে হয়েছে। ক্যুবার নাইট ক্লাব প্রসিদ্ধ ছিলো। ক্যুবার বই-বাজারে নোংরা, যৌন ক্ষুধাতপ্ত বই ছোটোদের এবং বড়দের জন্য যা বিক্রি হতো বেশীর ভাগই produced in America; ক্যুবায় খোলামেলা ছবির বাজার। ক্যুবার সিনেমাগুলোয় হলিউডের সব-সে-সেরা সেই সব ছবি দেখানো হয় যাকে নিকোলাস ওলাসস্টন বলেন, 'regional appeal for down-naval stations'—!

ক্যাস্ট্রো ক্যুবার ছেলে। সারা ক্যুবাকে আমেরিকার সোনাগাছি করে রেখেও সাজ-সজ্জা আড়ম্বর নিয়ে মত্ত থাকার অর্থ তার মস্তিষ্কে আসতো না। আমেরিকাতেও যে সব কীর্তি গৃহিণী-প্রিয়াদের চোখ-কানের আওতার ভয়ে অকরণীয়, তারই সদর-কাছারি, আম-দরবার ছিলো ক্যুবা। তাই ক্যাস্ট্রো নিঃশেষে আমেরিকান বিতাড়নকে নব ক্যুবার অবশ্য করণীয় যজ্ঞ বলে বিবেচনা করেছেন।

তেমনি করেছিলেন লেনিন; তেমনি করেছিলেন দান্তোঁ, রোবেসপীয়ে, প্যারিসিয়ান কম্যুন্।

অমন নোংরামি থেকে মুক্তি পেতে গেলে আগাপাশতলা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গঙ্গাস্নান করে সাফ হতেই হয়।

নোংরা হেইতীতেই আমার দীর্ঘ দিন কেটেছে, নোংরা হয়ে। কিন্তু একটা জাগ্রত জীবন্ত দেশ। তাকে 'পিছিয়ে' থাকা দেশ বলবো যদি কলকাতার থিয়েটার রোড কিংবা বম্বের মেরিন ড্রাইভকে স্বর্গ বলি। কিন্তু যদি স্বাবলম্বনে স্বয়ংসিদ্ধ সন্তোষ পরিপূর্ণ একটা জীবনকে সুস্থ সবল বলা যায়, নোংরা হেইতী তাই। হেইতী একটা দেশ, যা কেবল হেইতীতেই আছে। হেইতীকে আমেরিকা করে তুলে হেইতী খুশী হতে চায়নি।

হেইতী কতো খুশী, কতো তুষ্ট, কতো স্বতন্ত্র, কতো বেপরোয়া বলা যাবে। ইতিহাস শেষ হোক।

নৃশংসতাই নৃশংসতাকে বাড়িয়ে তোলে। নেশার মতো। মানুষ একবার তার মনের মমতাকে বিসর্জন দিলেই অহমতা সেই শূন্য সিংহাসনে থাক জমিয়ে বসে পড়ে। মমতা এবং অহমতার মধ্যে প্রভেদ মন আর দেহের, প্রেমের এবং প্রয়োজনের, নারীর এবং রমণীর। প্রথমটা তমস্‌কে সত্ত্বের দিকে ধাওয়ায়,—দ্বিতীয়টা তমস্‌কেই কুম্ভীপাকে, রৌরবে ঠেলে নিয়ে যায়। প্রথমটায় মানুষ জীবনে আত্মদর্শন করতে পারে, সান্নিধ্য থেকে সাযুজ্যাক পায়; দ্বিতীয়টায় মানুষ জীবনকে আত্মকেন্দ্রিকতায় চেপে মারে; সান্নিধ্যকে হারিয়ে ফেলে নির্জন একক নিঃসঙ্গতায়। বুঝতে পারে না সব রকম কারাবাসের মধ্যে উন্মাদ-কারাবাস নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে না পাওয়া।...

...চিৎকার করে ভয়ে। সেই পরমভীতি রূপ নেয় নৃশংস, বীভৎস আচরণে। আকাশ-পাতাল-নিখিল-ভুবন আক্রোশে কাঁকিয়ে ওঠে, 'ভাঙ, ভাঙ, ভাঙ, তফাৎ যাও; তফাৎ যাও; লণ্ডভণ্ড করে দে সমস্ত সুন্দরকে।' তাদের কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে না, 'মাভৈ রাণার!'

দেসালীন শাদাদের বিনাশ করে কালোদের হিত চেয়েছিলো। বিনাশই বিনষ্ট করার চিৎকার তুলেছিলো দেসালীনের হৃদয়ে। সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধানকে সে পেতে চাইলো হত্যায়।

জনতা হারিয়ে ফেললো জীবন রক্ষার দায়িত্ব; জীবনের সংক্রমণ মূল্য। জীবনের প্রতি কোনো মমতা রইলো না মানুষের।

পাষণ্ড বীর দেসালীনকে হত্যা করা হয় ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে।

১৮০৪-এ এই দেসালীনকেই দেশবাসীরা যাবজ্জীবনের জন্য একচ্ছত্র নায়ক করেছিলো; দেসালীন নিজেকে সম্রাট বলে বিঘোষিত করেছিলেন।

১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে আঁরী ক্রিস্তফ 'রাজা প্রথম হেনরী' উপাধি-ভূষিত হয়ে হেইতীর সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। দক্ষিণ হেইতীতে সুলাতো (দো-আঁশলা) আলেকজান্দার পেতিয় স্বাধীনতা ঘোষণা করলো কালাদের উপেক্ষা করে। যুদ্ধ। ক্রিস্তফ মহাবীর পুরুষ। বিশাল চেহারার জন্য এবং রুদ্ররোষের জন্য আঁরী ক্রিস্তফের নামে সবাই ভয়ে কাঁপতো। যুদ্ধে ক্রিস্তফ জিতলেন। জিয়াঁ পিয়েরে বোয়ার ক্রিস্তফের সঙ্গে পাকাপাকি দোস্তী সর্তে রাজ্য শাসন করতে লাগলো। নামমাত্র রাজস্ব পাঠিয়ে ক্রিস্তফের শ্লাঘা তাতিয়ে রেখে বোয়ার নিজের কাজ হাসিল করেছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যারাবিয়ানে এবং নতুন পৃথিবীতে ফরাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেলো। নেপোলিয়ান মর্মে মর্মে বুঝলেন স্বাধীনতার বাস্তব কালো-শাদা মানে না। ও আগুন যখন জ্বলে শাদাকেও যেমন জ্বালায়, কালোকেও তেমন।

ভগ্নমনোরথ নেপোলিয়ান বেচে দেন বিশাল লুইসিয়ানার ভূখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রকে মাত্র

১৫ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে। হায় ফরাসী !! তুঁসাকে না মারলে লুইসিয়ানা যেতো না ; লুইসিয়ানা না গেলে ক্যানাডা হারাতে না।

ইতিহাস কারুকেই ক্ষমা করে না।

ক্রিস্তফ ছিলেন অন্য ধাতুর। আসল আফ্রিকান ; মহিষের মতো যার রং, গোঁ, দাপট, চেহারা। নিজেই নিজের চরমকে অতিক্রম করার দুঃসাহসে অবশেষে মহিষাসুরের মতোই ভীত হয়ে পড়লেন। সেই ভয়ের রূপ শুধু হেইতীর ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও অক্ষয় হয়ে আছে।

পৃথিবীতে ভয় জাগানো কোনো ইমারাত যদি কেউ কোথাও রচনা করে থাকে—স্রেফ ভয়ের ইঁটে-পাথরে, ভয়ের সিমেণ্ট-সুরকিতে, ভয়ের স্থাপত্যে শিল্পে—মানুষের হাতে গড়া ইমারত—সেটি হলো হেইতীর দুর্গ "সাঁ-সুচী"! ক্রিস্তফের 'সিতাডেল লাফেরিএ'। দুর্ভেদ্য? হ্যাঁ। দুরধিগম্য? হ্যাঁ। অনতিক্রমণীয়? হ্যাঁ। অজেয়? হ্যাঁ !! কিন্তু এতোখানি আয়োজন কার বিপক্ষে? তেমন শত্রু কোথায় হেইতীতে? মহিষাসুরের শত্রু ছিলো মহিষাসুরের বুকের মধ্যেই। অত্যাচারী উম্মাদ নৃশংসতার শত্রু নৃশংসের বুকের মধ্যেই চিৎকার তোলে। সেই ভয় থেকে নিজেকে রক্ষা করার বিপুল আয়োজন হেইতীর সিতাডেল আজও পর্যটকদের বিস্ময় জাগায়। সাঁ-সুচী এবং সিতাডেল লাফেরিএ।

আটটি সুবৃহৎ পরিখা বেষ্টিত উদ্যান-বাটিকা, এবং নয়টি অতিকায় প্রাসাদ ছাড়াও প্রয়োজনীয় সৈন্য, পশু, রসদ, পরিচারক ইত্যাদির সুব্যবস্থিত বাসস্থান পরিপূর্ণ এক অতিকায় দুর্গ হেইতিয়ে গিরি শিখরের ৩০০০ ফুট উঁচু চূড়ার ওপরে। প্রাচীর ১৪০ ফুট উঁচু। তলায় স্থূলতা ১২ ফুট ; ওপরে ছয়। কতো হাজার শ্রমিক এই জগদ্দল পাথরের চাঁই বয়ে বয়ে এতো উঁচুতে এনেছিলো জানা নেই ; জানা আছে ১৪ বছরে বিশ হাজারের বেশী শ্রমিক খাটতে খাটতেই কাজ করার মধ্যেই অপঘাতে মারা গেছে !! সে মৃত্যুকে কি তারা মৃত্যু বলেছিলো—না মুক্তি? যারা বেঁচে ছিলো তারা কি মৃতদের ঈর্ষা করেনি?

তবু সত্য আঁরী ক্রিস্তফের ক্রোধকে তারা যতই জয় করুক, তার শক্তি ও শাসনকে তারা শ্রদ্ধা করতো। ১৪ বছরের মাথায় শেষ পাথরটি গাঁথা হয়ে যাবার পর তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলো, ভবিষ্যতে কোনো ফরাসী বাহিনীই আর তাদের পর্যুদস্ত করতে পারবে না।

শাদাদের ভয় আজও ক্যারাবিয়ানের মজ্জায় মজ্জায়। এই ভয় তারা ঢাকে প্রচুর সাহেবিয়ানা করে। সাহেবতর হয়ে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তুলে। ক্যারাবিয়ান সমাজেই স্বর্মিতিই, ভৈরবতা ; হৈ-রবতা। ওরা বাজায় স্টীল ব্যাণ্ড ; গান গায় ক্যালিপ্‌সো ; লীলা করে যৌনতায় ; স্বাদ পায় মদ্যে-মাংসে ; শিল্পতা দেখায় অনল্পতায় ; 'জাতীয়' (?) উৎসব করে দু-তিনদিন ব্যাপী কার্নিভালে, যার রূপ না রাসে, পঞ্চমকারে, না ইন্দ্রসভায়, না ডামর-নৃত্যে পাওয়া যাবে। এতো যে আভিচারিক ব্যভিচার, সবটাই

সমাজের অঙ্গ ;—কেন ? ওদের জীবনে অসহ উৎসাহের শক্তি স্ফুরণ হচ্ছে ভয়ের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংগ্রামে। ক্যারাবিয়ানের সূর্য-স্ফোট ভয়ের অনুস্রোত বইয়ে দিয়েছে সামাজিক সত্তায়। এ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পেতে সূর্যই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

একটা উদাহরণ দিই। সিতাডেলের বিশাল প্রাঙ্গণে নিত্য প্রভাতে কুচ হতো। স্বয়ং ক্রিস্তফ তা প্রত্যক্ষ করতেন। সেনানী হিসাবে ক্রিস্তফের দক্ষতা, বিচক্ষণতা, ভূয়োদর্শন ছিলো সর্বসাধারণে নমস্য। বিশাল প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিমের দিকে সমুদ্র। সে দিকটায় প্রাচীর নেই ; সম্পূর্ণ খোলা। সেখান থেকে সোজা চাঁচা-ছোলা খাড়াই নেমে গেছে ২০০০ ফুট তলায় সমুদ্রে।...সেদিন সকালেও কুচ হচ্ছিলো। তিন হাজার সৈন্য যথারীতি 'মার্চ' করছে। লেফট্-রাইট ; ফরোয়ার্ড মার্চ ; এবাউট্ টার্ন...সব চলছে। শাদা ঘোড়ার ওপর শাদা পোশাকে ক্রিস্তফ স্বয়ং অর্ডার দিচ্ছেন। সৈন্যেরা মার্চ করছে। লেফট-রাইট চলছে। এগিয়ে যাচ্ছে প্রাচীরহীন প্রাঙ্গণের প্রান্তে সমুদ্রের দিকে। প্রাঙ্গণের যে দিকে সমুদ্র সে দিক মুক্ত ; প্রাচীর নেই। সোজা সমুদ্র ৩০০০ ফুট নীচে ! ক্রিস্তফ কিন্তু বললেন—না, বলছেন না 'এবাউট টার্ন' ! বললেন না হল্ট্। সম্রাটের সুশৃঙ্খল বাহিনী ধীর মনে চলতেই লাগলো ; চলতেই লাগলো। প্রাচীর শেষ হয়ে যাবার পর পংক্তির পর পংক্তি অদৃশ্য হয়ে যায়। শেষ পংক্তিটিও যখন সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে গেলো, ক্রিস্তফ বললেন, ডিসপার্স !!...অর্থাৎ, দেখলে "ডিসিপ্লিন্" ??

সভা ভঙ্গ হলো !!!

যথারীতি সকলে যে যার কাজে চলে গেলো। কাল আবার কুচ হবে। হয়েওছিলো।

এ অদ্ভুত আচরণ ক্রিস্তফ কেন করেছিলেন ? সেদিন সকালে এক বিখ্যাত ইংরেজ জেনারেল ক্রিস্তফের অতিথি। তাঁকে দেখাতে হবে ক্রিস্তফের সৈন্যদল কী পরিমাণ 'ডিসিপ্লিন্ড্'। ক্রিস্তফ বলেছিলেন, 'প্রকৃত ডিসিপ্লিন জন্মায় শ্রদ্ধা এবং প্রেম থেকে। আনুগত্য থেকে নয়। নায়কের প্রতি শ্রদ্ধা ; দেশের প্রতি প্রেম।'

ইংরেজের কাছে, শাদার কাছে, নিজেকে প্রমাণিত করার জন্য কালোরা অসাধ্য সাধন করে।

যারা শাদা-চামড়া বিয়ে করে 'স্টেটাস্' বাড়াতে যায় তারাও তো রোগী ! Sick !! Megalomamic !!! আত্মপ্রত্যয়ের অবচেতনিক অভাব চেতনজগতে বিকৃত প্রতিফলনে স্পর্ধিত হয়ে তাত ছড়ায়।

ক্যারাবিয়ানের ধিক্কারিত জীবনধারায় এ তাত অতিমাত্রায় স্পষ্ট।

১৮২০-তে ক্রিস্তফের প্যালেসগার্ড বিদ্রোহ করেছিলো। পরীক্ষিতের ভয় লেগেছিলো। সে স্পর্ধাভরে ব্রহ্মণ্য-সহিষ্ণুতাকে উপহসিত অবহেলায় অপনন্দিত করেছিলো। ভয়ে ভয়ে নিজেকে সে আবদ্ধ রেখেছিলো নিজের প্রাসাদে। তার বিনাসের বীজ তার প্রাসাদের মধ্যেই উপস্থিত হয়ে তাকে দংশেছিলো। যখন

ক্রিস্তফ বুঝলো মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন সে নিজের মাথায় পিস্তল রেখে নিজেকে গুলি করেছিলো।

সেও ক্যারাবিয়ানের কালো সূর্যের ভীত স্ফুরণ। নিজের জন্য স্বর্ণমণ্ডিত একটি পিস্তলে রুপোর গুলি সর্বদাই ভরে রাখতো ক্রিস্তফ। তার চারপাশে রাণীরা, বাঁদীরা। সিংহাসনে পাত্রমিত্রসহ বসে সম্রাট আঁরী ক্রিস্তফ গুলি করেন নিজেকে। নিজের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা নিজেই করে যান। নিজে কবর খোড়ান। নিজে স্মৃতিফলক লেখান। বলেন সাধারণ বিদ্রোহীরা তার দেহ যাতে স্পর্শ না করতে পারে সেই জন্য গভীর কবরে তার দেহ রেখে চুন ভর্তি করে জল ঢেলে দিয়ে কবর যেন বুজিয়ে দেওয়া হয়। কবরটি আজও সিতাডেলে দ্রষ্টব্য। তার গায়ে ক্রিস্তফের নিজের লিখে যাওয়া স্মৃতিফলক উৎকীর্ণ করা আছে "I shall rise from my ashes"।

স্মৃতিফলক পড়ে যখন আবার সামনে চাইলাম—নিস্তরঙ্গ নীল ক্যারাবিয়ানের দিগন্তে স্তিমিত সূর্য ঢলে পড়েছে। দু পাশের সবুজ বন থরে থরে ঝাঁপ খেতে খেতে নেবে গেছে আছাড়ি-পিছাড়ি সমুদ্রের অস্থির মাতনে। দিগন্তে শান্ত পারাবার; প্রত্যক্ষে ক্ষুব্ধ সিন্ধু। বর্তমানের অক্ষয় জিজ্ঞাসা ভবিষ্যতের নিশ্চিত স্তব্ধতায় তার উত্তর পেয়ে যাবে।

ইতিহাস নিয়ে কচকচি করা ক্ষেত্র ভ্রমণ 'কাহিনী'-তে থাকে না। বেইমানী করে পাঠককে খানিক ইতিহাস-জ্ঞান পান করিয়ে দেবার ইচ্ছাও লেখকের নেই। কিন্তু কোনো একটা দেশকে দেখা তো তার গাছপালার বর্ণনা, হাট-বাজারের লেন-দেন, হোটেলে খানা-পিনার খোশবয়, সুন্দরী-সোহবৎ কিম্বা রমণী রংদারী নয়। তেমনি হলে অবশেষে লিখতে বাধ্য "বিলেত দেশটা মাটির"। প্রাত্যহিক দিনচর্চার খতিয়ান বিদেশের পটভূমিতে লিখলেও তাতে না-মন, না-মানুষের পরিচয় দিতে পারা যায়। দেশ দেখা মানে দেশের মানুষ, সমাজ, আত্মসমীক্ষণকে দেখা। এবং সে দেখা তখনই সার্থক যখন ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা সমাজের চিত্র তুলে ধরা যায়। আমি, তুমি, রামা, শ্যামা ডাক্তারের চোখে বায়োলজিক্যাল একক; মনস্তাত্ত্বিকের চোখে ব্যক্তি-বৈচিত্র্য; সমাজজ্ঞের চোখে প্রতীক। কিন্তু মানুষ মহাকালের সৃষ্টি-স্থিতি-দোলায় ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে—এ তত্ত্ব সত্ত্বেও মহামানবের সাগরতীরে কালে কালে বলিরেখা পড়েছে। সেই বলিরেখার সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে একটা দেশের বৈশিষ্ট্য বোধগম্য হয় না। এই বৈশিষ্ট্যই দেশের পর দেশ দেখাকে অর্থময় করে তোলে। নইলে দেশ দেখা অন্ধের হাতী দেখার মতো হয়, যদি তার সমগ্রতার তত্ত্ব জিওগ্রাফী, ইতিহাস, সমাজতত্ত্বের মিলিত রসে জারিত না হয়। তাই অদ্ভুত সমাজের অদ্ভুত বিবরণ লিখতে গেলেই তার ইতিহাস জানা দরকার।

ওঠা-নামার টাল-মাটাল সামলাতে সামলাতে হেইতীর আন্তরীণ অবস্থা কঙ্কাল হয়ে উঠলো। বন্যা এবং শুখায় আবাদী তছনচ্ হয়ে গেলো। শিক্ষা ব্যবস্থা বোদা হয়ে রইলো। পথে-ঘাটে দস্যু ও লুঠেরার ভয়ে মানুষ কাঁপে। অরাজকতার চরম। ১৯১৩

খ্রীস্টাব্দে Michel Oreste-কে সরিয়ে প্রথমে Oreste Zamor এবং তারপর Davilmar Theodore প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে। কয়েক মাসের মধ্যে Vilbrum Guillaume Sam প্রেসিডেন্ট হলেন।

সাম প্রেসিডেন্ট হবার পর একটি ভীষণ রক্তাক্ত বিদ্রোহের ফলে জেলের মধ্যেই ২০০ রাজবন্দীকে বেয়নেটের গুঁতোয় হত্যা করা হয়; স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ফরাসী দূতাবাসে আশ্রয় নেওয়া সত্ত্বেও জনতা দূতাবাসে ঢুকে তাকে হিঁচড়ে বার করে এনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

ফলে আমেরিকার সৈন্য দখল নিলো হেইতীর !!!

এই তত্ত্বটি জানাবার জন্যই ইতিহাসের অবতারণা।

এই তত্ত্বটি জানতে পেলেই এই সব বিদ্রোহের উস্কানির উৎসমূলের হদিস পাওয়ার সম্ভাবনা !!

যথারীতি হেইতী সরকার রইলেন! কিন্তু সম্পূর্ণ শাসনব্যবস্থা আমেরিকান সৈন্যদের হাতে চলে গেলো।

অর্থ বোধ হচ্ছে না? পাঠক বড়ই সেকেলে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, পোর্তোরিকো, এই সিদনের ডোমিনিকান রিপাব্লিকের হাঙ্গামা, ত্রিনিদাদের শাগুয়ারেমাস, ক্যুবার গুয়াস্তানামো, চিলির কায়পলট, গ্রীসের এবং সাইপ্রাসের বাঁদর নাচ—এ সব দেখেও মালুম হচ্ছে না? জাপানে নয় ম্যাকার্থিজ্‌ম্‌ চলেছিলো। কিন্তু কী চলেছিলো ফিলীপিন্‌-এ, ক্যুবায়, পোর্তোরিকোয়?

১৯১৮ থেকে ১৯৩৩ হেইতীর সরকার কেবল ভাঙে আর গড়ে। বার বার বন্ধু আমেরিকা এগিয়ে আসে 'সাহায্য' করতে। আমেরিকান ফৌজ হেইতীর শান্তিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করল। ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ১৯৩৩-এ এক চুক্তি করে জানান যে মার্কিন সৈন্যাপসারণ দ্রুততর করা হবে। কিন্তু বাণিজ্য!—নাঃ, সে বিষয়ে চুপ থাকতে হবে !!

হেইতীতে যখন এ সব ঘটনা ঘটছে তখন ক্যুবায় লা-ইজ্‌ভেস্তিয়া কাগজে তরুণ ফীডল ক্যাস্ট্রো দিনের পর দিন আমেরিকী কেরামৎ অনুধাবন করছে।

১৯৩৩ থেকে হেইতী আর শান্তি পায়নি। প্রেসিডেন্টের পর প্রেসিডেন্ট এলো, গেলো। কেউই পুরোপুরি নিজেকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে পারেনি। অবশেষে ডক্টর ফ্রাঁসোয়া দুভ্যালিএ এলেন প্রেসিডেন্ট। ছিলেন স্যানিটারি ইন্‌স্‌পেক্টর। ডাক্তার যে কিসের ডাক্তার আজও অবশ্য জানতে পারিনি। মুস্তাফা কামাল পিস্তল হাতে করে পার্লামেন্টে ভোট আদায় করেছিলেন। ইনিও সেই পদানুসরণ করে হেইতীর বুকে চেপে ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর একমাত্র পুত্র 'খোকা' দুভালিএ হেইতীর প্রেসিডেন্ট, আজীবন প্রেসিডেন্ট। ব্যবস্থা জমজমাট এবং বনেদী। আমেরিকান ক্রোড়-পতিরা ব্যবসাবাণিজ্য চালায়, ব্যাঙ্ক চালায়, দুভালিএ তাঁর মাসিক টাকা আমেরিকানদের কাছ থেকে আদায় করেন।

হেইতীর মতো দরিদ্র দেশ দেখিনি। [তবে এখানে ভারতের স্টার্ভেশন নেই। যারা স্টার্ভ না করে বেঁচে আছে তাদের ক্ষমতা অসাধারণ। মানতেই হবে।]

যে কোন সময়ে রাজধানী পোর্তো-প্রিন্সকে দেখলে বোধ হবে যেন এক বিশাল ঝড় বয়ে গেছে শহরটাকে দলে-মথে দিয়ে। বাজারগুলো দেখলে মনে হবে যেন হাটবারের অন্তিম বেলা। যারা কিনছে, যারা বেচছে উভয়কে দেখলেই মনে হয় যা দিচ্ছে এবং যা নিচ্ছে তার মাঝে যে টাকা এলো গেলো তা পেলো কোথায়? রাখবেই বা কোথায়? ধুঁকছে যেন সারা শহরটা।

তবু তারি মধ্যে বড়ো বড়ো চুবতরায় খাড়া, বড়ো বড়ো মূর্তি;—দেশনায়কদের: তুস্যাঁ, দেসালিন, আঁরী-ক্রিস্তফ্। পোর্তো প্রিন্স কেন, গোটা হেইতীকেই বলা হয় "পাথুরে দেশ-নায়কদের দেশ"।

আমি ভাবি, মানুষ, জীবন্ত মানুষ ছিল ওরা; ওদের পাথর করে দিয়েছে আমেরিকান সহানুভূতি। ক্যুবার ক্যাস্ট্রো যে কোন্ বিষে বিষাক্ত তা জানার জন্যে রুশের লালে কলম ঢোকানোর প্রয়োজন নেই; আমেরিকান নীলেই পাওয়া যাবে। একটু তলিয়ে দেখতে হবে।

সেই নীল বিষ পোর্তো-রীকোয়, পানামায়, দোমিনিকান রিপাব্লিকে। ক্যুবা সেই বিষ হজম করে সবে ওঠার চেষ্টা করেছে; পারবে কেন? চারধারে তার নীল-বিষ থৈ থৈ করছে।

হেইতীর মানুষকে হেইতীর ইতিহাস কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে। অন্ধকারে, রাত্রে, গোপনে, অভিচারে, বীভৎসতায়, কদর্যতায়, নেশায়, রিরংসায়, কাপালিক তামসিক ক্রিয়ায়।

তার নাম Voodoo—ভুডু;—সারা ক্যারাবিয়ানে যার বিভীষিকাময় নাম চুপি চুপি স্মরণ করে লোক।

এই Voodoo-কথা শোনাবো।

পীটার গোম্‌সের দেওয়া ঠিকানা তখন মাথায় নেই। যেতে পারি সেই হোটেলে। কিন্তু হোটেলে উঠলেই দেশ আর 'দেখা' দেবে না নিশ্চিত। তা ছাড়া হেইতীর হোটেল। তার চেয়ে গোয়েব্‌লসের জর্মনী, স্টালিনের মস্কো দর্শন সহজ। সব রকম মারাত্মক গুণ্ডার মধ্যে বোকা গুণ্ডা মোক্ষম।

কাস্টমস্ থেকেই বলে—বোর্ডের লেখাটা পড়ে নিয়েছেন তো?

তাকালুম;—নানান কথা: নিষিদ্ধ পুস্তক; নিষিদ্ধ বাক্য; আজে-বাজে নিষিদ্ধ-র ফিরিস্তি।

তাতেই ওদের কর্ম সিদ্ধ! বার্লিন ওয়াল নয়; আয়রন কার্টেন নয়; কেবল গুটিকতক নিষেধ-নিরন্ত পেপার ওয়াল, এবং ভিসা-কার্টেনের পিছনে ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক।

পরে, দোমিনিকান রিপাব্লিক ঘুরে আসার পরে বুঝেছিলাম ওপর দিকে চেয়ে বোর্ডের

সমাচার পড়ার সময়েই গোপন সুড়ঙ্গে রাখা ক্যামেরায় ফোটো তোলা হয়ে গেলো। বাকী যা সব সংবাদ সে সব তো কাস্টমস্ পুলিস রেখেই দিলো।

বাইরে এসে কী করি না করি ভাবতে না ভাবতে ছোঁ করে আমার ব্যাগটা নিয়ে এক আবলুশী-চালক ভোঁ।...সারা পথটা ঘ্যানর ঘ্যানর...

"আচ্ছা ভূডুও নয়, ফোক্-ড্যান্সও নয়? তবে কী? কী চাই কুলী-সাহেব? ...মেয়ে? স্পানিশ? গরম গরম স্পানিশ। নরম নরম দোমিনিকান মাল?...নয় তো বেশরম কোঁৎকা আফ্রিকান,—মানে হেইতীর আস্লী মাল—স্পানিশ, ফ্রেঞ্চ সব কায়দায় তীরন্দাজ! কী চাই? কেবল মেয়েদের ক্লাব? কেবল পুরুষদের ক্লাব...আরে পয়সা দিয়ে রগড় দেখতেও তো যায় লোকে...(ক্যাথারসিস্? পার্গেশন্...মতি ঝরঝরে হয়ে টেনশন কমে আসে গো বাবু...)।

আমি অবাক হয়ে যাই। ক্লাব অর্থ কী তবে? বৃন্দাবনে, অযোধ্যায়, নবদ্বীপে এমনি কাৎরায় তীর্থ পাণ্ডা!! তীর্থ কাক!!!

রাগ করছেন কুলী-সাহেব? হেইতী তবে আসা কেন?

অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলি, আমার পিসিমা হারিয়ে গিয়েছে। খুঁজতে এসেছি! এবার বুঝলি?...ভাবলাম ঝামেলা থামবে বুঝিবা।

পিসীমা? কুলী?

না বাবা। তোমারই বোনের মতো সে। বয়সটা চারগুণ হবে।

বুঝলাম। নাম? পাড়া?

জানি না।...কোনো দুর্ভেদ্য জংগল!!

পেশা?

ছিলো চার্চের মালা গেঁথে বেচা। এখন কী জানি না। ভূডু হয়তো, হাউঙ্গান্-হাউঙ্গি, কোনো হাঁউ-মাউ-খাঁউ!!

চার্চ? মালা? পিসীমা? হাউঙ্গি আমি জানি। আণ্টি তান্তি। জংগল হাউঙ্গি!! তাশ্তিয়া বুড়ী...কিন্তু স্যার!

আমি বুঝেই বললাম, আমিও গরীব মোরিয়ে! আমিও গরীব।

দফ্নে মরিয়ে, ট্যাক্সি নং H ৮৩৩ আমাকে পেঁছে দিলো পাহাড়ের টং চুড়োর অথদ্যে একটা গাঁয়ের ভাঁজে। আণ্টি তাশ্তির পথ দূর থেকে দেখিয়ে দিলো। গাড়ি আর যাবে না।

আমি বাক্সটি হাতে নিয়ে গাঁয়ের মধ্যে অনিবার্য গ্রোসারী-কাম্-পানশালায় ঢুকে বললাম, এক গ্লাস সাইড্রাকস দাও।...যদি কোনো প্যারা সাক্ষাৎ মেলে!

ভাঙা ঝরঝরে দোকান।

ভাঙা ঝরঝরে?

কথাটার মূল্য চিত্রে। এ চিত্র বিচিত্র-ভাবে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের জানা, নানা ভঙ্গীতে, নানা রূপে, নানা কদর্যে, নানা কুৎসিতে। আমাদের ইহকাল পরকাল সবই তো ভাঙা ঝরঝরে।

কিন্তু হেইতিতে ভাঙা ঝরঝরে বলতে কী মূল্য ?

ট্যাক্সি যখন আসছিলো এপার-ওপার চওড়া একটা বড় পথের ওপব দিয়ে তুমুল ধুলো উড়িয়ে আসছিলো। দু ধারে অন্তহীন পেটা-টিনে ছাওয়া, নানান কাঠের টুকরোতে মোড়া, নড়বড়ে ঘরবাড়ি (?) ! একটিও মানুষ দেখলাম না পুরো পোশাক পরা। যতো শিশু দেখলাম সবই প্রায় উলঙ্গ ; যারা নয়, তারা উলঙ্গতর ;—অর্থাৎ কেবল দেহটাকেই উলঙ্গ করেনি,—আরও অনেক ক্ষুধা, অনেক আশা, অনেক অনেক উলঙ্গ করে রেখেছে ! দম যেন বন্ধ হয়ে আসে।

ট্যাক্সিয়ালা মরিয়ে বলছিলো,—পোর্তো-প্রিন্স-ক্যাপিতাল্ ; রু-দেভালিয়ে !

ক্যাপিটাল, রু-দেভালিয়ে-ই যদি পেটা-টিন এবং প্যাকিং-বাক্সের কঙ্কালভূষিত হয়ে রাজধানীত্বে ধন্য হয়, সে দেশে কী আর বলবো 'ভাঙা ঝরঝরে'র অর্থ ?

এমন অগ্র-পশ্চাৎ ভাঙা ঝরঝরে দেশ আর দেখিনি। কতোখানি বিকৃতি চেতনে-অবচেতনে আঙ্গিক ও মানসিক হয়ে গেলে তবে সারা সমাজ এমনি কালো-নোংরামীকে আঙ্গরাখা করে রাখে। ভাবতেও পারি না।

রু-দেভালিয়ে রাজধানী পোর্ত-ও-প্রিন্স্-এর একটি বড়ো রাজপথ। এ পথে কেবল গর্ত, ধুলো, বালি। পাশে পাশে রাবিশের, খোয়ার, চুনের, ভাঙা সিমেন্টের চাপড়ার স্তূপ। ছাগল, মুর্গী, কুকুরের ছয়লাপ। পথেব মাঝেই বাচ্চারা বল খেলছে ; বাচ্চার মায়েরা কাপড় কাচছে ; বাচ্চাব ভায়েরা হেথা সেথা জড়ো হয়ে জুয়া খেলছে ; বাচ্চার বাপেরা, খুড়োরা, ঠাকুর্দারা—নেশায় টলছে, ঝগড়ায় রগড়াচ্ছে ; রোগে কাৎরাচ্ছে, পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে।

সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সব রকম দীনতা সত্ত্বেও একটা বলিহারী আছে, সেজে-গুজে ফিটফাট হয়ে থাকা। রোববারের গির্জালু পোশাক সকলেই অল্প-বিস্তর রাখে ; ড্যান্সে বা পার্টিতে যাবার পোশাকও সবাই পরে। পোশাক পরলেই সবাই নিজেকে লর্ড ক্যারিংটন, কিংবা লেডি হ্যামণ্ড বলেই বোধ করে। "ফেট্" করার ব্যাপারে চার পায়ে এগিয়ে সবাই। শুধু মার্তিনীকে তা বারবনিতার সজ্জা ; সেন্ট টমাসে তা বিপণী ও বাণিজ্যের জৌলস ; বার্মুডায় তা শাদা পাড়ার বনেদিয়ানা ; বার্বাডোজে তা আদবকায়দায় ঢাকা। কেবল এক হেইতীতেই বেপরোয়া দারিদ্রের পরিণত নগ্নরূপ দেখেছি। আর একে আমি বলবো ডেমক্রাটিক সেলফ্ ডিটারমিনেশন।

এমনটা দেখেছি উৎকলে, রায়ালসীমায়, বর্ধমান-আরামবাগে, দক্ষিণতম দেশের তিনেভেলী-ত্রিচুন্দুরের সমুদ্রতীরে, বিকানীরের ফালোদী-মেড়তা অঞ্চলের বালুকীর্ণ গ্রামে, মহাসু পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে। কিন্তু সেই উৎকট দারিদ্র্যের মধ্যে চাপা হাহাকার আছে ; বিহ্বল-আর্ত পশুর মতো জীবনযুদ্ধে কোনো একটা দিক ধরে এগিয়ে যাবার ভরসা খোঁজার চেষ্টা আছে। কখনও কখনও তাদের চক্ষুকোটরে আগুনের ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ যেন দারিদ্র্যই নয় ; এই যেন স্বাভাবিক জীবন। এদের চোখের আগুন নিভে গেছে।

তাহিতীর জীবন প্রসন্ন আনন্দের চিরপ্রভাত। হেইতীর জীবন অপ্রসাদের কুণ্ঠিত

বঞ্চনাকেই জীবনের ভূরিভোজ বলে মেনে নিতে হয়েছে; সন্ধ্যার অন্ধকারটাই ওদের কাছে চিরজীবনের আলো।

অন্ধকারকে, নগ্নতাকে, দারিদ্র্যকে ভয় পায় না, এমন একটা দেশ, জাত—ঐ হেইতীর জনসাধারণ।

আমি আশিট তান্তির কথা জিজ্ঞাসা করার আগেই একজন আমার হ্যান্ডব্যাগটা অধিকার করে বসলো।

তার ফরাসী শুধু তারই ফরাসী। আমি যা বলি তা ওর কাছে ইংরিজী নয়। ও ইংরিজী 'জানে' এবং ও যে 'জানে' তা ও তল্লাটে সকলে মানে। সুতরাং আমি ইংরিজী জানি শুনে ওরা একচোট খুব হাসলো!

আমার মনে পড়ে গেলো প্রভাত মুখুজ্যে মহাশয়ের লেখা গল্পে 'I don't know' বাক্যের অনুবাদকের দুর্দশার ইতিহাস।

আমি ব্যাগটা নিয়ে উঠবো; লোকটা আমার সঙ্গ নিলো। তার বক্তব্য বিদেশে এসে যদি ব্যাগটাও আমি বইবো, তবে ওরা করবে কী! ব্যাগ বওয়া উপস্থিতক্ষেত্রে ওদের 'রাইট্'! এবং আমি তা যদি ভঙ্গ করি—তবে—

আমি সেই হাঁটাপথ ধরে চড়াই উঠতে লাগলাম। প্রুস আর সীডারের বন। অনেকটা উঠে পথ নীচে নেমেছে। হঠাৎ লোকটা চোঁ দৌড় লাগালো। নিমেষে ভোঁ হয়ে গেলো।

পাহাড়ী দেশে সিমলেয়, কাশ্মীরে, নৈনিতালে অমন হয়। দেখেছি। মালবাহক পাকদণ্ডী ধরে তাড়াতাড়ি মাল নিয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে সন্দেহ, মালবাহক জানে না আমি কোথায় যাচ্ছি। তবু ভাবলাম, বোধ-করি তাশিতয়া গুণগ্রাহিণী সর্বজনবিদিতা পান্থশালার নায়িকা।

কিন্তু সেই তান্তিয়া যে অতি দরিদ্র এক বেদেনী; সে যে কোনো সময়ে সুকুমার রায়ের "ভয় পেও না"-বুড়ীর অরিজিন্যাল বলে নিজেকে দাবি করতে পারে, মায় তার বাসস্থান সমেত, এ কার জানা?

বিপদ, সেও ভাষা জানে না। যা জানে 'ক্রিওল্'।

যখন মনে হতে লাগলো এ বিপদে না পড়ে হোটেলে গেলেই ভালো হতো।

তাশিতয়া আমাকে তার চৌহদ্দীতে ঢুকতেই দিলো না। আমি একটা পাথরের ওপর বসে বসে ভাবছি কি করি।

পকেটে টাকা এবং পাসপোর্ট সুরক্ষিত। মরিয়ে তার H ৮৩৩-এর দৌলতে আমার খোঁজ করবেই। মরেই যদি যাই কাস্টম এবং ৮৩৩ মিলে একটা খোঁজ লাগাবে। ফটো তো নিয়েই রেখেছে।

না লাগালেই বা কি। আমার মরার পর তখন—

হঠাৎ তান্তিয়া একটা ডাব নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কেটে আমার হাতে দিলো।

…মনে হলো একটু হাসলো যেন।

আমি চৌ-মুদ্রায় সেই নারিকেল ফলাম্বু গলাধঃকরণ করে গজভুক্ত কপিত্থবৎ খোলাটা দূরে নিক্ষেপ করলুম।

বুড়ী পুনশ্চ অন্য ডাব কেটে কলার পাতায় করে কয়েকটা মাছভাজা (ঠাণ্ডা) রেখে গেলো। আমি গাছের পেঁপে দেখালুম।

আমাকে কাটলাস দেখিয়ে শাসিয়ে খুব কতকগুলো গালিগালাজ ঝাড়লে। পরক্ষণেই সে কাটলাস নিয়ে পেঁপে গাছের গোড়ায় মারলে জবর কোপ।

আমি ছুটে গিয়ে পবিত্র বাংলায় বলি—তাশিতয়া, তুমি আমার পিসিমা হও, শাশুড়ীর বোন হও, শ্বশুরের দিদি হও, জামায়ের মা হও—দোহাই তোমার। চোটো না। কাটলাস হাতে তুমি চটলে আমি তিন তিরিখখে—পাঁঠা হয়ে যাবো। পেঁপে নাই বা দিলে হে শুভে! গাছটা কাটো কেন? ও পেঁপে চাই না, চাই না।

জানি না কিসে কী হলো। "বহু পূর্ব কথা যেন হতেছে স্মরণ" মুদ্রায় তান্তিয়া আমার ভাষাতরঙ্গের দিকে "চেয়ে" রুখে গেলো। তার মণিবন্ধ আমার হাতে ঠাসা। তার ভাঁটা চোখ আমার কুতকুতে চোখে ন্যস্ত (মাঝে মোটা চশমা)। আমার চোখে বাংলার ভ্যাদভ্যাদে ন্যাকা মমতা; ওর সারা বুক জোড়া একটা ক্ষুধার্ত দিগন্তের হাহাকার, শূন্যতা। সেই দাবদগ্ধ বুকে এক-জোড়া শুকনো চামড়ার ব্যাগ দুলছে আর দুলছে। মাথার শন-চুলগুলো গুটি পাকিয়ে রাজ্যের নোংরা কাটিতে ঢাকা; যে কটা দাঁত আছে হলদে হয়ে, মোটা হয়ে কদর্যতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

অসম্ভব কেয়া-বাৎ !! অবাক তাশিতয়া !!

কস্য পুত এই পুতনাকে ছুঁয়েছে?

বাঘের দুধ খাওয়া নাকি এ বাচ্ছা!

থামলো তান্তিয়া।

আমার হাতে কাটলাস দিয়ে বললো—ইণ্ডিয়া? ভুডু-ইণ্ডিয়া? রোপডান্স? (ডান হাতখানা সাপের গতিতে দুলিয়ে আকাশ পানে নিয়ে গেলো)। ম্যাজিক?

আমি যেন অকূলে কূল পাই। বলি, হ্যাঁ পিসী।

দেখলাম আমার ইংরিজীর চেয়ে বাংলাই বেশী বোঝে পিসী। বাংলায় হিং-টিং-ছট্ যে কার্যকালে সিদ্ধাই দেখায়, এটা কেবল মহাকবির গঞ্জিকা পানের ফল নয়। প্রত্যক্ষ তপোসিদ্ধ তন্ত্রমন্ত্র! তিনিও তো ভবঘুরে কম ছিলেন না!

কিন্তু তাশিতয়ার ভাই ছিলো।

বিকেলে এলো। নাম মার্কাস রিনোল্।

আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আবহাওয়া বদলে গেলো।

শক্ত, পাতলা চেহারা একেবারে ইস্পাতের বাঁধনে বাঁধা যেন। পাতলা ছুঁচলো ঠোঁটে চাপা হাতে গড়া পাইপ। বাড়ির তামাকপাতা নিজে তাতিয়ে কেটে গুড়-মেখে রাখে। মাথায় নিজের হাতে বোনা বাঁশ এবং পামপাতার টুপী। পরনে তিন-কোয়ার্টার প্যান্টের সঙ্গে সেলাইকরা হাত-কাটা শার্ট। পিঠটা প্রায় খোলা। দুটো খরগোশ মেরে এনেছে।

বাঁশের এক ডগায় মরা খরগোশ দুটো ; অন্য ডগায় একঝুড়ি বুনো ফল। আনারস আর কিছু ইয়াম্।

আমাকে যখন সে ইংরিজীতে জিজ্ঞাসা করলো, সকাল থেকে এখানেই ? তুমিই তো আসছিলে মরিয়ের গাড়িতে ?…এখানে কেন ? বুড়ী তোমাকে কাটেনি ?

এক ঝটকায় বললাম, কাটার পরে এই 'দশা' !

পরে কাটলাসখানা দেখিয়ে বললাম, কাটলাসই কেড়ে নিয়েছি। আমি বাতাশারিয়া। ভারতের ছেলে। দেশ দেখতে বেরিয়েছি।

হাত বাড়িয়ে বললো, মার্কাস রিনোল ঃ পুরাকালে পাইরেট নেভীর। এখন আর পারি না। তা-ছাড়া আমার বোন এখন একা থাকতে পারে না। ওর কেউ নেই। …আমার যারা আছে,…(হেসে বললো)…সব জায়গায়, সব সময়ে ছড়িয়ে আছে। আমার লোকসান নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তান্তিয়া খুব একচোট বকর বকর করতে লাগলো।

মার্কাস শোনে, আর ঝপ'ঝপ কতকগুলো গাছের ডাল কেটে—দুটো গাছের ফাঁক করা ডালের মাঝে গুঁজে দেখতে দেখতে একটা ঘরের ফ্রেম বেঁধে ফেললো।

মার্কাস্‌ও মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে নেড়ে কী বলে। ও যা বলছে, তা একটু। তান্তিয়া যা বলে তা থামতে চায় না। তান্তিয়া নিপুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খরগোশ দুটো পলকের মধ্যে ছাড়িয়ে ফেললো, যেন শার্ট খুলে দিলো। একটা কাঁচা ডাল ছুঁচলো করে মার্কাস তার হাতে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে দুটো খরগোশই তান্তিয়া গেঁথে নিলো সেই কাঠে।

সবাই চলছে যন্ত্রের মতো।

মার্কাস একটু ভেতরে গেলো। দুটো হ্যামক এনে দুটো গাছে বেঁধে দিলো। একটায় বসে বোতল আর দুটো গেলাসে সুরা ঢাল'র ব্যবস্থা করতেই আমি হাত উঁচু করি।

ও দুটো গেলাসই ভরলো।

একটা দিলো তান্তিয়াকে ; একটা নিজে।

মুখে বললো—তুমি তো সাইন্ত্রাক্‌স খানেওলা। নৈলে বাক্স খোয়া যায় ?

আমি অবাক হয়ে বলি, তুমি এ সব জানলে কখন, কোথায়, কী করে ?

গেলাসসুদ্ধু হাতটা তান্তিয়ার দিকে বাড়িয়ে দেয় মার্কাস।

এতক্ষণ বকর বকর করে তবে বলছিলো কি ? তুমি নেহাত ভারতীয়, আর ভারতীয় হিন্দুর ওপরে তান্তিয়ার জবর ভক্তি, তাই তোমাকে তাড়ায়নি। ওর দোরে কেউ কখনও আসে না।…একটু থেমে বললো—ও সব জানে।

আমার মাল কে নিলো জানে ?

জানে ? ও ডেকে আনবে তাকে। রাতে দেখবে।

কোথায় ?

তুমি তো ভুডু দেখতে এসেছো ?

শুধু তাই নয়। আমি তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি। অনেক হোটেলে অনেক থেকেছি। যে সব দেশ হোটেলে গিয়ে দেখা যায় হেইতী সে দেশ নয় বলেই আমি মরিয়েকে বলি—

হ্যাঁ তান্তিয়া তাই বলছিলো। আরো কী বলছিলো জানো? তোমার সঙ্গে নাকি সিদ্ধ-যোগিনীর স্পর্শ আছে। তোমার রক্তে নাকি মহাযোগী পুরুষের আশীর্বাদ আছে।

কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম আমার আজই শেষের দিন।

পেঁপে? গাছের পাকা ফল আঙুল দিয়ে দেখাতে নেই। গাছ মরে যায়।

কিন্তু তাতে মরুক না মরুক তান্তিয়া তো কুপিয়েই শেষ করছিলো গাছটাকে।

যদি কাটতো • !! ভাগ্যিস !!!

আঁতকে উঠলো যেন মার্সি।

কেন?

গাছের বদলে তুমি শুকুতে।

তাই নাকি? তবে বন্ধ করলো কেন?

তুমি গিয়ে হাত চেপে ধরেছিলে। অমন করে মন্ত্রপূত হাত কেউ চেপে ধরে কথা বলার সাহস করে না। সেই স্পর্শ থেকেই তো তান্তিয়া তোমাকে হিন্দু বলে জেনেছে।

আমি তা হলে ঠিক জায়গায় এসেছি বলো। কেবল বাক্সটা! এত যোগে বাক্স বিয়োগ মানায় না।

এ দেশে অমন চুরি বাটপাড়ি আছে। তোমার বিশেষ কিছু থাকে তো বলো আমি সবই ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারি। আর যদি বিশেষ কিছু না থাকে—দিয়ে দাও। ওরা বড়ই গরীব। তোমার চেয়ে অনেক—অনেক গরীব।

তান্তিয়া ভুডুর পুরুতনী! ওরা বলে 'হাউঙ্গি'। হাউঙ্গান্-রা পুরুত; হাউঙ্গিরা পুরুতনী। এদের প্রভাব হেইতীর সমাজজীবনে অসামান্য।

The Sunlit Caribbean পত্রিকায় Alec Wugh তাঁর এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন। মার্তিনীকান 'ভুডু' সম্পর্কে। এই সব 'ডাইনী' (?) হাউঙ্গিরা কী অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারিণী Wugh বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা। একজন Maid attendant-কে খানা-টেবিল থেকে বরখাস্ত করে অন্য খানা টেবিলে গিয়ে বসার অপরাধে চার রাত্রি ঘুমুতে পারেননি তিনি। অবশেষে ম্যানেজারের পরামর্শে পুনশ্চ সেই খানা-দায়িনীকে বহাল রাখার পরেই তিনি ঘুমুতে পেরেছিলেন। সে-মেয়ে ছিলো ডাকসাইটে গুণী। তাঁর মৃত ফরাসী স্বামী তাঁকে ফেলে ফ্রান্সে ফেরায় তাঁর আপত্তি ছিলো। আপত্তি সত্ত্বেও যতোবার তিনি আপত্তি অগ্রাহ্য করে দেশে ফিরতে চেয়েছেন ততোবার জাহাজ-ঘাটা থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে ফিরতে হয়েছে। অবশেষে তিনি ফ্রান্সে আর ফেরেননি।

কিন্তু হেইতীতে ভুডু একেবারে জ্যান্তো সত্য।

ভুডু আর কিছু নয় আফ্রিকান তান্ত্রিক অভিচার। এর সাধনা অন্যান্য সব 'খ্রীস্ট'-

শাসিত দেশে 'নিষিদ্ধ' হলেও হেইতীতে অবাধ অধিকারে পরিব্যাপ্ত। এর অনুশীলন ও চর্চাও নিরবধি ; এ বাবদে সমারোহ বিপুল। সাধারণ 'দেশ-দেখিয়ে'রা 'ভুডু' বলে যা দেখেন তা লণ্ডনে বা প্যারিসে চীনা বা আফ্রিকান রেস্টুরাণ্টে খাওয়ার মতো সাজানো ব্যাপার। আমার গোড়া থেকেই ভুডুর আসল তত্ত্ব দেখার ইচ্ছে ছিলো।

হেইতীর ইতিহাসে যে সংঘর্ষ নিগ্রোতে এবং মুলাতো-তে তার পূর্বকথা আর কিছুই নয়, রংয়ের আভিজাত্য!

মুলাতো অর্থে শাদা-কালোয় দো-আঁশলা।

দো-আঁশলার জন্ম যেখানে যখন হয়েছে, যে কারণেই হোক, জাতকের আভিজাত্য প্রমাণ করতে চায় যে তার মধ্যে শাসক কিংবা (প্রিভিলেজড্) বিশিষ্ট-সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর রক্তের চিৎকারটাই জোরালো। এই ভাবে কার গায়ে কতো পার্সেণ্ট শাদা রক্ত সেটা প্রমাণ করেই মুলাতোরা কালাদের চেয়ে নিজেদের বেশী 'মানুষ' বলে জাহির করতে চায়।

সাঁদমিঙ্গোতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন ফরাসী লেখক ছিলেন ; মোরে-দ্য-সাঁ-মেরী। তিনি রীতিমতো রিসার্চ করে গেছেন এই রং-দারী আভিজাত্যের কুলীন-সমাজের। কালো থেকে শাদায় ক্রমশ সমাজ উৎসারিত, পল্লবিত। সবার নীচে কালো। 'নিগ্রো'—একেবারে নিকষ কালো। দাস। আটের সাত ভাগই কালো—তারা 'সাকাত্রা'। তার ওপরে ষোলোর তেরোভাগ—'গ্রিফ্'! আট ভাগের পাঁচভাগ—'মারাবু'! ঠিক আধা-আধা হলেই সে যথার্থ 'মুলাতো'। মুলাতোর ওপরে 'কোয়াদ্রুন্'-এর গায়ে চৌথাই কালো। 'ওক্তারুন' বা 'সাঙ্গেমীলে'র গায়ে এক-আধ অংশ কালো। 'মামেলুক'দের গায়ে ষোলভাগের একভাগ মাত্তোর কালো। 'সাঙ্গেমীলে' এবং 'মামেলুক'দের মধ্যে আপস বিয়ে হওয়াও অবাঞ্ছনীয়। তাতে 'জাত' যায়। কৌলিন্যের বিধান, জাত-বিচার নিয়ে হিন্দুদের ওপরেই রগড়া-রগড়ি। হুজ্জতি সমাজ মাত্রেই বজ্জাতি। য়োরোপের কাৎলা-সমাজে 'হোফায়িগকিৎ' নামক এক কৌলিন্য-হুজ্জৎ সিদুনে অবধি ছিলো। জর্মনরা বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ইতালীয়দের যে কতো অপাংক্তেয় করে রেখেছে তা মুসোলিনী সম্বন্ধে হিটলারের 'আন্তরিক' উক্তিগুলোতে মালুম। জর্মনদের সঙ্গে য়ুহুদীদের বিয়ের কথা তুলে এই কালো-শাদা পাতাখানায় রক্তগঙ্গা করার বাসনা আমার নেই।

ফল ফলেনি তা নয়। হেইতীতে বেশ কিছু লোক জলপাই রংয়ের ইতালীয়দের মতো। আজও তাদের রংয়ের আভিজাত্য (!) আছে।

মাঝে মাঝে ভাবি এতদূর এসে নয়া দুনিয়ার বাসিন্দা হয়েও এমন কুণ্ঠাক্রান্ত মন এদের কেন? এক-একদিন হেইতীর পাহাড়ের ধারে বসে ওদের হাটবারের লেন-দেন প্রত্যক্ষ করতে করতে সূর্যকে, আকাশকে শান্ত স্বভাব ট্রেড উইণ্ডকে জিজ্ঞাসা করতাম এতো সুন্দর, এতো মহৎ এই মানুষ—বিশ্ব পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনায় মানুষের মনের

মতো একটা একচ্ছত্র নিঃসপত্ন সাম্রাজ্যকে অনায়াসে রাখা গেছে—তাকে এমন করে নিঃসীম অন্ধকারে জঘন্য কুৎসিত নির্বাসিত করে দিলো কে ?

পৃথিবীময় আজ শাদারা চাইছে সমাজ-বিধানের, জীবনের দাবী এক ধরনের সমাধান শাদাদের জন্য ; এবং তারাই চাইছে অ-শাদাদের জন্য অন্য ধরনের সমাধান। সারা যুদ্ধে এ্যাটম বোমার দরকার হলো না। যেই এশিয়ার কথা উঠলো—তৎক্ষণাৎ। আজ এ্যাটমিক মারণযন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে এতো যে জটলাবাজী—তার কারণ ভয়। যুদ্ধ হলে এশিয়ার শান্ত্রীরা য়োরোপ আমেরিকাকে ছেড়ে কথা বলবে না। অতএব ভয় !! টয়েনবী বারংবার 'চেতাওনী' দিচ্ছেন। শোনে কে ? ব্যবসাদারদের রাজত্বও ব্যবসাদারী !!

ফলে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গবমাই-খাই-খাই দেখছি য়োরোপ-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেশগুলোতে। এশিয়ায়, আফ্রিকায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, দক্ষিণ আমেরিকায়। এখন শাদা চক্রান্তের ভঙ্গী পালটেছে। ওরা চাইছে অ-শাদা দেশগুলোকে আপোষে খাওয়া-খাওয়ি করিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধ বজায় রাখা যাক। যখন যাবে না, তখন গরম যুদ্ধে আখাড়া হয় হোক ভিয়েৎনাম, কাশ্মীর, কঙ্গো, বোর্ডেশিয়া, বড়ো জোর এস্রায়েল, সাইপ্রাস—ব্যাস্। আর কাছাকাছি নয়। কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, জাপানে, তাইওয়ানে—চেষ্টা করে কিস্-সু হয়নি।

এই কারণেই আফ্রো-এশিয়া কনফারেন্সে রুশকে আসতে দেওয়া হয়নি ; রাষ্ট্রসংঘে চীনকে আসতে দেওয়া নিয়ে মন কষাকষি। এবং পশ্চিম-পূর্ব জর্মনীকে এক করে দেবার চাপ হয়ে উঠছিল গুরুতর।

ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সমাজে লড়াই বাধবে শাদা এবং অ-শাদার মধ্যে। অ-শাদারা অবশ্য বোকার মতো সামনাসামনি লড়বে অ-শাদায় অ-শাদায়। অর্থাৎ লড়তে বাধ্য করা হবে। তখন শাদারা হবে শিখণ্ডী। (ভিয়েৎনাম দেখা যাক। সুয়েজ স্মরণ করতে হবে।) তারপর শাদারাই হবে মাতব্বর, চৌধুরী। লড়াকুদের মধ্যে ফয়সালার ঘট বসিয়ে নিজেদের কাহন নিজেরা তুলে বাজীমাৎ করবে।

শাদা এবং কালোর মধ্যের এই তফাতে বেদে, দস্যু এবং আর্যদের সময় থেকে, কদ্রু এবং বিনতার সময় থেকে, সামসন এবং দেলাইলা, কেইন এবং আবেল-এর সময় থেকে প্রবহমান। শাদারা কালোদের নীচে এবং কালোরা শাদাদের দেবতাই ভেবে এসেছে। আজও অনেকেই অবচেতনে তাই ভাবে। এখানকার নিগ্রোদের স্বর্গ পারী-তে ; ভারতবর্ষের স্বর্গ লণ্ডন ছেড়ে নু-ইয়র্কের দিকে ধাবমান। শ্রিনিদাদের তাপমান সারা বছর ৭০-৯০-এর মধ্যে ঘুরফির করলেও, ডিসেম্বরে অনেকেই সোয়েটার কম্ফর্টার পরে ! এবং কথাবার্তায় 'শীত এলো' জানায়। দারুণ গরমে কালো সার্জের সুট চাপিয়ে কালো মহিষাসুরকে ফ্যুনারাল প্রসেশনে মার্চ করতে খুবই দেখা যায়।

শাদাদের 'হোম' যেখানেই হোক, কালাদের 'হোম' লণ্ডন কিম্বা প্যারিস। আসলে ওরা আফ্রিকাকে চায় না ; যদি বা চায়—পিঠ চাপড়ানোর জন্য।

নৈলে হেইতীর থিয়েটারে কালো রোমিও যখন শাদা রং চড়ায় খানিক বুঝতে পারি

(আসলে শাদার পার্টে ওরা কোনো রংই মাখে না); কিন্তু কালো অথেলো যখন ভুষোকালি মেখে নিজেকে 'কালো-নিগার' করে তোলে তার মানে বুঝতে পারি না। এটা এখনও চলছে। নিগ্রোরা যখন নিগ্রোর পার্ট নেয় তখন ভুষো মেখে প্রমাণ করে যে সে নিগ্রোতর হয়ে আর্ট সৃজন করছে। সারা য়োরোপে Hair Dressing নিয়ে ততো ঢেউমেলানো তদ্বিরীর বিজ্ঞাপন পড়িনি এই সব নিগ্রোদের যতো পড়েছি 'বাঁকা চুল সোজা করার' বিজ্ঞাপন! চুল সোজা হলেই নিগ্রো আর নিগ্রো নয়!!

মুলাতোরা তো বটেই, নিগ্রোরাও কায়েন-মনসা-বাচা শ্বেত-সভ্যতার পায়মানাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ওদের মধ্যে সভ্য সমাজে দিনের আলোয় ভুডু-র নাম করাও যেন ঘোর অশ্লীল অনাচার। ওরা সে সব সহ্য করতে চায় না।

আবার সেই নিগ্রোদের সামনেই শ্বেত-সভ্যতার প্রশংসা এবং নিগ্রো-অপকৃষ্টির উল্লেখ করে বিপরীত ফল দেখেছি। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ পণ্ডিতী এবং নাক উঁচাই হাঁকড়ে ওরা আরম্ভ করবে আফ্রিকার ঐতিহ্যের বড়াই। "আমরা দাস নাকি? গিনী কোস্টের দুর্ধর্ষ বীর জাতি আমরা। ধোঁকা দিয়ে আমাদের যেমন ওরা এনেছিলো তেমনি একমাত্র আমরাই সম্মুখে লড়াই করে পৃথিবীর সেরা ফরাসী পল্টনকে নিপাত করে সাম্রাজ্য গড়েছি।...দাস? অমন ঐতিহাসিক দাসত্বে তো কতোবার জীউরা, এরিয়ানরা, গ্রীকরা, রোম্যানরা বাঁধা পড়েছিলো!" এ ধরনের বাহবাস্ফোট বিচক্ষণ মস্তিষ্কতার পরিপন্থী। এর ফলে নিগ্রো বুদ্ধিজীবীরা নিগ্রো সমাজকে ধীরে ধীরে গণ্ডীবদ্ধ, এককোনা এবং হাস্যাস্পদ করে তুলছে। পরে এরই জন্য অনেকে নিগ্রো-তত্ত্বটাকেই তুচ্ছ করে ভাবতে শিখবে। নিগ্রো-দর্পিকতা বেড়ে বেড়ে ফেটে গেলেই বর্তমান জগতে স্বদেশিকতার মতো ব্যর্থকাম উৎপাত হয়ে দাঁড়াবে। ভবিষ্যতের পৃথিবীটা সারা-মানুষের পৃথিবী এটা এখন থেকে যারা দেখছে এবং দেখতে পারে তারাই দার্শনিক।

তাই মুলাতোরা নিগ্রোদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। না-পারুক; কিন্তু মুলাতোদের শাদারা আরও সন্দিগ্ধ চোখে দেখে। এই মুলাতো-নিগ্রো অন্তর্দ্বন্দ্বই হেইতী ইতিহাসে নানান ওঠা-পড়ার জন্য দায়ী। আমাদের দেশে এককালে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের যে কম্প্লেক্স্ ছিলো, আমাদের দেশে আজও সাহেবিয়ানা নিয়ে 'বড়ো' ঘরে যে সব বে-ইজ্জতী ব্যাপার ইজ্জৎ-এর নামে চলে—এ দেশে মুলাতোরা সেই সব কমপ্লেক্সে ভোগে; এবং নিগ্রোরা একই কারণে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে যে তারা ততো নিগ্রো নয়, যতো মুলাতো।

প্রাণীজগত এবং বুদ্ধিজগত একইভাবে চায় সমতা; একটা ভারসাম্যে উপস্থিতি ও বিরতি। রং নিয়ে, জাত নিয়ে, সমাজ নিয়ে এই অন্তর্দ্বন্দ্বেরই অন্য সংস্করণ ধর্মের মধ্যে পাই। ক্যাথলিকধর্ম ভুডুধর্মকে ঘৃণা করে। ক্যাথলিক মানে শাদাধর্ম; ভুডু মানে খাস নিগ্রোধর্ম। যে যতো ভুডু সে ততো স্বাদেশিক। যে যতো ক্যাথলিক সে ততো উদার, সভ্য, শিক্ষিত, কালচার্ড। তাই দিনের বহু ক্যাথলিককে রাতে ভুডু হতে দেখেছি; যেমন দেশে অনেক সাহেব-মারা নেতারা সায়েবী মেজাজ, মৌজ, মজা সময় মতো কয়েক গজ খদ্দরে এবং একটি গান্ধী টুপীতে ঢাকা পড়ে। (আর কী

পড়ে? সন্দেহ হয়!) বর্তমানে হেইতীর সামাজিক অবচেতনের সবচেয়ে বড়ো সংঘাত এই শ্বেত-কৃষ্ণ, য়োরোপ-আফ্রিকা, ক্যাথলিক-ভূডু সংঘাত।

সেদিন থিয়েটার দেখতে গেছি। বইটা কি মনে নেই। মনে থাকার কারণও নেই। আঁরি ক্রিস্তফ্ এবং শেকস্পীয়রের অথেলোর সঙ্গে ইউজীন ও'নীল মিশিয়ে এক কড়া পাক! বক্তব্য শাদাদের মেয়েরা কালো পুরুষকে সভায় ঠাঁই দিতে না চাইলেও শয্যায় আরতি করতেও রাজী; মনে ঠাঁই না দিয়েও দেহের রঙ্গে বিরতি দিতে অরাজী। সে এক দুষ্পাচ্য ব্যাপার।...আরও দুষ্পাচ্য যে নাটকে যারা তা-বড়ো তা-বড়ো ফরাসী গবর্নর জেনারেল, বিজনেস-ম্যান—এমন কি তস্য কন্যাজায়া, তারা কোনো রংই লাগায়নি; অথচ নটের প্রত্যেকেই নিরুপদ্রব নিগ্রো; প্রত্যেকেরই নিকষ-কুলীন কষা-মাজা রং। তবুও মেক-আপে কোথাও কোনো রকম শাদা-রঙের ছোঁয়াচও নেই।...অথচ আঁরি ক্রিস্তফ্, দেসালীন, এবং যাবতীয় নিগ্রো পাত্র-পাত্রী সকলেই কালিতে, ভুষোতে আগাপাশতলা লেপে দাঁড়িয়েছে যেন কালো জুতোয় থকথকে পালিশ! যারা পালিশহীন, মেনে নিতে হবে, তারা শাদা-ফরাসী;—এবং যারা পালিশদার তারা নিগ্রো; এই বক্তব্য।...চলছিলো। কোন সময়ে কালো অথেলো ক্রিস্তফ্ ঠাস করে চড়িয়ে দিয়েছে 'শাদা'-মেয়ের 'শাদা'-মাকে—তিনি মেয়েকে কালোর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করার সময়ে নায়ককে 'কালা-নিগার' বলেছেন। সামনে থেকে কে বলেছে 'শেম্'! অমনি পেছন থেকে শব্দ উঠলো, চোপ্-রাও শালা দো-আঁশলা।...মিনিট দেড়েকের মধ্যে আলো খতম। সেই চিৎকারিত অন্ধকারে কেবল শোনা যায়—শালা-মুলাতো; হারামীর বাচ্চা; বেজন্মা খানকীর পুত; কালাকুত্তোর গর্ভস্রাব; নোংরা নিগার; শোর-মুখো পশমী মোষ; কেইনের বাচ্চা;—চেয়ার ভাঙছে। স্টেজও ভাঙো-ভাঙো; একজন জ্বলন্ত একটা কেরোসিনের সাইকেল ল্যাম্প মারলো ছুঁড়ে পর্দার ওপরে। আগুন জ্বললো...

তারপর আমি আর থাকিনি। বাইরে এসে দেখি বন্ধুরা হাসতে হাসতে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "এখানে এই। বলেই তো ছিলাম—থিয়েটার বলতে সে থিয়েটার নয়..."

আমি গাইলাম আমরা অবোধ বোলে তাই, নাটক দেখতে যাই, অকারণে হারাই অমূল্য সময়। সঙ্গে সঙ্গে কলম বার করে নোট নি, "হারায়নি, হারায়নি। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।"

কোন অবচেতনিক প্রবাহপথে সপ্তদশ-অষ্টাদশের "মধ্যস্রোতিক পথ" (middle-passage)-এর দাস-পরিবহনের সেই কলুষ-কল্মষময় অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্তগুলো যুগান্তর যাত্রার পাড়ি দিয়েছে সংগ্রাম করতে করতে। বোবা-ভাষার সেই অবরুদ্ধ সংগ্রামের স্বীকৃতি আজ অবিমুক্ত। শাদারা আজ নেই; কালোরাও ভুলে গেছে আরণ্যক আফ্রিকার কিনারে থরে থরে প্রাচুর্য-মণ্ডিত সোনা-গাঁর দ্বিধাহীন অকুণ্ঠ জীবন। তবু যেন রক্তে, মজ্জায়, সুষুম্নার কুণ্ডলী পাশে আবদ্ধ স্বপ্নে পূর্বগানুকৃতিকতার

(atavistic) দুর্দমনীয় রুক্ষতা। ইতিহাসের রক্তাক্ত পাতার সীমান্ত পার হয়েও সে রুক্ষতা সঙ্কর-সমাজের কোষে-কলায় বর্ণ-চৈতন্যকে ভাগে ভাগে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছে।

শাদা থেকে শাদাতরকে হেয় থেকে হেয়তর করায় এদের স্বাধীনতা বোধ সার্থকতা পায়। দাস গেছে, দাসত্ব গেছে; কিন্তু বিদ্রোহের স্বভাব-চেহারাটাই বিদ্রোহীর ইতিহাসকে বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ওরা আজও বন্দী ওদের এই পুর্বানুকৃতির অবচেতনের নিরন্তর চিৎকারের কাছে। সে চিৎকার সারা হেইতী সমাজে ওতপ্রোত।

সে চিৎকারের খোলষা জায়গা চার্চ নয়। সে চিৎকারের পূর্ণ মুক্তি পাওয়া যায় না চার্চের উন্মুক্ত, জগদীশ্বর-মাদকতায় সুললিত, স্বর্গ-চাওয়া সভ্য প্রার্থনা সভায়। সে চিৎকার খোলষা হয়ে ধরা দেয় অন্ধকারে পাহাড়ের পেটে কুণ্ডলী পাকানো পথের ধারে বন-বনানীর জটা-বাকলে ঢাকা কোনো আস্তানার মধ্যে। রাত্রের সুড়ঙ্গপথে, মদের পিচ্ছিলতায় দুরন্ত কোকেন আর্সেনিক. মর্ফিন, মেথিলবেঞ্জিনের ক্ষেপিয়ে দেওয়া স্বয়ং-কেন্দ্রিক স্ফুরিত-বাসনার যোগধৃত আস্বাদনে। চার্চ নয়, অ-চার্চ; স্তব নয়,—চিৎকার; পূজা নয়,—বলি; সমাধি নয়,—উন্মত্ততা; দেবতা নয়,—প্রেত; স্বর্গ নয়,—রসাতল। তার নাম ভুডু। ভুডুর উন্মুক্ত, উত্তপ্ত, উদ্দীপ্ত, উৎসারিত জঘন্যতা ছাড়া বর্বর-পশু অবচেতনের মহাদেশ সামান্য হেইতী সমাজে ছাড়া পেতো কোথায়? ভুডু-ই হেইতীর সমাজ ইতিহাসের অনিবার্য কলিযুগ, যার আরম্ভ হয়েছিলো সত্যযুগের প্রথম সৃষ্টি মধু এবং কৈটভের অবিনশ্বর সংগ্রামে। ক্যারাবিয়ানে স্বর্গ আছে; তাকে পাওয়া যায় জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে; ক্যারাবিয়ানে নরক আছে; তাকে পাওয়া যায় নিগ্রোত্ববোধে মলিন নিগ্রোসমাজের অবচেতনে। সেই অবচেতনের একটা প্রকাশ সাহেব অনুকৃতির বাহবাস্ফোটে, সদর্প অতিশয়তায়;—সেই অবচেতনেরই অন্য প্রকাশ,—ডাকিনী তন্ত্র, অভিচার, নৈশ-অনুষ্ঠান, ইন্দ্রজাল, ভুডুতে।

অনেকবার ভুডু-দরবারে প্রবেশ করেছি। বিশেষত হিন্দু, ভারতীয় আমি। সংস্কৃত জানি। তন্ত্র পড়েছি। চীনাচার সম্বন্ধে, মহাযন্ত্র-মহাযোগ সম্বন্ধে পড়াশুনা করেছি; এসব জানার পর ভুডু-চক্রের মধ্যে গতিবিধিও অবাধ হয়েই গিয়েছিলো। ভুডুর প্রভাবে নিজেও অনেক সময়ে অভিভূত হয়ে যেতাম। সে অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র; একক। "তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ"-এ দ্বারকা-নদীতীরে তারাপীঠে বামাক্ষেপার চক্র-বর্ণনা মনে পড়ে; মনে পড়ে কামাখ্যার মহাপীঠে সমর্থ-সাধকের সেই আশ্চর্য যোগ-প্রকল্প। তেমনি এ অনুভূতি।

মন্ত্র-তন্ত্র-যোগ-যাগ,—ঈশ্বরদর্শন, নির্বিকল্প সমাধি, অপরোক্ষানুভূতি, এ সবে 'বিশ্বাস' করো, আছে; 'বিশ্বাস' না করো;—তবু আছে। কারণ, ব্যাপারটা বিশ্বাস-নির্ভর নয়; প্রত্যয় সাপেক্ষ; ন্যায়, যুক্তি এবং মীমাংসা সাপেক্ষ। সে-কোঠায় পৌঁছতে গেলে যে নিরুদ্বিগ্ন অধ্যাস এবং সমর্থ চালকের প্রয়োজনীয়তা তা আমাদের অসহিষ্ণু

অসংযমী দেহে মনে নেই। তাই 'বিশ্বাস'-এর হাতে 'সত্য'কে সঁপে দিয়ে আমরা দিই চোঁ-দৌড়।

আমিই কি বিশ্বাস করি?

করিয়ে ছাড়ে।

নৈলে দেশ দেখতে এসে এ অলৌকিক অনির্বচনীয়কে দেখবো কী করে।

হেইতীতে, জ্যামায়কায়, এমন কি ত্রিনিদাদেও নানান ট্যুরিস্ট ব্যুরো ভ্রমণবিলাসীদের মন জোগানোর জন্য 'আসলি-ফরাসী মেয়ে', 'ঘরানা-ক্রিওল্-সুন্দরী', 'তাজা-আরাওয়াক বনবালা'র মতো দফায় দফায় 'ভুডু'-তীর্থও দর্শন করিয়ে দেয়। কচু দেয়। আসল ভুডুর দফা রফা করে। আমাদের দেশে আমেরিকান গেলেই খোঁজে যোগী। বম্বে-কলকাতা তো যোগীতে যোগীতে আচ্ছন্ন। ইংরিজী-জানা যোগীদের আশ্রমে আশ্রমে সমুদ্রতীরের শহরগুলো, এবং হরিদ্বার-হৃষীকেশ-কনখলের নালা ভরাট হয়ে গেলো। যোগী দেখতে গেলে কি আর রিটার্ন টিকিট কেটে টাইমটেবল্ বগলে দাবিয়ে গলায় ক্যামেরা দুলিয়ে লটোবরটি সেজে-গুজে গেলে চলে?

তেমনি ভুডু!!

হেইতীতে অনেকদিন থাকার প্রথম এবং মোক্ষম লাভ এইটি। মজাদার ইতিহাস, আশ্চর্য অরণ্য শোভা, স্বভাবদীপ্ত গিরিশিখর, নবরাগ গহন সমুদ্রজঙ্ঘা বেলা-বলয়িত ঊর্মিমালিকার লাস্য—এসব ঢের দেখেছি, দেখবো। কিন্তু মানুষ! হে মানুষ, তুমি তোমার মনের গহনে, মনের অরণ্যে, মনের শিখরে, মনের দীপ্তিতে, মনের লাস্যে, নৃত্যে, চাতুরিতে, প্রেমে, দৈন্যে, ক্ষুধায় কতো বিচিত্র, কতো স্বাত্মিক! তোমাকে যখন যখন জানতে গেছি, তিন কাঁচের পাকলার মধ্যে বাঁধা তুচ্ছ বর্ণালী কাঁচের দানার মতোই, বন্ধনে আড়ষ্ট হয়েও তুমি প্রতিবারের হেলনে নতুন, প্রতি মোড়ের মাথায় অবাক করা এক এক খণ্ড সাম্রাজ্য। প্রতি স্পর্শে নিঃশ্বাস, বেদনে-সংবেদনে, বোধে সংবোধে সম্পূর্ণ নতুন।

নাপিতের দোকান; সস্তা সরাইখানা; মদের দোকান; বেশ্যা পাড়া এবং চার্চ—'দেশ' দেখার জন্য না হোক, দেশ 'জানার' জন্য এর দু-একটায় সময় কাটানো অবশ্য করণীয়। এইখানেই উল্লেখ করা ভালো যারা জিমখানা ক্লাবে, রোটারি ক্লবে, প্রেস ইন্টারভ্যুতে, ডিনারে, বাঙ্কোয়েটে—'দেশ' জানতে চায় তারা রাংতার বাহার দেখে সন্দেশের রস বিচার করে।

শ্যাম্প-দ্য-মার্স উর্বশী পাড়া। মার্কাস সে সন্ধ্যায় আমাকে এনেছে ঐ পাড়ায়। আসার কথা ছিলো না। বলিওনি; উল্লেখও করিনি যে আমার দেশ দেখার থিওরীর মধ্যে এই ঘাটে ডুব দেওয়াও দার্শনিক আবশ্যিকতা। কিন্তু মার্কাস এলো। আমি দেখলুম যা চিরন্তন শহরের চিরন্তন চিত্র। ঘুপ্টি ঘুপ্চি ঘর-সহায় রকসর্বস্ব বাড়ি। ঘরের মধ্যে অন্য ঘর। বাইরের ঘরে দু-একটা চেয়ার। ছোটো টেবিলের পাশে দেয়ালে ঠেকানো পোশাকী ঝিলমিলে সাজানো আলমারী। তারপর পর্দার ফাঁক দিয়ে অনাদি অব্যাহত সেই স্প্রীংদার লোহার খাটে পরিপাটি দাঁতকপাটি বিছানাখানা। অতো আলো

ছেড়ে বাইরের এক চিলতে বারান্দায়, নয় তো সিঁড়ের ধাপে বসে আছেন নায়িকা। সামনে বালব আছে কারুর কারুর। পথের ধারে ধারে ল্যাম্পপোস্টের তলায় যারা আনমনা দাঁড়িয়ে ওরা পুরুষ হলেও পুরুষ নয়। ওরাই দূতী; টাউট—কলকাতার ফিটন-ওলা। "বাবু, মেয়ে চাই? আর্মানী, পঞ্জাবী, জাপানী, অংরেজী?" এখানেও তাই। সঙ্গে নেহাত মার্কাস। দেখেছি মার্কাস নিদারুণ ভাবে সবার পরিচিত। তাই কিস্সু বলছে না।

এ পাড়ায় কেন মার্কাস?

দেখো না; শোনো। চোখ নয়; কান।

চাঁদের আলো শুক্লা অষ্টমীর। দূরে পথ শেষ হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। পথের অন্যপ্রান্ত সমুদ্রতীরে। কিন্তু সমুদ্র দেখা যায় না। ওদিকেও পাহাড়। তার গায়ে ধবধব করছে ক্যাথলিক গির্জা। ফাদার বেস্‌কোম্ ঐ গির্জায় আছেন গত একচল্লিশ বছর। লোকে আর গির্জা দেখতে যায় না। ফাদার বেস্‌কোমকে দেখতে যায়।... সামনে যেদিকে পথ শেষ—পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে বসতি। টিম টিম করছে আলো। জঙ্গলের মধ্য থেকে আলো দেখা যায়। পাহাড়ের ওপার থেকে একটা গুম্‌গুম্ শব্দ।

চোখ নয়; কান।

কান শুনছে। জঙ্গল; জঙ্গলের গহ্বর। চাঁদের আলোয় ধোয়া পাহাড়ের খাদ তেমনি কালো, তেমনি গহন। সেই খাদের মধ্য থেকে শব্দ উঠছে গুম্-গুম্।

পচা নোংরা শহর শেষ হয়। শহরের বোকাটে গন্ধ; পাংশুটে ধুলো; রুক্ষ ধোঁয়ার কুণ্ডলী শেষ হয়। শেষ হয় বারবনিতার ক্ষুধাতুর রিরংসু পাড়া। পা রাখি নুড়ি-পাথরে ছাওয়া পাহাড়ী পথে। কয়েক গজ দূরে একটা পাহাড়ী নালা বয়ে যাচ্ছে। তার কুল কুল শব্দ। দমকা বাতাসের দোলে বনময় একটা গুঞ্জন।...আর মুচকুন্দ ফুলের নম্র নিবেদন।

আর সেই গুম্ গুম্ শব্দ।

আমি মার্কাসকে বলি, আগে বলোনি তো আজ তুমি ভুডু মন্দিরে যাবে।

আগে আর পরে কি? বলা আর না-বলা কি? তাম্তিয়া আজও এ জগতের মহামান্য রানী বিক্টোরিয়া। তান্তিয়া ওদের খবর দিয়েছে। আমি জানি তুমি আসবে। তোমার ওপর তান্তিয়া খুশ। তোমার সাত খুন মাপ। নৈলে এ তল্লাটে সাত দশকে সত্তর খুন হয়ে গেছে। এখানে প্রাণ ছাড়া বলি নেই; রক্ত ছাড়া পুজো নেই; মাংস ছাড়া খাদ্য নেই; মদ্য ছাড়া পানীয় নেই; রতি ছাড়া সমাধি নেই; কঙ্গো বলো, কেনিয়া বলো, মাও-মাও বলো, তাঙ্গী, ভুকুন্দী বলো—নরমাংস নিয়ে এমন নাচ-গান-হৈ-হুল্লোড় শ্মশানেও পাবে না। আমি কী জানতাম নাকি? কিন্তু সাবধান ফটো নেবে না; কথা বলবে না; প্রশ্ন করবে না; এবং বনের মধ্যেও কোথাও যেন ভয় রেখো না, দ্বিধা রেখো না। দেখো যা দেখার; শুনো বেশী। ভুলে যেও আরও অনেক বেশী। নৈলে—

আমরা এগুতে থাকি।

ক্রমশ বসতি শেষ হয়ে যায়। পাহাড়ের একটা ভাঁজ পেরিয়ে খাঁড়ির দিকে মোড় ফিরতেই পাম-পাতার ছাউনী-ঢাকা একটা দোচালা। ভূডুর-'মন্দির' বলে না ; বলে 'ঢোনেল্'। বাইরে জটলা। কারুর মুখ দেখা যাচ্ছে না। মার্কাসের সঙ্গে আমাকেও ওরা দেখলো কি-না বোঝা গেলো না। ভিতরে চলে গেলাম। প্রথমেই পেলাম অপরিচিত একটা গন্ধ। চড়া—কড়া গন্ধ। একধারে 'রাম্বা' ঢোলক ; পরপর তিনটে। তিন জোড়া হাত পিটুচ্ছে। বেশ বোঝা যায় বাজাচ্ছে না ; শব্দ-সংকেত করছে। মাঝখানের কড়ির ওপর দিয়ে একটা গ্যাস লণ্ঠন জ্বলছে। ফলে তলাটা অন্ধকার রয়েই গেছে। চারধারে আলো যা হচ্ছিল পাতার দেয়াল সব আলোটাই চুষে নিচ্ছে। 'রাম্বা' ঢোলকগুলো আমাদের খোলের আড়াইগুণ। তবে এ খোলের খোল হবে কাঠের। বাজবে বড়ো দিকটা। সরু দিকটা মাটিতে রাখা একটা গোল পিঁড়ের ওপর বসানো থাকবে। বিশাল চামড়া আটকানো থাকবে খোলের গায়ে গোঁজা কাঠের খুঁটোয়। এক একটা খোল থেকে এক এক গ্রামের শব্দ। মাদলের মতো। খোলের দু পাশ দিয়ে পা ছড়িয়ে দিয়ে বেঞ্চিতে বসে দু হাত দিয়ে একদিক পিটে নানা শব্দ বার করা।

ঠিক অপর দিকে ঠাকুর দেবতা সাজানো একটু পৃথক এবং বেদী-ব্যবস্থা : নাম হুম্ফর্। দেবতা পুজোর প্রধান অঙ্গ ঢোলের বাদ্য। বলিতে যেমন ঢাকী ; তেমনি ভূডুতে রাম্বা-ঢুলী। পুরুতের মতোই ঢুলীরও সম্মান। সঙ্গে যেমন আমাদের থাকে কাঁসীর কন্‌কন্—এদের আছে নস্ত এক লোহার কড়ার ওপরে লোহার একটা হ্যাণ্ড্‌ল্-এর নানান জায়গা নানান ভঙ্গীতে জোরে পিটিয়ে নানান্ গ্রামের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে।

অনেকক্ষণ শুনতে শুনতে ঝিম ধরে। শরীর যেন রসস্থ ভারী হয়ে ওঠে। মগজে যেন এক ধরনের তরঙ্গ-সংঘাত হয়। মনকে ব্যক্তিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক বিমনতায় নির্বাসিত করে দেয়। তিনটে রাম্বা পিটছে। রাম্বার গায়ে নানা চিত্র বিচিত্র। প্রত্যেকটার সঙ্গে প্রত্যেকটা রাম্বা সুরে বাঁধা। এক সুরে নয়। সবার বড়োটা যেমন উদারায় 'সা' ধরে রেখেছে তেমনি ছন্দটাকে চালিতও করছে। সেই চলনের গতির সঙ্গে অন্য দুটো রাম্বা সুর মিলিয়ে দ্রুততর সোমে উঠছে, নামছে ; বিচিত্র তরঙ্গ তুলছে। রাম্বার ভাষা আছে।

মন্দির—অর্থাৎ হুম্ফরের দিকে দৃষ্টি যেতেই এতো জিনিস একসঙ্গে দেখলাম, প্রথমটা ঘাবড়ে গেলাম। সাবধানে তাকের পর তাক, থাকের পর থাক, সাজানো। আমাদের দেশে মাটিতে গোবরে সাঁওতালরা, বিহারী গ্রামীণরা যেমন নিমের তলায় বা অশ্বত্থ তলায় মন্দির-তাক গড়ে। সমশ্বিবাহু ত্রিভুজ, পীঠটার ওপর দাঁড়ানো। মূলতঃ বিপরীত যোনি-মুদ্রার প্রাধান্য। সেই মন্দিরের মাথায় ঝুড়ি ঝুড়ি শামুক-পুঁতি-কাঁচ-কড়ি-প্রবালের মালা। যোনিমুখ-কড়ি এবং প্রবালের প্রাধান্য এখানেও। প্রধান বিগ্রহ যে কী তা মালার দৌরাত্ম্যে টের পাওয়া গেলো না। সামনেই বিশালকায় সুরাধার ; ভুল হবার জো নেই। স্কচ হুইস্কি এবং ওল্ড-ওক রাম, রাশ্যান-বেয়ার রাম ; ডেমারারা রাম, বোতলের পর জগদ্দল বোতল। বড়ো বড়ো সরার মধ্যে মোমবাতি জ্বলছে। ধুনুচীও আছে। লোবান এবং অন্যান্য সুগন্ধ 'ফ্রাঙ্কিন্‌সেন্স্' পুড়ছে।

নানাপ্রকার মৃৎপাত্র। বেশীর ভাগই গ্রীসীয় জার বা সুরাহীর মতো। মাটির থালায় পাঁউরুটি, কেক, কাজুবাদাম, খেজুর। ভাঁজ করা তালপাতার ছোট ছোট চাটাইয়ের ঘর। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে রক্তবর্ণ বস্ত্রখণ্ড। নানা রকম মূর্তি, পুতুল। ছাপা কাপড়ের ওপর নানা ধরনের ধাতুময় যন্ত্রাদি। দেয়াল ভর্তি ছবি। রানীর ছবি, তুস্যাঁর ছবি; লর্ড নেলসন নামে আখ্যাত এক রক্তমুখ, দীর্ঘকেশ বীরপুরুষের চিত্র। যীশু আছেন, মেরী আছেন, ক্রুশ আছেন। সাপের কন্যা, সাপের কুণ্ডলী, লেজে ভর দিয়ে লতিয়ে ওঠা সাপ, মারমেড্—অর্থাৎ সমুদ্রকন্যা, রক্তক্ত হৃদয় (ব্লাডীং হার্ট)। কিন্তু ভাববার অবকাশই বা কই। ঘরময় বিস্বাদ ধোঁয়া। গন্ধটা মনে করিয়ে দিচ্ছে মণিকর্ণিকায় ডোমের আস্তানা এবং লম্বা কলকে।

জোর জোর বোল চলছে; ধাকা ধিন্ না, ধাকা ধিন্ না, ধিন্ না, ধিন্-না, ধাকা-ধাকা-ধাকা-ধিন্ না···মাথা ঝিম ঝিম করে। গুরু গুরু করতে করতে নেমে যাচ্ছে। একসঙ্গে বিশ ত্রিশজন মহিলা নাচতে নাচতে নীচু হতে হতে মাটিতে প্রায় লুটিয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই লয় বাড়তে থাকে; মাত্রা চড়তে থাকে; স্বরগ্রাম মুদারা থেকে তারায় চলে; —সমুদ্রের ওপরের স্রোতের ওপরের স্রোতের তলায় যেমন নীচের স্রোতের টান সঙ্গে সঙ্গে থাকে—তেমনি কাঁসী (?) এবং ঢোলের লয়ের ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের গলা থেকে কুন কুন করে একটা মৃদু-গুঞ্জন-কাকলী আর্তির বন্যা ছড়িয়ে দেয়।

তখন দেখি চালার মাঝে একটা বড়ো খুঁটো। মোটা খুঁটো। নানা রংয়ে সাজানো! মালায়, রঙিন কাগজে মোড়া। কড়ি, চুলের বেণী, কাঁচের গোলা, নানান রকমের প্লাস্টিকের পশুপাখি—সব ঝোলানো। সেই খুঁটোর তলায় শাদা গুঁড়োয় মাদ্রাজীদের মতো আলপনা। নেচে নেচে মেঝেটা শাদা গুঁড়োয় ভর্তি হয়ে গেছে; মেয়েদেব কালো পা শাদা হয়ে গেছে। মেয়েরা সকলেই লম্বা হাত ঢাকা, গোড়ালী অবধি ঢাকা শাদা গাউন পরেছে; কোমরে একটা রঙিন কাপড় দিয়ে বেল্ট বেঁধেছে। ফলে গাউনটা যেন আরও ফুলে উঠেছে। মাথায় ফুলাদের মতো করে বাঁধা ব্রীডিং মাদ্রাজ, কিংবা অন্য কোনও রঙিন রুমাল। কিন্তু শাদারই প্রাধান্য।

খুঁটির পাশে বিরাট এক ক্রশ্। ক্রশের মাথায় ছাদ-মাথা টপ্-হ্যাট। ক্রশের আড়াআড়ি কাঠখানায় একটা কোটের দুই হাতা পরানো। ক্রশের গায়ে ঠেক্‌নো-রাখা একখানা ছড়ি। মেঝেতেও একটা টপ্-হ্যাট, একটা ছোটো টেবিলে রাখা তামাকের পাইপ, মদের বোতল-গেলাস, এক প্যাকেট চুরুট; একটা লাইটার। থ্রী-পীস স্যুটই একটা পরিধান করে আছে অন্য এক ক্রশ। বিচিত্র এ ক্রশ যে কি, তখনকার মতো বোঝা গেলো না।

যারা নাচছে, নানা বয়সী। জাঁদরেল দশাশই দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে যিনি তিনিই প্রধানা 'হাউন্সি'! এ ছাড়া 'বোসালে' এবং 'চাঙ্গো'—দুটি বিভিন্ন পর্যায়ের ভূডুসেবিকা। প্রথম দল সদ্য দীক্ষিতা; দ্বিতীয় দল একটু ওপরের স্তরের। ভূডু-পুজার রাতে নাচ-গানের প্রথম মোহড়া ধরনেওয়ালী বোসালো এবং চাঙ্গো। প্রধানা মোহান্ত্নীকে বলা হয় মাম্বো (Mam-bo! Ma'm কি মাতাজী ধরনের কিছু?)। কিন্তু যাঁরা

সিদ্ধাই লাভে ধন্যা, যাঁদের অঙ্গুলি হেলনে তাজা গাছ শুকোয়, শুকনো গাছ তাজা হয় ; দৃষ্টিপাতেই রাতে ঘুম ঘুচে যায়, কিম্বা চিরকালের জন্য ঘুমিয়েই পড়ে ; আকাশ পথে যাতায়াত যাঁদের, নদীর তলা কি সাগরের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার মতোই সত্য —তেমনি সিদ্ধ-যোগিনীকে বলে হাউঙ্গি ;—যেমন আমাদের অশীতিপরা তান্তিয়া ; যার বয়স পোর্তো প্রিন্সের লোকেরা জানে শতাধিক।

ঘুরে ঘুরে নাচ। হাত ধরাধরি নেই। কিন্তু ঘেরটা কাছাকাছি। এক পা এগুনো, এক পা পিছুনো ; দুলে দুলে। গলাটা সুড়ুৎ করে এগিয়ে যাচ্ছে ; কাঁধটা দুলে উঠছে দুগুনো তালে ; সেই তালের সঙ্গে সোম রেখে উঁচিয়ে তোলা বর্তুল নিতম্বের মাংসল পিণ্ড দুটি সমগ্র মেরুদণ্ডসহ দুলে উঠছে। সবটাই ছান্দসিক : প্রত্যক্ষ ; মাংসল ; জৈব। মন্ত্রও আছে কিছু একটা। অস্পষ্টোচ্চারিত ; কিন্তু মাত্র ছোট্টো কোনো একটি মন্ত্র। সকলের চোখ আধ-বোঁজা ; চিবুক-সহ চোখ দুটো ওপরে-নীচে ওঠাচ্ছে-নামাচ্ছে। হঠাৎ ঢোল তার ছন্দ বদলাবার দোহাই মারে। সকলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে দেহের ভঙ্গী বদলায় ; নাচের ছন্দ বদলায় ; গতি দ্রুততর করে ; লয় খরতর করে ; মন্ত্র পালটে অন্য মন্ত্রের পুনরাবৃত্তিকে আধো অন্ধকারে, ধোঁয়ায়-ভরা গূঢ়-আবেশে রহস্যসঙ্কুল করে তোলে।

হঠাৎ কন্-কন্ ঝিণ-ঝিণ সুরে কী বেজে ওঠে। বদ্ধ বাতাস যেন কষায় ; বদ্ধ মনের কুণ্ডলী যেন পাক দিয়ে নাড়া খেয়ে ওঠে। চমকে তাকাই ; সারা গায়ে সাদা আলখাল্লায় ঢাকা, মাথায় মখমলের ওপর পুঁতি-পালক-রঙিন কাঁচের কাজকরা শিরস্ত্রাণ একটি বৃদ্ধ একটা দেয়ালের গায়ে আলতো হেলান দিয়ে গভীর সমাধিতে ঢুলছে, দুলছে। হাতে তার একটা ঘণ্টি। অন্য হাতে লম্বা-গলা লাউয়ের কমণ্ডলু ; কমণ্ডলুর গায়ে পুঁতির মালা, কড়ি, সাপের মেরুদণ্ড এবং প্রবালে গাঁথা জাল। হাতের ঝাঁকড়ানির সঙ্গে সঙ্গে পুঁতির মালা, শুকনো মোটা আঁশের মালা আঘাত করছে লাউয়ের গায়ে ; অদ্ভুত গোমরানো কনকনে একটা শব্দ উঠছে ; আর তার সঙ্গে হাতের ঘণ্টির কন্ কন্।

বাতাস গম্ভীর হয় ; মন ভারী হয়ে ওঠে ; চোখ বুঁজে আসে ; রক্তে ঝিম ধরে ; গ্যাসের আলোটাকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন ঠেসে ধরে।

পুরুৎ-হাউঙ্গান চমক লাগানো আকস্মিকতার সঙ্গে মন্ত্র পালটে দেন। এবং বোসালো হাউঙ্গিরা মন্ত্রের আখরটা নিয়ে দোল খায়, আর খায়, আর খায়। সামান্য ঘরখানা তখন আগুনে, গরমে, ঘামে, ধোঁয়ায় ভীড়ে ভরে গেছে। ভীড়—ভীড়। পদচাপ পড়ছে তালে তালে। সে তাল যেন ঘরের বাইরেও পড়ছে। ভীড় যেন বাতাসে। ভীড় যেন মনে। অবরুদ্ধ মনের জটলা ভেঙে রাশি রাশি চিন্তার ভীড়, জানা-অজানা চিন্তার ভীড় ; চেনা অচেনা চিন্তার ভীড়। মন্দিরের বেদীতে যেন একটা জলাধার কেঁপে উঠলো। জল থেকে একটা লোহার ডাণ্ডা বেরিয়ে আছে। তার গায়ে জড়ানো লোহার দুটো সাপ। উনি 'দাম্বালা'—সর্প দেবতা। আইরীশ-দেবতা সন্ত্-পাট্রিক সাপ-ভক্ত। তিনি বর্শার ফলার ঘায়ে সর্প দেবতার মাথা গেঁথে ফেলেছে ভূমিতে। ছবিখানা দুলছে। তারপরে জাহাজের ছবি। 'ওগুন-আগু' প্রত্যক্ষ দেবতা, সমুদ্র

দেবতা। কতো যে পাত্র; মাটির টিনের, কাঁচের, পেতলের—আত্মাদের বাসস্থান; যার যেমন কৃতী তার তেমন বাসস্থান। ওরই মধ্যে আবার ভার্জিন মেরী, কোলে শিশু নিয়ে হতাশ হয়ে তাকিয়ে আছেন বোতলে-বোতলে পরিপূর পদতলের দিকে। 'ওগুন দিরেইকে'—যুদ্ধ দেবতা। তাঁর জন্যে রাখা কোষবদ্ধ তরবারি, ধনুক বাণ, বল্লম, কাটলাস্ এবং কুড়ুল। খ্রীস্টীয় সমাজের বিখ্যাত সন্তদের মধ্যে যাঁরা সত্যিই মহাত্মা, ভুডু-র এই পীঠস্থানে যোগ্যতা অনুসারে তাঁদেরও বসার এবং ভোগ-আরতি পাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ক্যাথলিকরাই যদি একটু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে পরিপক্ক হয়ে ওঠে তখন ভুডুত্বে উপনীত বা উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জন করে। ক্যাথলিক-চার্চ এ-সব অশাস্ত্রীয় অব্রহ্মণ্যের কথা জানেও। কিছু বলতে সাহস করে না। যদি কিছু বলা যায়, তা হলে আবার ওদের সেই রবিবাসরীয় প্রাতঃকৃত্যে কেউ যোগ দেবে না। হঠাৎ যখন ওরা মোমবাতির মালা থালায় সাজিয়ে আরতি আরম্ভ করলো তখন দেখি সপ্তর্ষি পরিধৃতা কুমারী কন্যা শিশু যীশুকে কোলে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন। সপ্ত-ঋষি সপ্ত দুঃখের সাধনায় উত্তীর্ণ। এ্যান্হনী, নিকোলাস, বোরোম্পেন্ত, জেম্স্, রোজ্-অব্-লীমা, মাইকেল এবং চার্লস্ বার্থোলোমীও—এই সাতজনে ঘিরে ধরেছেন 'লেডী অব সেভেন সরোজ্'কে, ভুডু দেবসভা-সুধর্মার শচীন্দ্রাণীকে।

হঠাৎ নাচের তালে তালে আমিও দুলে উঠি। অন্ধকার ঘনতর। আমার হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছে মার্কাস। একটা ছোট্টো দরজা পেরুতেই আরেকটা কুঠুরী। তার মধ্যেও ক্রশ গাড়া। ক্রসটাকে স্যুটে-টুপীতে সাজিয়েছে। তার পায়ের কাছে শেকলের স্তূপ; কোড়া; বেতের গোছা; চাবুক;—'ক্যাট-অব্-নাইন্-টেল্স্ !! দাস-জীবনের রুদ্র-তিরস্কার; উগ্র গঞ্জনা! 'লে-কায়েজোম্বী' ভুডু তন্ত্রের বিপরীত রতি-তীর্থ! বগলামুখী তন্ত্রোক্ত হোম এখানে হয়েছে 'ঘেডে' হোম। 'বুক অব দি ডেড্'-এর ওসাইরীস-তন্ত্র মিশরের নীল নদের তীরে তীরে ছড়াতে ছড়াতে বনপথের দুর্গম কান্তার ভেদ করে চলে গিয়েছে জাম্বেসী, নাইজার, কঙ্গো, সিনীগাল নদীর তীরে। সেই ওসাইরীস এবং হোয়াস ফিরে এসেছে ভুডুর মাধ্যমে হেইতীর এই গাঁয়ে।

একটা কোণে যেন অন্ধকারের ঠাস বুনান; যেন মৌ-চাকের মতো চাকবাঁধা অন্ধকার। মন আমার ক্লান্ত; দৃষ্টি বিভ্রান্ত। সামনে ছোটো ছোটো টেরাকোটার যে-সব পুতুল দেখছি তার প্রতীকতা একটাই। মাত্র প্রতীকই নয়; সোজা ও সহজ বর্ণন। প্রাচীন মিশরীয় ওসাইরীসের মূর্তির মতোই এ সব প্রতিমাও অতি শিশ্নিক। ত্রিশূলের মতো ত্রিশিশ্ন মূর্তি স্থূল পৌরুষের বিঘোষিত প্রতিমা। সঙ্গে সঙ্গে আইসীসের ডেল্টাও আছে। এবং উদ্দাম রাত্রির গর্ভে মানুষের অতৃপ্তি, অচরিতার্থতা, অপারঙ্গমতা, তুরীয় আনন্দের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিদ্রোহ-মথিত অবরুদ্ধ চিৎকারে ভাসিয়ে দেয় দেশ-কাল-পাত্রাপাত্রের ভেদ। আফ্রোদিতের মন্দিরের চত্বরে-গহ্বরে যে রতি-আরতির বর্ণনা আজও ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় তারই প্রতিলিপি পাঠ করলুম এই নীরব অন্ধকারের শিলালেখে। ওটা ক্রুশ নয়। Crux ansata—অঙ্কুশ মুদ্রায় প্রকাশিত রতি-কল্প, জীবনের পরম সমারোহের উৎফুল্ল বিকচতা। ক্রস্, অঙ্কুশ মুদ্রা এবং নাদ সমন্বিত

বিন্দু তিনটিই রতিযজ্ঞের আদিম প্রতীক ; জীবপ্রবাহের আমরণ আবেদন। দেহবাদকে চিদানন্দে ভাসাবার যোগ-ভাষা।

আমি কাঠের একটা বেঞ্চিত বসলুম ; যেন অন্ধকারের অবগাহনে ডুবে গেলুম। মার্কাস বসলো পাশে। পিঠে হাত রাখলো। কী হলো মাস্টার। ভুড়ু তো এই কারণেই দেখতে দেয় না সবাইকে। সিগারেট ধরলেই কি গাঁজা খাওয়া চলে ? মদ খাও বলেই কি সাপের বিষ খেয়ে নেশা করতে পারো ? এর স্বাদ আলাদা !...

কিন্তু মার্কাস একা নয়। আর একজন কে বসেছে আমারই অন্য পাশে। হতে পারে মানুষ। হতে পারে জমাট বাতাস ; জমাট অন্ধকার। এর নামই বুঝি প্রেত।

তারই গলা।...প্রেত কি কথা কয় ? ..

...খুব ঘাবড়েছো ? কিন্তু সত্যিই কি ঘাবড়াবার কথা ? মিশরের আবিসিনিয়ায়, আফ্রিকার গভীর থেকে গভীরতরে, মানুষ ভাবতো ওসাইরীস শুধু নিজে যে অমর তাই নয় ; অমরতার আধার ; মৃত্যুকে অতিক্রম করার অনন্ত পিপাসাই ওসাইরীসকে দেবতা করেছে। চির-জীবন, চির-যৌবন ; চিরঞ্জীব ; চিরযুগ।...কেনই বা তা ভাববে না। নীল তো নদী নয়। নীল তো নদ। পুরুষ। সমুদ্রের তীরে তীরে, নদীর কুলে, পৃথিবী তার উর্বর কোষময় দেহ বিছিয়ে রাখে। নদের সবেগ ধারার প্রান্তভাগে সে মুক্ত করে রাখে তার ব-দ্বীপ ! যে জীবন গত বছরের শস্যের সঙ্গে মিশে গেলো মানুষের রক্তে, যে মৃত্যুময় জীবন ব-দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলো, ব-দ্বীপকে মৃত্যুময় করে রেখে, ওসাইরীস-নীলের তীব্র বেগ পুনশ্চ-বর্ষার প্রখর বীর্যবত্তায় তাকেই করে তুললো কোষবতী, ঋতুমতী, পুষ্পবতী, গর্ভবতী। আবার সেই মৃত্যুলোক থেকে ওসাইরীস ফিরিয়ে আনলো জীবনের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ। এই যে বিপুলা ধরিত্রী দেহে মর্তে পর্বে উন্মুক্ত জঘন ব-দ্বীপ, এবং এই সব ব-দ্বীপে যে নদনদীর ঋতুকালীন মিথুনতা—জীবনরসের ধারক, বাহক, বিচক্রমনতা—একে কি মানুষ যুগে যুগে অভিনন্দন করবে না ? দেহ তটের অনিবার্য প্রয়োজনে তাকে কি আলিঙ্গনে পরিতৃপ্ত করবে না ? যে পরম পরিতোষ মানব সমাজের দেহে, কোষে, মনে স্তরে স্তরে তার আনন্দময় স্পর্শ রেখে গেছে তাকে অস্বীকার করে মানুষ মৃত্যুর অজ্ঞাত, বিভ্রান্ত, অন্ধ তামসকে মেনে নেবে ? মৃত্যুকে অস্বীকৃতি দিয়ে, জীবনকে সমারোহ সহকারে বরণ করে, মিশরের বীর্যবান সত্তা গান গেয়েছিলো ওসাইরীসের, আইরীসের—যেমন হোবাস, পাতিস, মাদুক, বাল, যুগে যুগে আত্মবীর্য বিসর্জিত করেও ইস্তার, দেমেতর, কেবেলে, সেরেস্, আফ্রোদিতে-দের সৃজনী শক্তিকে বাড়িয়েছে ! স্ত্রী-শক্তির সাধনায় পুং-শক্তির আত্মবিসর্জনের উদাহরণ আরণ্যক পশু থেকে নিয়ে, পিঁপড়ে, পাখি, মৌমাছি, সাপ, মাছ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে পাবে। তুমি পুরুষ। বীজশক্তির ধারক। আত্মবিসর্জিত হবার চরম সাধনায় বীজধাত্রী নারীক্ষেত্র তোমার একমাত্র সাধন বেদী। অস্বীকার করো, নিপাত যাবে। ভণ্ড, মূক, অন্ধ, বর্বর হয়ে জীবনকে বোঝায় বোঝায় নিঃসঙ্গ করে ছাড়বে। তা পাপ। সাঁড়া পেঁপে গাছ, সাঁড়া বেগুন গাছকে কি করো ? বলিতে পুং জীবনকেই কেন নাশ করো ? এখনও কি বোঝো না কেন রহুদীরা এবং তাদের পন্থা অনুসরণ

করে ইসলামীয়েরাও শিরশ্ছেদ করে? বাবীলোন, আসীরিয়া, ফিনিশিয়া, ফ্রিজিয়া,—সর্বত্র এই যজ্ঞ উৎসবের মতোই স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রীসের প্যান্‌-উৎসব; রোমের স্যাটারপলিয়া; তোমাদের শৈব উৎসব, চড়ক, হোলী, রথযাত্রা, রাস—সবই তো এই। পুরুষ সূর্যই মীন, মেষ, বৃষ—হয়ে পুজো পাচ্ছে সবিতা, আদিত্য, পুষণ, ভাগ হয়ে। নতুন কি পাচ্ছো? সনাতন ধর্ম এই। পৃথিবীর বুকে আকাশ মাথা নীচু করেছে; আকাশকে পৃথিবী তার বুকে চেপে নিশ্চিহ্ন করেছে। পুরাকালে মানুষ এটাকেই দৈবী প্রতীক বলে গ্রহণ করেছে। তাই মানুষের সমগ্র অনুচ্চারিত বাসনার আহুতি মানুষীর কামনা যজ্ঞের হবি। এতে আশ্চর্য হবার কী?···

প্রেত মন্ত্র! প্রেত স্বর! সমাজের বিকল্পে অবিমুক্ত অসমাজ।

অন্ধকার! অন্ধকার!!

বলার মধ্যে সুর। বলার মধ্যে যেন মিসমেরাইজ করার হিস-হিস শব্দ। যেন সাপের বেড় পাকিয়ে উঠছে সত্ত্বার শিরায় শিরায়।

ঐ দেখো একটা নরকপাল পড়ে আছে বেদীর ওপর। ঐ বেদী উৎসর্গীকৃত ব্যারণ সামেদীর নামে। ব্যারণ সামেদী শ্মশান লোকের অধীশ্বর। কিন্তু তাঁর কঙ্কাল স্বরূপকে তুচ্ছ করে জাগবেন 'কালী', শবকে তুচ্ছ করে শিবাই কালী (The Time Spirit);—সেই যে জগন্মাতৃকা শিবা তিনিই আবার কারুর কারুর মতে শিবা—শৃগাল। কালীর সহচর। মিশরীয় অনুবীস্-ই তো ইশী এবং শেবুর সহচর বলেই পুজা পেয়েছে। অনুবীস্ও শৃগাল। সামেদী কঙ্কালী; তা হোক;—কঙ্কালীকে পরাভূত করে কালী (Time),—জগন্মাতা,—মেইত্রেস-এর্জুলী ফ্রিদা-দাহোসীন। রতাতুরা মেইত্রেস এর্জুলী। জীবজগতে হ্লাদিনী; প্রেমময়ী; লাস্যললামষোড়শী কলা। ঐ দেখো দূরে যজ্ঞকুণ্ড। ওরই মধ্যে জ্বলছে—চেয়ে দেখো—

আমি দেখছি। কয়েকটা তলোয়ার, কাঁলোস, চিমটে—আগুনে ঠাসা। লোহার অংশগুলো লাল টকটকে।···

যখন এরা রতারতিতে সংহত হয়ে যাবে তখন এদের সমাহিত মনের পরীক্ষা নেওয়া হবে ঐ লেলিহান লোহার মাধ্যমে। রতি-লগ্ন-মিথুনের উলঙ্গ দেহে ঠেসে ধরা হবে ঐ লোহা। যদি বিচলিত হয় ওদের পুরোপুরি উৎসর্গ করা হবে। ব্যাভিচার, অনাচার, রিরংসার দরবার পোর্তো-প্রিন্স-এর বাজারেই রেড্ লাইট পাড়ায় পাবে। এখানে কেন? কিন্তু বিচলিত হয় না কেউ। যজ্ঞ সম্পূর্ণতা পায় সেই সমাধিস্থ আরতি-রত রতি নিবেদনে।

···শোনো হিন্দু, তোমাদের দেশে এ সাধনার পীঠ এককালে বিস্তীর্ণ ছিলো। সেই বীরাচারী সমাজের বীর্যবান পৌরুষে সমগ্র এশিয়া, চীন থেকে লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত বীর্যবান হয়ে উঠেছিলো। আজও নিভৃতে কন্দরে নিদারুণ এই পাশুপত বামাচার, বগলা-মাতঙ্গী সাধনার ভৈরব বীরাচার চলেছে। কিন্তু পাষণ্ড ব্যাভিচার এ সাধনাকে ধ্বংস করে সমগ্র এশিয়াকে মানুষের চোখে হেয় করেছে···

···শোনো হিন্দু! তুমি সেই হিন্দু। তান্তিয়াও ডাকিনী-সিদ্ধা। তান্তিয়া

খেচরী-বিদ্যায় পারঙ্গমা। তান্তিয়া তোমার কথা জানানোর ফলেই তোমাকে এখানে আসতে দেওয়া হয়েছিলো।···নৈলে এ রাজ্যে অকৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। তান্ত্রিক গুহা এ।

অন্ধকার !! ধোঁয়া !!! দমবন্ধ হবার মত গন্ধ।

আমাকে বাইরে নিয়ে এলো মার্কাস।

বাইরের মানে পাশের ঘরে। নাচের সেই উদ্দাম উদ্দণ্ড বিক্রম দেখার মতো। টলতে টলতে খাড়া পড়ে গেলো একটা দুটো তিনটে অনাবৃতা যুবতী। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলো অন্যেরা বহন করে। দূরে আরও অনেকে নাচছে। সংজ্ঞাহীন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, নির্বিকল্প, আত্মস্থ একটা নাচ। আমি পাশবিক, পৈশাচিক বলতে পারি না তাকে। পশু কে নই আমরা? যে বলে আমি পশু নই, সেই পিশাচ। তার সেই মূঢ় শ্লাঘা, অন্ধ উচ্চারণই সত্য মতে পৈশাচিক।

গিনি-কোস্ট, দাহোমী, কঙ্গো, সেনেগাল—তার অরণ্য। তার মধ্যে কতো কতো উপজাতি। ওয়েদো, নেগরা, আগু, আরোয়ো, জাকা, এর্জুলী, বোসু, লোকো, দাম্বালা, কোম্বোলামীন, ওগুন বাদাগ্রীস, ওগুন ফেরেইল—কতো যে! হেইতীর কন্দরে কন্দরে গুটিয়ে রাখা সারা আফ্রিকা যেন ভেঙে পড়েছে। টোনেলটার ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত অরণ্য আফ্রিকার যুগন্ধর বাসনা চিৎকার করছে ক্লেদে, ঘর্মে, রুধিরে, লালায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে, জীবনরসের তৃপ্তি-অতৃপ্তি প্রবাহে। এ কল্লোল যেন সুদূর আফ্রিকার তীর থেকে আঘাত করেছে ক্যারাবিয়ানের বুক। সমগ্র 'middle passage' যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে ফেনায় ফেনায়; হেইতীর পাহাড়ের গায়ে সীডার এবং মেহগনীর শাখায় শাখায় দোল লেগেছে, 'অরণ্য আফ্রিকা জাগো, জাগো!'

ঢলে ঢলে দুলে দুলে পড়ছে হাউণ্ডির গায়ে হাউঙ্গা। অন্যান্য হাউণ্ডিরা ধরে ফেলছে। ঢোল বাজছে মরণ-মরণ জীবন ছন্দের থিয়া-তা-থৈ তালে। কী বা তার দ্রুততা, কী বা তার ভয়ঙ্করতা। কেবল সেই ঢোলের শব্দই মাহিষ ত্রাসের পীড়নে সঞ্চারিত ভয়কে শাদা করে ঝিমিয়ে দেয় পরমা আগুস্তিতে। এমনি করেই আতীস ঢলে পড়েছিলো ইউফ্রেতিসের তীরে ইশ্তারের বুকে! আতীসরা ঢলেই পড়ে। ইশ্তাররা গর্ভিণী হয়। আতীসরা জীবন পায় পুনশ্চ জন্মের মাধ্যমে। যে আতীস মরে যায় সেই আতীসই ফিরে আসে ইশ্তারের বুকে। চিরন্তনী নারীই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী।···

ঐ যে ছেলেটার মুখ ঢেকে নিয়ে গেলো চারটি হাউণ্ডি। তরপরেই হাউণ্ডিরা এবং হাউঙ্গারা পিঠে পিঠ লাগিয়ে বিচিত্র এক নাচে প্রমত্ত হয়ে উঠলো। তাদের যেন শক্তি পরীক্ষা। নাচের মধ্যে তারা নিজেদের জড়িয়ে ধরতে পারছে না; কিন্তু মাথায় মাথা লাগছে, পিঠে পিঠ, নিতম্বে নিতম্ব, জঙ্ঘায় জঙ্ঘা! সাপের মতো দেহে দেহে পাক খাচ্ছে যেন দুটো দাড়ি পাক খেয়ে একটা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা যাচ্ছে দুটো দুটোই রয়ে গেছে। এ কী জীবন ফেনতরঙ্গ! এ কী উদ্দাম বাসরে অনঙ্গরাসলীলা।

মনে মনে ভাবি স্বপ্ন দেখছি কি-না। মার্কাস একটা পানীয় এনে দিলো। আমি

ইতস্তত করতেই বললো, খাও। জলই শুধু। তোমাকে আর কোনো পানীয় দেওয়া হবে না। তুমি দীক্ষিত নও, পূর্ণাভিষিক্ত নও।

তেষ্টা পেয়েছিলো অসাধারণ।

ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে ফেলতেই একটি হাউণ্ডি সোরাই থেকে আরও জল ঢেলে দিলো; আরও। দেহে যেন বল এলো; মনে এলো সম্বিত।

কিন্তু যা অন্ধকার তাকে অন্ধকারই দেখতে হলো।

তমসো মা জ্যোতির্গময়!

হাউণ্ডিরা মেঝেয় আটা দিয়ে আলপনা দিচ্ছে—শুকনো আলপনা—মণ্ডলের মতো, 'ভেভে'! তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে ভুট্টার আটা চেপে পরম নিপুণতার সঙ্গে কুশলি মণ্ডল চিত্রিত করে তুললো বিচিত্র জ্যামিতিক পট-পটিয়সীরা।

একটি একটি করে মণ্ডল রচনা করে একটি একটি মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে।

আরও আছে। হাঙ্গুয়ানের দল মেঝেয় পা ঠুকতে ঠুকতে এলো। কাঁধে বাঁশের মাঝে দোলানো বিশাল ধুনুচি। তা থেকে নানা রংয়ের শিখা উঠেছে। গন্ধকের ধোঁয়ার ঘর ভরে যাচ্ছে। গরমে আর টেকা যাচ্ছে না। সকলেই উলঙ্গ। আমিও কখন কামিজটা খুলে ফেলেছি। ঘাম যেন শেষ হচ্ছে না। যারা বইছিলো ধুনুচির বাঁশ, তারা যেন টলছে। অদ্ভুত একটা বিকারে উত্তপ্ত তাদের মগজ। আছড়ে পড়ে গেলো লোকটা। বাঁশে ঝোলানো মশালচীটা চিৎকার করে পড়লো মেঝেয়। দাউ দাউ করে লেলিহান আগুন জ্বলে উঠতেই হাউণ্ডির দল আছাড় খেয়ে পড়লো মেঝেয়। দ্রুততালে গড়াগড়ি খেতেই আগুন নিভে গেলো। কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ায় ভরে গেলো ঘর। বিকার-উত্তপ্ত মানুষটাকে পাশের ঘরে পাচার করা হলো।

দ্বিতীয়টাকে একজন পুরুত মারলো বিষম চড়। সে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকলো। কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার ঘাড়ের শিরা ফুলে উঠলো; তার নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো, তার মুখে গেঁজা ভাঙতে লাগলো; তার দুটো হাত পিছনে বেঁধে সে যেন কাঁধ থেকে হাত ছিঁড়ে আনতে চাইলো। দুবার তিনবার পড়ে গেলো; টলতে টলতে আবার উঠলো। ঘামেতে, মেঝের মাটিতে, শাদা গুঁড়োয় সেই কালো চামড়া যেন অজগরের গা হয়ে উঠলো।

"ভর হয়েছে : ভর হয়েছে !!" দারুণ একটা চিৎকার।

কেবল এই চিৎকারটারই অপেক্ষা ছিলো যেন। সঙ্গে সঙ্গে নাচের ছন্দ ফিরে গেলো; রাসচক্রের ভঙ্গীতে আরম্ভ হলো অন্য নাচ, অন্য ছন্দ। হঠাৎ হাউঙ্গানটা তুলে নিলো একটা কাটলাস; এবং ঐ ভীড়ের মধ্যেই বন্ বন্ করে ঘোরাতে থাকলো কাটলাসখানা। তারপরেই দাঁতে ধরলো কাটলাস এবং ঘুরতে লাগলো চরখীর মতো।

অন্য একজন লোকটার মুখ থেকে কাটলাসখানা নিয়ে পূর্ণ বিক্রমে মারলো ওরই পেটে। বিকট যন্ত্রণায় দুমড়ে পড়লো হাউঙ্গান সেই তরুণ। ছটফট করতে লাগলো মেঝেয় পড়ে। যার হাতে কাটলাস সে বসিয়ে যেতে লাগলো ঘায়ের পর ঘা। তখন বুঝলাম ধারালো ধার দিয়ে না মেরে ভোঁতা ধার দিয়ে মারছে। তা মারুক। মার মারই।

বেদনায় কুঁকড়ে হস্ঘরের কোণার অন্ধকারে গড়িয়ে গেলো হাউঙ্গান। নাচ বদলালো। অন্য ছন্দে, অন্য তালে।

অল্প পরেই লাফিয়ে পড়লো সেই তেজস্বী তরুণ দলের মাঝখানে। সেই বেদনা-কাতর ক্ষত-বিক্ষত, পরাজিত বিধ্বস্ত চিত্র আর নেই। তখন সে যেন নব বলে বলীয়ান; নব পানে স্ফূর্তিবান; নব জীবনে সঞ্জীবিত। তার হাতে কাটলাস, তার অঙ্গে শোণিত, তার অন্য হাতে মদের বোতল। বিরাট একটা সিগার মুখে সে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নাচের মণ্ডলীর মধ্যে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু বারে বারেই সে পড়ে যাচ্ছে। তাকে সামলে দিচ্ছে হাউঞ্চিরা। হঠাৎ নৃত্যের তালে সে বাদ্যকরদের কাছে গিয়ে তাদের ঢোলের সঙ্গে ঠুকে বোতলের গলাটা ভেঙে ফেললো। তারপর ঢেলে দিলো খানিক মদ খুঁটির গোড়ায়। মদের বোতল প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। একজন হাউঞ্চি তখন অর্ধোন্মাদিনী? তাকে হাতের প্যাঁচে জড়িয়ে ধরতেই সে দু হাতে বেঁধে নিলো হাউঙ্গানকে। হাউঙ্গান অন্য হাতের কাটলাস নিয়ে মেয়েটার হাতে, নিতম্বে ঠাস ঠাস করে আঘাত করে। যতো আঘাত করে, ততো সে এলিয়ে পড়ে হাউঙ্গানের বলিষ্ঠ হাতের ওপর। তারপর আরম্ভ হলো এদের যুগ্মনৃত্য। এবং সেই নৃত্য ঘিরে সারা টোনেলের মেঝেয় জননৃত্য। যেন এক বীভৎস তাণ্ডব। তাণ্ডব, কিন্তু ছন্দোময়, রসময়, মাদকতায় বিহ্বল, আতুর। হাউঙ্গানের চোখ ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ হয়ে আসে, ক্ষণে ক্ষণে কোটরের মধ্য থেকে কেবল শাদা অংশটা উঁকি মারে। নর এবং নারী উভয়ে তখন আসঙ্গে মিলিত হয়েও নিঃসঙ্গ।

ততক্ষণে মেঝেয় তিলধারণের স্থানাভাব। বোঝা যাচ্ছে বহু যুগলের বাহু যুগলে মদ এবং নারী। বহু যুগলের মগজে 'ভর' নেমেছে। একটা বেতাল-পঞ্চবিংশতি নাচ তখন ঘোরালো করে তুলেছে টোনেল।

মার্কাস আমায় টান দিলো।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে যেখানে পেঁছিলাম সেটা পরিচিত পৃথিবীর চিরন্তন আকাশ-ঢাকা শিশির-ভেজা বুক। ওপরে সপ্তর্ষির কাছাকাছি হেলে আছে কালপুরুষের খড়্গ। এপার ওপার বয়ে যাচ্ছে নীহারিকার ছায়াপথ প্রবাহ।...বাতাস বইছে। পাতার গান পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে আসছে। দূরে ঝর্ণা বইছে ঝিরঝির।

পরের দিন বিকেলের আগে আমি উঠতে পারিনি। সেই জলে মাদক কিছু না থাক ঘোরালো কিছু ছিলো।

তান্তিয়া হাসছে আর গরম মাছভাজা এবং ব্রেডফ্রুট দিচ্ছে। মস্ত এক কাপ কফি থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। হিন্দু, ভুডু দেখলে?

আমি তান্তিয়ার দিকে তাকিয়ে বলি, তুমি দয়া করেছো তাই।

ভাষার অন্তরাল। দু-একটি কথাই বলতে পারি। তাও তান্তিয়ারই দয়ায়। পরে তিন-চার বার আরও তিন-চারটে টোনেলে রাত কাটিয়েছি। কিন্তু প্রথমবারের মতো সর্বনাশা, সর্বহারা, সর্বগ্রাসী অনুভূতি কোথাও পাইনি।

তান্তিয়া বলে, আমি ওই টোনেলেই সিদ্ধি লাভ করেছি।

ফল কি হলো তান্তি ?

তান্তির চোখে রং নেই, প্রভা নেই, এমন কি কোনো সাড়াই নেই। বহুকাল কোটরে থেকে তারা দুটো যেন পচে গেছে। তাই বার বারই ওকে চোখ মুছতে হয়।

সেই চোখে হাসি ঝরলো !

গালের গহ্বরে ভাঁজগুলো আরও বক্র হলো।

ফল ? তোমাকে মাছ ভেজে খাওয়ালাম। ঘরে তেল ছিল না। তাতে কি মাছ ভাজা খারাপ লাগছে।

তেল পেলে ? তার সিন্ধাই ? এতো বোকা আমাকে বুঝলে তুমি তান্তি ? সিন্ধাই যদি তেল হয় বেনের দোকান খুলবো তান্তী।

সিদ্ধির আবার ফল কি ? সিদ্ধি কি গাছ নাকি ? ফলের তালাশ থাকবে ? মাছ খাও। মাছ খাও। সিদ্ধির ফল সিদ্ধি। তোমার আমার মিল।

মার্কাস হঠাৎ উঠে যায়।

কোথায় গেলো ও ?

তার নিত্য কাজ। কাজ তাকে করতেই হয়। তান্তি হাসে। ওর সারা মুখে একটি দাঁতও নেই।

আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না।...থরে থরে চার্চ। ফুল ; পাদ্রীতে পাদ্রীতে ছয়লাপ। অথচ এই ত্রিবিক্রম-ভড়ের তৃতীয় পদে যে চরাচর পরিব্যাপ্ত করে দিব্যলোককেও আচ্ছন্ন করে ফেলবে এ কী করে হয়। এ তন্ত্র, বীরাচার অবসিত হবে না ? হয়নি কেন ? কেন ক্রীশ্চান চার্চ একে শেষ করে দেয়নি, যেমন নিয়েছে ইউকাটানে, মেক্সিকোয়, পেরুতে, গুয়েটামালায়, হন্দুরাসে।

ফাদার বেস্‌কোমের গির্জার দিকে পা বাড়াই। বহুকাল আছেন ফাদার বেসকোম হেইতীতে।...কিন্তু তাঁকে পেলাম না। মার্তিনীকে একটা চার্চ কনফারেন্সে চলে গেছেন। চার্চের তত্ত্বাবধায়ক তখন নিগ্রো ফাদার রাউস্‌।

আমাকে তিনি বললেন, মার্তিনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার ?

মার্তিন ? কে মার্তিন ?

তার তো নাম জানি না। ব্রাদার মার্তিনই বলি আমরা। এই চার্চেরই একটা কোণে পড়ে থাকেন। শার্ট এবং পাজামা একসঙ্গে সেলাই করা নিকারবুকার পরলেও একই রঙের কাপড় নয় ; এবং পুরোটাই যে আছে তাও নয়। যেখানে যখন ছেঁড়ে কিছু একটা জুড়ে নেয়। তার ওপর একটা চাটের ক্লোক পরে থাকেন। দেখেননি ?

ঝাঁকড়া চুল অথচ মাথার মাঝে টাক ? দাড়ি আছে কিন্তু বিরল। খড়্গের মতো নাক ? কিন্তু উনি তো ফরাসী।

য়োরোপীয়। লোকে বলে নাবিক ছিলো। এখানে এসে আর যায়নি। ঐ ভড়ু !! কিন্তু খুব কট্টর চার্চভক্ত। বিদ্বান গুণী লোক। এখানকার লোকেরা ওকে সাক্ষাৎ ইলাইজা মনে করে। গির্জার অঙ্গ। আপনি দেখেছেন ?

পথেঘাটে দেখেছি। ভেবেছি পাগল! কিন্তু চকচকে চোখ আর খড়্গের মতো নাক দেখে সন্দেহ হতো। ওঁর তো বয়স খুব !!

তা হবে! কিন্তু খুব শক্তিধর! সদাহাস্য মুখ!

তা বটে। একটুও ধীরে হাঁটেন না। হন হন করে হাঁটেন। বেজায় লম্বা লোক। যুবা বয়সে শক্ত জোয়ান ছিলেন।

একটু অপেক্ষা করুন। যদি মেজাজে থাকে আলাপ করবেনই। বিদ্বান অনেকেই হয়; জ্ঞানী। সক্রেতীসের মতো জ্ঞানী। কিন্তু ওই গির্জার ভাঁজেই বসতে হবে।

বৃষ্টি-বাদলায় কি করেন?

কিছুই না। ভেজেন।

তাতে—

নাঃ, আমি এ চার্চে আছি এগারো বছর। একদিনও ওঁর রুটিন বদলাতে দেখিনি। যেদিন যেতে চান, যে বাড়িতেই যান লোকে কৃতার্থ হয়ে যায়। উনি এ চার্চে আসেন যখন তখনই বয়স প্রায় চল্লিশ। তার পরে অন্ততঃ চল্লিশ বছর তো হয়ে গেছেই। ফাদার বেস্‌কোমও ওঁকে ঐ গির্জার ভাঁজে কাঠের বাক্সের মধ্যে বসে থাকতে দেখেছেন। মস্ত বাক্স। খড়ে ঠাসা। তার ওপর খবরের কাগজ পেতে কেবল সারাদিন বসে থাকেন। শুতে কেউ কখনও দেখেনি।

সন্ধ্যার একটু আগে মার্তিন এলেন। এক ঝলক দেখেই বললেন, বাতাশারিয়া? বই লিখবে তাই বিষয়ের তালাশ? কেন লেখো? এতো লিখে কি হয়? বোসো; এখানে বসতে পারো; তবে না বসাই ভালো। বৃষ্টি আসবে।…অবাক্ আমাকে আকাশের দিকে তাকাতে দেখে বললেন, আকাশ পরিষ্কার!! আশ্চর্য, তবু বৃষ্টি আসে। চার্চে আমি ঢুকি না। ওখানে তো তিনি নেই। ওখানে তুমি এবং আমি; তোমার এবং আমার। সবার ঈশ্বর যদি এক, সবার ধর্মও এক। স্বীকার করলেই— হাসেন মার্তিন।…এক্ষুণি কে শুনবে, বলবে কম্যুনিস্ট। ও-এ-এস্-এর স্পাই হেইতীতে গিস্ গিস্ করছে। হেইতীর রাজদণ্ড ইণ্টার পোল্-এর হাতে। চার্চ স্বীকার করাই ভালো; ক্যাথলিক চার্চ! নৈলে—দেখছো না কাণ্ড ভিয়েৎনামে!! যাই বলো, আমি কম্যুনিস্ট হতে পারবো না। বড্ড সত্যিকথা বলতে হয়। চলো চলো—সত্য আকাশ, কম্যুনিস্ট আকাশ ছেড়ে,—অসত্য, ভদ্র, নীতিবাগীশ চার্চের কোলে বসি। ইহকাল না হোক পরকাল তো হবে। পুনর্জন্ম নেই, পরকাল আছে। তার মানেই অতি বৃহৎ সুদীর্ঘ পরকাল।

ভেতরে একটা আর্চের আবডালে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারই একটা ধাপে বসে বলেন—বোসো না তুমিও। কী আর এমন লটোবরো হে! বোসো।…আবার হাসেন। …হাজার ভদ্র-সাজ পরা চার্চ গড়ো, মাটি ছাড়া চার্চ গড়তে পাবে না; ধুলো ছাড়া মেঝে পাবে না। চার্চ গড়ো আর না গড়ো, কুম্যুনিজম্ আসতেই হবে।

আপনি পলিটিক্‌সে ইণ্টারেস্টেড্—

জানতে না! এই তো? জানলে বেশ! তুমি কিসে ইণ্টারেস্টেড? দেশ দেখায়?

বই লেখায় ? কী দেখবে ? ক্যামেরা কী দেখে ? কি লিখবে ? বহু ভ্রমণ-খেউড়ে খেউড় গেয়ে গেছে। তার চেয়ে···কী বলবো বলো তো ?···কী করবে ?···বই লিখবে না ? ··নাঃ, তা পারবে না (বাঁকা চোখে চেয়ে পকেট হাতড়ে একটা আধপোড়া চুরুট বার করে বলেন, দেশলাই আছে ?...নেই। আচ্ছা ঐ চার্চের কুলুঙ্গীতে মোমবাতি আছে জেবলে আনো। কাজ হয়ে গেলেই নিবিয়ে রেখে এসো। আমি চুরুটটা ধরিয়ে দিতেই মোমবাতি নিবিয়ে বললেন, রেখে এসো। পোড়া পলতে দেখেই কাল ওরা গাল দেবে। তা দিক। আমাকেই দিক। কারুকে তো দেবে !···ওরা কি জানে এটায় প্রত্যক্ষ কাজ হলো। মোমবাতির মোমত্ব বাতিত্ব দুই-ই সার্থক হলো। আর ঐ যে সারি সারি জ্বলছে, আমাকে জ্বালায়, পিতৃপুরুষকে জ্বালিয়েছে। ইতিহাসটাকে জ্বালিয়ে ছাই করেছে।) কী যেন বলছিলাম। হ্যাঁ! বই তুমি লিখবেই। না লিখলে যে কতো ভালো করতে !···ভুডু দেখে এলে ?

কিন্তু বুঝলাম না এখানে এতো প্রতিপত্তি এর হলো কী করে ? বিশেষ করে আপনি যখন বহুকাল এখানে···

জামায়কায় গেছো ? ত্রিনিদাদে ? সবার ওপরে রাস-তাফারিদের দলে ঢুকেছো ?··· তা হলে এর মর্ম জানবে কী করে ?···এখানে বেস্‌কোম আছেন। ও তো আসলি ফরাসী। নর্মাণ্ডীর লোক। এখানে আসা অবধি ওর একটি কর্ম। কী করে ভুডু থেকে হেইতীকে ফেরানো যায়।

সেই অদ্ভুত বিত্তু হাসি! জীবন এবং মানব ইতিহাসের প্রতি অনাস্থা। অবজ্ঞা নয়; অনীহা, অসূয়া—তা থেকেই অনাস্থা। নির্বিশেষ প্রতিরোধ। মানুষের মূল্যহীনতা মার্তিনের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ন করেছে।

হেইতী ভুডু এবং হেইতীর পলিটিক্‌স্‌-এ দুই-এ ছাড়াছাড়ি অসম্ভব ? বে-অব-পীগ্‌স্‌-এ কেনেডী গুঁতো খেয়েছে। ফলে ব্রিটিশ গায়ানা হলো জখম। আবার ঐ ডমিনিকান রিপাবলিকের ত্রুহিলোকে ঠেকানো দিয়ে চলেছে এক এক্সপেরিমেণ্ট। ডলার পেলে শাদা রাজ্য কী হতে পারে তার চটকদারী উদাহরণ বেতিস্তা-ত্রুহিলো-ডমিনিকান রিপাবলিক। রুটির জন্য পিঠ দেখো। হেইতী কালো। ডলার সত্ত্বেও কালো কী হতে পারে না তার নিদর্শন হেইতী। রোডেশিয়ায় ইয়ান স্মিথ কার জোরে তড়পায়, গায়ানার ডী-গার কার রসে মত্ত হয়ে গুঁতিয়ে তছনচ করে তরোতাজা একটা সমাজ— বুঝতে চাও, বোঝ। হাঃ হাঃ।

হাসেন মার্তিন।

···আমি ডাইগ্রেসিভ ? তা হোক এগ্রেসিভ বা প্রগ্রেসিভ না হয়ে ডাইগ্রেসিভ হওয়া ভালো। ইস্রায়েলের গুইরোঁ। সেও এক নিদর্শন।···

···যদি ভুডু না থাকতো আফ্রিকানরা ঠিক ঐ কারীব আর আরাওয়াকদের মতো মনোবেদনাতেই মারা যেতো। ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে ভুডু। এই চার্চমাতাল এক-গুঁয়েগুলো বোঝে না ধর্মের প্রধান খুঁটি দারিদ্র্যের বুকে পোঁতা হবেই। ওরে বাবা এ জীবনটাই যদি প্রাচুর্যে এবং তৃপ্তিতে ভরাট হলো, পরের জীবনটা নিয়ে মাথা ঘামাবে কে ?

পরের জীবন, শাশ্বত জীবন, তাদেরই লোভ দেখায় এ জীবন যাদের কলা দেখিয়েছে। দারিদ্র্য আর শোষণ এই দুই পায়ে চার্চ এগুচ্ছে। ধর্ম কিন্তু মনকে জোর জোগায়। নিগ্রোদের এই প্রমিজড্ কিংডম্ সম্বন্ধে ধারণা থাকলেও, তা খুবই ফিকে। ওদের কিংডম্ এই ভুডুতে। ভুডুর মধ্যে ওরা পূর্বগানুকরণের (এটাভিস্টিক) স্বাধীনতার স্বাদ পায়। গায়নায় গেলে দেখবে ভারতীয় কুলীরা এখনও কেমন ঢোল বাজিয়ে রামায়ণ গান করতে খুব কালচার্ড না মনে করলেও নিজেকে মুক্ত স্বাধীন, লয়্যাল মনে করে। এবং ঐ একই কারণে রামায়ণ গানে যোগ না দেওয়াটাকে প্রগ্রেসিভ মনে করে। সুরিনামের বুশ নিগ্রোদের গাঁয়ে যাও। ওরা এখনও মুক্ত প্রকৃতির স্বাধীন নিরাবরণ সমাজ। তাতেই ওরা পায় স্বাধীনতার স্বাদ। কালচার-এর প্রাণই ফ্রী-ডম্, স্বাধীন বোধ। হেইতী কালচারে স্বাধীনতার, ব্যক্তিগত বেপরোয়া মান খুব উঁচুদরের। তুসাঁ ওদের প্রাণস্রোতের সশস্ত্র প্রতীক···গবর্মেণ্ট হাউসের সামনে কুচ-ময়দানে তুসাঁর মূর্তি দেখেছো ?···

না দেখার জো কোথায় ? যেখানেই যাই পাথুরে অতীত ; হামবড়া মূর্তির চাই ;— আর ধুলো-নোংরা-গরীবিতে ঠাঁসা বর্তমান···

টাট-টাট-টাট ! চুপ চুপ ! এই খেয়েছে ! আমার নিষ্কর জমিদারীটা যে তুমি ঘোচাবে ছোকরা। হেইতীতে পাথুরে সার্দারই সদার। অতীতই ভবিষ্যৎ। ধুলো-নোংরাই ওদের আত্মবল। ভুডুকে ওরা খ্রীস্টান ধর্মের অঙ্গ বলে বোধ করে। ওদের অবচেতনের খ্রীস্ট নিজে পরম ভুডুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ হাউঙ্গান। ক্যাথলিসিজমে যারা সন্ত তারা তো প্রায় প্রত্যেকে ভুডুর দেবতা।···ঐ যে ফ্রেদাদাহোমিনা-এজুলীকে দেখেছো,—দেখেছো নিশ্চয়, Elle est en somme, une femese traince— উনিই কি Estarte, Aphrodite, Isis নন—নিত্য-রাত্রির নব-নব পুরুষ-মিলনে নিত্য নূতন বিবাহ-বন্ধন,—ভুডু-তন্ত্রের এ অধ্যায়টা কি তোমাকে ভার্জিন-মাদারকে মনে করিয়ে দেয় না ? মিথ্রাইজম্-ই ওদের আইরীস-ওসাইরীসের নবজাতক। স্কলার পাদ্রী রীনাম্ বলেইছিলেন,—যদি ক্রিশ্চানিটি কোনো কারণে মারা যেতো,—মিথ্রাইজম্কে রুখতো কে ? এদের এজুলী চিরকুমারী। তাঁর কৌমার্য প্রতিদিন প্রাতে ফিরে আসে। প্রতি প্রাতে এডোনীসের কাছে আসতো ভীনাস আফ্রোদিতি ; প্রতি রাতে আসতো। পুরূরবসের কোলে উর্বশী···পাকটা একই। কেবল লেবেল আলাদা। আমাদের ফাদার বেস্কোম তো বলেন, 'হোলী মাদার' এবং এজুলী, কিসে আর কিসে ? ব্যাটাদের ঠ্যাঙাতে হয়।···ঠেঙিয়ে বন্ধ করার ফলেই তো সামনের ভুডু পিছনে ; দিনের ভুডু-রাতের ; প্রত্যক্ষের ভুডু অপ্রত্যক্ষের ঘোর অন্ধকারে চলে গেছে। চার্চে যাঁরা ধন্য-ধন্য ধার্মিক, তাঁদেরই ভুডু টোনেল-এর অন্ধকারে প্রমত্ত নৃত্যে অভিভূত দেখবে। মঙ্গল আর বেস্পতিবার ভারতে, ইরানে, বাবিলোনে, সাইরিয়ায় শক্তি পূজার, ভাগ্য পূজার প্রকৃষ্ট দিন। ভুডুতেও তাই। শনিবার অমাবস্যা ভুডুর খুব বিশিষ্ট দিন। পুরুষরা সেদিন বিবাহিতা স্ত্রীদের কাছে নেয় না। এজুলীর সাধনা স্ত্রী দিয়ে হয় না, যদিও মিথুন ছাড়া সাধনা অসম্ভব। ফলে—সব কিছু চলছে টোনেল-এ। এবং সবটাই ঐ

উন্মত্ত, বিহ্বল, আবেশে বিধুর, মধুর ব্যাপার। পাপ? পাপের গন্ধও ওদের মনে নেই।...চার্চ করবে কি? ভুডুকে মেনে নিয়েই চার্চের কাজ করতে হবে।...ফাদার বেস্কোম তো পাগলে যান। নীটশের মতো চিৎকার করেন,—Where is god? Well I will tell you. We have murdered him,—you and I! আমিও তাই বলি, He who starts by loving Christianity better than truth, will end by loving his sect better than Christianity. The religion of churchianity casts a stronger spell than Christianity—হা, হা, হা!...

কিন্তু শুনেছি খ্রীস্টান-চার্চ গোষ্ঠী অনেক মন্দির এবং দেব-বৃক্ষ ধ্বংস করে ক্রমশ 'সুপারস্টিশন্'-উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর।

চকচক করে ঘোলা-ঘোলা চোখ। হাসির ঝরনা যেন। শাদা-ঝুরঝুরে চুলগুলো উড়ছে। বৃষ্টি অনেকক্ষণ হলো এসেছে; চলেও যাচ্ছে। সারা চার্চে লোক নেই; ভেস্পার-এর প্রার্থনা আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে গেছে।

থামের আড়ালে বোবা অন্ধকার। থামের মাথায় একটা বালব জ্বলছে। তারই আলো চোখের কোটরে পড়েছে। চোখ হাসছে।

মানলে ধর্ম, না মানলে সুপারস্টিশন। মানলে রীতি, না মানলে কনভেনশন। মানলে ভগবান, না মানলে ধাপ্পাবাজী। মানলে বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র সংসার, না মানলে কুকুর-বেড়াল—মুক্ত জীব! মন্দির ভেঙে গাছ কেটে যাকে ধ্বংস করতে চাও তা যখন মনে আসন পেতেছে তখন ধর্ম। যারা ধ্বংস করে, ধ্বংস করেই প্রমাণ করে ভগবানকে পুজো করার কতো ঊর্ধ্বে তারা তাদের সাম্প্রদায়িক চার্চকে পুজো করে। গরু, গরু!! ওগুলো গরুর উক্তি!!

নিগ্রোরা প্রতিবিধান করেনি?

প্রতিহিংসা বলতে চাও। যা চাও তাই বলো।...নিগ্রো প্রতিহিংসা নেবে না? এ কি আফ্রিকার নিগ্রো পেয়েছো? এরা চিরকাল সংগ্রাম করেছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় কিছু কিছু পাদ্রী হঠাৎ মারা গেছে।...ওদের তো বিষ গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিসীম। গেলাসের, কাপের ধারে একটু লাগিয়ে রাখলেই হলো।

বিষ?

হ্যাঁ! বশীকরণ, যাদু, ইন্দ্রজাল এই তো ওদের রক্তের সম্পদ! হাউঙ্গানরা ভুডুর একটি চোখ; বোকোর-রা অপর চোখ। বহু পুরুৎ আছেন দু চোখেই দেখেন। বোকোর-রা ম্যাজিশিয়ান। জান্দোর, বাকালু, কিত্তা—এরা ম্যাজিক-স্বর্গের চাঁই চাঁই বাদশাই দেবতা। তাঁদের দয়ায় এরা মাটিতে গজাল পুঁতলে বিশ মাইল দূরের শত্রু শুকিয়ে মরবে। ব্যাঙ, সাপ, বেজী, পাখি-রূপ ধারণ এরা সহজেই করে বলে দাবি করে। লোক মানেও। রক্তলোলুপ দেবতা লুপ-গারা, মাকান্দা, লে-জোবোপ এঁরা সর্বদাই ঘোরাফেরা করেন। এঁদের শান্ত রাখার জন্য বলি দরকার। 'শৃঙ্গহীন ছাগ' উত্তম বলি। 'শৃঙ্গহীন ছাগ'—বুঝলে? কঙ্গোতে ঐ নামেই বলির "মানুষ"কে

অভিহিত করা হয়। নরবলি কঙ্গোতে খুবেই প্রচলিত ছিলো তো। কেনিয়াটার নামে, মাও-মাও-র নামে একালের ডিপ্লোম্যাটরাও এসব অপবাদের সুযোগ নিতে ছাড়েনি।

অপবাদ! ঠিক জানেন? আপনার এ বিষয়ে কি মত?

আমিও তো একটা ভুডু গাছ! কেটে যেদিন ফেলে দেয় দিলো। ফাদার বেস্‌কোমের কি কম রাগ আমার ওপর নাকি? ওর ধারণা আমি নিজেই নাকি ভুডু-বিশ্বাসী।

অনেকেরই তাই ধারণা।

হবে না কেন? দোর্সেনভিল, মার্স, হের্শকোভিৎস—এঁদের লেখা পড়েছো? ও, তোমরা তো আবার পড় না; লেখ। মানতে চাও না, জানতে চাও। মন চাও না; মানুষ চাও। দেবতা? তোমরাই দেবতা। নিকিয়ে-দেবতা !!! ওদের লেখায় পাবে ভুডুর স্বপক্ষে অনেক কথা।

হেইতীর রাজধর্মই ভুডু !! এখন তো ভুডুর সাতখুন মাপ! ডলার-মমতায় যখন পায় তখন জগন্ময়তা একই রসে মগ্ন থাকে। সে রসের গান,—যে করে হোক, হে বোকা রাষ্ট্র, জেগো না, জেগো না; ফীডিং-বট্‌ল দিচ্ছি, দোলা দিচ্ছি, এমন কি মিসিবাবাও জুটিয়ে দিচ্ছি,—জেগো না খোকা; ঘুমোও। আমাকে কাজ গুছিয়ে নিতে দাও। আসলে অন্তরে অন্তরে হেইতী সমাজ শাদাকে কেন্নো, কুমীরের মতো ঘেন্না করে। বিশ্বাস করে না। যারা ডলার নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে পাড়াক। ভুডুকে তা বলে ওরা প্রকাশ্য দরবারে আনবে না, অ-শাদাকে ও রাজ্যে প্রবেশও করতে দেবে না—স্টেট রিলিজন হোক আর না হোক। এ দেশের প্রেসিডেন্ট দ্যুভেলিয়ে ছিলেন ভুডু সম্রাট। লোকে বলে এখনও মাঝরাতে এসে ছেলেকে, খোকা দ্যুভেলিয়েকে উপদেশ দেন।

বেলা দুটো। আমি তখন সবে ম্যুজিয়াম থেকে ফিরেছি। ভুডু সম্বন্ধেই বই পড়ছিলাম। খাওয়া সেরে হ্যামকে গা এলিয়ে দিয়েছি।...হঠাৎ মার্কাসের আবির্ভাব। 'বস্ কি আরাম করছো নাকি?...ও পাড়ায় একটা ভুডু-'ভর' করেছে! বহু জনসমাগম। দেখতে যাবে নাকি? সবাই যেতে পারে। গোপন নেই। সত্যিকারের 'ভর'! যাবে!

ক্ষেপা খাবি? না, হাত ধোবো কোথায়!

দুজনে দুই খচ্চরে চড়ে জঙ্গলের ভিতরে অন্তর্হিত। নতুন অভিজ্ঞতা!

খচ্চর চলেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দুর্বহ পথে। আগাগোড়া পথই নামতে হচ্ছে। খানিক বাদে ঝরনার শব্দ পেলাম। বুঝলাম খাঁড়ির পাশ দিয়ে চলেছি। মিনিট দশেক যেতে না যেতে সামনে বিস্তীর্ণ সমতলে আখের ক্ষেত এবং ছবির মতো গ্রাম দেখা গেলো। দিগন্তে সমুদ্র। আমি জানি গ্রামগুলোর মধ্যে গেলে নোংরা দেখা যাবে।

হঠাৎ মনে হলো মানুষের দেহও কি তাই নয়? সুন্দরী যৌবনবতী! অঙ্গে অঙ্গে তার কতো লাবণ্য, সুষমা! যদি দূর থেকে, বাহির থেকে দেখি। ভিতর থেকে সেই

দেহ-ই পূতি-গন্ধময়, রক্ত-মজ্জা-রসা পঙ্কের আধার—লক্ষ লক্ষ মেরুদণ্ডহীন জীবের লীলা কেন্দ্র।

যে গ্রামটায় এলুম তার সমস্তটাই পাহাড়ে জঙ্গলে ঢাকা। মার্কাস না নিয়ে এলে কার সাধ্য সেখানে মানুষ্য বসতির তল্লাস পায়।

পর পর দশ বারোটা পোঙ্গ-গাছ সোনা রংয়ের ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। গাছে পাতা নেই। কেবল ফুল। দীর্ঘ গাছগুলো অন্তত ত্রিশ ফুট লম্বা হবে। সমস্তটা যেন আগুনে জ্বলছে।

সেই স্বর্গের ছায়ায় যুবা-বয়সী লোকটা ঝিমুচ্ছে। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। পেশীবহুল দেহ উলঙ্গ। ছোট্ট একটা ছেঁড়া পাজামা কোনমতে কুঁচকি অবধি ঢেকে আছে। একটা বৃহৎ গামলায় ফুটন্ত জল ঢেলে দিচ্ছে। দুই হাতই ডুবিয়ে রেখেছে সেই ফুটন্ত জলে। হাতের চামড়া ঝলসে খয়েরী হয়ে গেছে। লোকটায় হুঁস নেই। সামনের মেঝেয় নিশ্চয় মুর্গী বলি হয়েছে। পালক আর রক্ত পড়ে আছে। মদের বোতল শূন্য...পড়ে আছে।

একজন বৃদ্ধ—হাউঙ্গান হবে—, পুরো সুট পরে কী সব মন্ত্র তন্ত্র আওড়াচ্ছে।

তখন লক্ষ্য করলাম আগুনে হাতা রাখা। সেই হাতায় সীসে গরম হচ্ছে। হাতাটা এনে হাউঙ্গানের হাতে দেওয়া হলো।

আমি ভয় পেয়ে যাই। কালো ভয়। থকথকে ভয়। হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তকে যা বরফের চাঁইয়ের মতো মৃত্যু-হিমে জাঁকড়ে ধরে।

"ঐ সীসে কি ওর গায়ে ঢালবে?"

আমাকে টান মেরে অন্য দিকে নিয়ে যায় মার্কাস। সর্বনাশ। কেউ কোনো শব্দ করছে না। ভয়, শব্দ গান—কোনো কিছু মাধ্যম পেলে আর রক্ষে নেই। 'লাওয়া' তখুনি ভর করবে। সীসে গরম করে দিচ্ছে ও আর কি? লাবারিয়া সাপ ছোবল মারতে চায়নি 'লাওয়া'য় পাওয়াকে। ভয়ঙ্কর সাপ বা হিংস্র জন্তু তাড়া করলে গুণীরা 'লাওয়া'কে স্মরণ করে চেয়ে থাকেন। নির্জীব, অব্যক্ত হয়ে যাও। শূন্য। জন্তুর সাধ্য কি? এখানকার হাসপাতালে রেকর্ড আছে, একটা কঠিন ব্যাধি থেকে মুক্ত হবার জন্য একবার একটি পুরুষের একটি অণ্ডকোষ কেটে ফেলার সময়ে কোনো রকম এনিসথেসিয়া ছিলো না—ছুরির আঘাতে রোগী যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে হঠাৎ শান্ত নির্বিকার হয়ে যায়। কোনোরকম বেদনার বোধ তার রইলো না। 'লাওয়া'র সাহায্যে সে অবিচলিত হলো। বেদনা ব্যথার উর্ধ্বে চলে গেলো। এক একবার এই সমাধিস্থ অবস্থায় মানুষের তিন-চারদিন কেটে যায়। দেশ-কাল-পাত্রের অতীতে তুরীয়লোকে তখন তার স্থিতি ...

কেন হিন্দু, তুমি বিশ্বাস করো না?

করি করি। পাতালেশ্বরে ঘণ্টুদার দিদি সরমাকে অমনি আচ্ছন্নে 'ভর' অবস্থায় দেখে বালক মন অবাক হয়েছে।...জামাইবাবু আচ্ছন্ন অবস্থায় অঘোরে পড়ে থাকতেন। পাগলামীর চিকিৎসা করানো হতো। তেতলায় ঘরে বন্ধ থাকতেন। রাতে বারান্দা থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে যেতেন গঙ্গার ঘাটে। পুলিস অবধি অবাক হতো। গঙ্গায়

ডুবে গেলেন! তাঁর দেহও পাওয়া যায়নি। তাঁর সপিণ্ডকরণ হবে কি না। বারো বছর পরে সেই সপিণ্ডকরণ হবার ব্যবস্থা হয়। বারো বছর ধরে বিবাগিনী সধবা সরমাদি কালিদাসকে বড় করেন। কালিদাস বাপের সপিণ্ডকরণ করবে। সরমাদি থান কাপড় পরে সপিণ্ডীকরণের চাল বাছতে বাছতে উন্মত্ত উদ্দাম নৃত্য করতে থাকেন। ঠিক যেন জামাইবাবুর গলা।..

কাশীর ছেলে। 'ভর' অনেক দেখেছি।

এই 'ভর' কি? স্বয়ং-সংবেশ? নিজেব মনকে নিজের শক্তিদ্বারা নিশ্চেষ্ট করে নিদ্রিত করে রাখা? মনই যদি নিদ্রিত, বোধ করবে কে? ইন্দ্রিয়রা তো বোধ করে না। জানলা তো বোধ করে না। জানলা দিয়ে বাতাস আসে; আলো আসে; গান ভেসে আসে; গন্ধ ভেসে আসে। বোধ কববাব কর্তা তো ঘরের মধ্যের মানুষটি। সে-ই যদি নিদ্রিত—বাতাস, আলো, গন্ধ, গান—ওরা আসে যায়; ঘর ঘরই থাকে। নির্বোধ ঘর তার অনুভূতিতে না হয় হৃষ্ট, না বিষণ্ণ।

দেবতার দেবত্ব নিয়ে যত জল্পন, পরিকল্পন,—'ভর' নিয়ে, 'লাওয়া' নিয়ে সে সব তত্ত্বকথা নেই। 'লাওয়া'-কে হেইতীয়ানরা প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং বলে মনে করে। ওরা চায় মনকে দেহ থেকে বিমুক্ত করে কেবল আত্মস্থ জগতে পরিক্রমণ। মার্কাসের ভাষায়, "দেহের প্লেটখানা থেকে মনের আখর মুছে ফেলো।" এমন কি অবমানসিক লেখা-জোখাও মুছে ফেলা। সেই স্ফটিক নির্মল পটে তখন অতিমানসিক চিদাভাস অতিপ্রাকৃত লীলায় পরিব্যাপ্ত থাকবে, এতে সন্দেহ কই? দেহের ঘুম নয়। সেই নির্মল, মন-হীন অস্তিত্বানুভূতির, অহং-হীন আত্মানুভূতির মধ্যে দেহচিত্তে কর্মের অনুষঙ্গ থাকবে। আহার-নিদ্রা-ভয়-লোভহীন শরীরযন্ত্রটা প্রাণস্ফূর্তিতে অতিচঞ্চল, অতিকর্মী হয়ে উঠবে। সেই আনন্দানুভূতিই পুনঃ পুনঃ জীবকে এই স্বয়ং-সংবেশক সহস্রারে ফুটিয়ে তুলতে ত্বরান্বিত করে তোলে।

'ডক্টর প্রাইস মার্স, ডক্টর হের্সকোভিৎস্, ডক্টর দর্সেনভীল ভুডুতন্ত্রের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ডক্টর মার্স বলেন—এই সূক্ষ্ম আত্মসমীক্ষণ "a mystic state characterised by a delirium of theomanic possession and splitting of the personality." ডাঃ দর্সেনভীল যেন অতোটা বলতে চাননি। উনি ভুডুতে দেখেছেন দাস-ইতিহাসের নখরচিহ্নিত মনের দ্বৈত-জীবনের উল্লাস। উনি বলছেন, এ আবেশ "...is a religious and racial psychoneurosis characterised by a splitting of the ego with functional alterations of sensibility and newbility, a predominance symptoms." ডক্টর লুঈ মার্স্ নিজে একটি 'ভুডু-ভর' প্রত্যক্ষ করে তার বৈজ্ঞানিক লক্ষণগুলো খুঁটিয়ে দেখিয়েছেন। হেইতীর মনীষীরা ভুডুতত্ত্বের আলোচনায় মগ্ন। বিদেশী আমরা। দু দশবার ভুডু মন্দিরে যাই। সতীর্থতা, সধর্মতা না থাকা সত্ত্বেও যতটা পারা যায় হয়তো দেখি। কিন্তু থৈ পাই কি? ডঃ মার্সই কি পেয়েছেন? তবু তিনি যা বলেছেন খুই স্পষ্ট ও সঙ্গত। বাদ্য, মন্ত্র, সঙ্গীত ছন্দোময় অনুভূতিকে বিশ্বছন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে

দেয় সহজেই। গান, স্তবস্তুতি অভিনিবেশের আঙ্গিক। হিন্দুর যোগ একক সাধন। বিবিক্ত সেবীর সাধন। সুদূর মেক্সিকোতেও এই যোগসাধন হতো। 'পিওৎল্'-নামক ভেষজ মাদক ব্যবহার করে তারাও একক আসনে দীর্ঘকালের জন্য বসতো। মহাযোগী বালনন্দজীর জীবনে দেখি তিনিও শংখিয়া ব্যবহার করতেন। কিন্তু আফ্রিকান যোগতন্ত্রের বড়ো কথা "ফল"। চক্রে বসে এরা। এ চক্র বহুর চক্র। চক্রের মধ্যে চক্র। গৃহের মধ্যে গর্ভ; গর্ভের মধ্যে গৃহ! ব্যূহ-রচনা এদের প্রধান যন্ত্র।

হেইতীয়ান মাত্রেই নিজের দেহকে আবেশের লীলাভূমি বলে মনে করে।' মনে করে প্রকৃত সত্য যেমন মাদকতার আবেগে অন্তঃকরণ ভেদ করে বার হয়, সর্বসংশয় ছিন্নভিন্ন করে বার হয়—চিদানন্দের সাক্ষাৎকারের ফলে যেমন সষুপ্তির আবেশে নিদ্রিত মানুষ সত্যকথাকে প্রকাশ করে দেয়—তেমনি উলঙ্গ শিশু মনের স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দের সত্যরূপ প্রত্যক্ষ করার একমাত্র উপায় এই অরূপ সাগরে ডুবে রূপে মগ্ন হয়ে যাওয়ায়।

'পাপা-লেগ্‌বা' ভর করলে অবিষ্ট ল্যাংচায়, তখন তার জরাক্ষীণ হাতে লাঠি চাই। লাঠিই নৈবেদ্য। 'আগাউ' থাকেন মেঘে। আগাউ অবিষ্ট তেমনি আগডালে উঠে যেতে চায়। দীর্ঘ দীর্ঘ পাম সে অতিসহজে চড়ে যায় তখন। যেন পাখি, বাঁদর, প্রজাপতি। 'ওগউন-ফেরেইল' রণ-দেবতা। তাঁর ভরাক্রান্ত জীব তরবারির আঘাতে রক্ত বহাবে। প্রাণ নেবে, প্রাণ দেবে। ওগউন আগুযে আরোয়ো বরুণ দেবতা। আবিষ্ট সমুদ্রে নৌকো নিয়ে যায়। বিনা দাঁড়ে নৌকো বয়ে নিয়ে যায় দিগন্তের পারে। এর্জুলী চায় পুরুষ; চায় জীবসৃষ্টি। তার আশীর্বাদে অপুত্রো লভতে পুত্রং। এর্জুলী-আবিষ্ট নারী বা পুরুষ, বা নারীতে আবিষ্ট হয়ে রতি-আরতি করলে হেইতীয়ানরা ধন্য হয়। ঘেডেস্, ইউমেনায়ডেস-এর আবেশে সেই রতি যজ্ঞ প্রমোদের বীভৎস প্রচণ্ড তাণ্ডবে পরিণত হয়। এই 'লোওয়া' তত্ত্ব, হেইতীর ভূডু মন্দিরের আশ্চর্য, হেইতীর প্রতি নর-নারীর রক্তকণিকায় বর্ণের মতো মিশে আছে। হেইতী সরকার ভূডুকে স্বীকৃতি দিয়ে হেইতীয়ানদের মানসিক স্বাতন্ত্র্যকেই স্বীকার করেছেন।

আমি ভূডু তত্ত্বের আলোচনায় ফরাসী-দাস ব্যবসায়ের কেন্দ্র, দাস সংগ্রহের উৎস, দাস বিকীরণের ক্ষেত্রগুলোর সন্ধান করতে চেয়েছি। দেখেছি, সুদানের বহু উপজাতি হেইতীতে। বাম্বা, কুইম্বারা, ওলুফ, সুসু, মান্দিঙ্গো, পীউল—সবই সুদানের উপজাতি। সুদান এবং দাহোমী মিলেই হেইতীর এক তৃতীয়াংশ নিগ্রো। 'আল্লাদা, মাহী', ফোঙ্—এরা দাহোমীর উপজাতি। নাগো, আইবো, কাপালু—গিনী-র (বর্তমান ঘানা) বাসিন্দা। কিন্তু কঙ্গোর আফ্রিকানরা সংখ্যায় সবার বেশী। ফাং, মোসোম্বে, বাফিয়োৎ, মোন্দোঙ্গো—হেইতীতে আক্‌চার মিলবে। এ সব দেশের তন্ত্র এসে একটা কড়াপাক হয়েছে হেইতীতে। বাইবেল মিশেছে সেই সঙ্গে; কপটিক চার্চ। কত খ্রীস্টিয় সেণ্ট 'লাওয়া' হয়ে গেছে হেইতীর টোনেলে।

ত্রয়োদশ লুই প্রথম দাস প্রথাকে স্বীকৃতি দেন। দিতে চাননি। কিন্তু 'না দিলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হীদেনগুলোকে ত্রাণ করার সৎকর্মে বাধা জন্মানোর পাপ'ও তো তাঁর

খ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে পারতো। অগত্যা, খ্রীস্টজনহিতায়। ধর্মধ্বজী কার্ডিনাল রিশ্যালুর অভিনব বাণী লুঈকে দাস-ক্রয়-বিক্রয়কে খ্রীস্টিয় সৎকর্ম বলে প্রমাণিত করে। কিন্তু নিগ্রোদের রক্তে ভুডু নিত্য প্রতিষ্ঠিত। 'চব্বিশ বছর ঘর করেছি। তা বলে রান্নাঘরের চৌকাট মাড়াতে দিইনি' বলেছিলো কোন ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী তার ছুতোর মিস্ত্রী বৈষ্ণবকে; 'খ্রীস্টান হয়েছি, তা বলে ভুডু ছাড়বো—এ আবার কেমন ম্লেচ্ছ কথা?' বলে হেইতীয়ানরা। ত্রিনিদাদ-গায়ানার হিন্দুরাও বলে, 'খ্রীস্টান করেছো; মাথায় জল ছিটিয়েছো; ছেলের নাম করেছো হার্বার্ট, বিশ্বা জর্জ। তা বলে সত্যনারায়ণ পুজো করবো না; পুরুত বামুনের পা ধোয়াবো না; রামায়ণ গান করবো না—চৌদ্দপুরুষের ধর্ম ভুলে যাবো?—নৈলে মেলোচ্ছো বলেছে কেন! যত অনাছিষ্টি কথা!'

...ফাদার লাবাতের সুপ্রসিদ্ধ ডায়েরীতে বৃদ্ধের চিৎকার শোনা যায়। হায় হায়! কেন এদের খ্রীস্টান করা। Arc of the Covenant-কে এরা স্ত্রীযোনিরূপে পুজো করলে গা! Our Lady-কে কিনা এরা রতিপরায়ণা ঈর্জুলী-র মহাক্ষেত্র করে ছাড়লো? পাপ! পাপ!!! ওরা যে তিমিরে ছিলো, খ্রীস্টান হয়ে আরও থকথকে তিমিরে ঢুকে গেলো। এই একটি ক্ষেত্রে খ্রীস্টধর্ম নরককে নরকতর করে ছাড়লো।

এই সূত্রে আমার মনে পড়ে যায় মেক্সিকোয় এক তান্ত্রিক সাধনার গূঢ় অভিজ্ঞতা। এই ইর্জুলী, এসতার্তে, নীলসরস্বতী, আইসীস, আফ্রোদিতি, বগলা, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তাই সেখানে বিগলিত চিকুরা দিগবসনা ললিত যৌবনা কোয়াৎলিক্যু, শোয়েশিৎলিক্যু। পেয়েছি সেখানে মহাচক্রে আসীনা ভৈরবীর কামোচ্ছলিত প্রকাশ; শক্তির বিস্ফোরণের সমুত্থিত গর্জন-তরঙ্গের প্রকোপ। সে অন্ধকার, সে আলো, সে চিতারণ্য, সে ভয়ঙ্কর করুণা হয়ে ঝরে পড়েছে আমার বিভ্রান্ত চলার পথে। সদ্য ও সাক্ষাৎ মৃত্যুকে অতিক্রম করেও মন প্রশ্ন করেছে—'হয়তো এ মরণ করেছি অতিক্রম? ফল কী? মরণের জগতে এ-তো অপেক্ষাকে দীর্ঘায়িত করা ছাড়া কিছু নয়। মৃত্যুই যার সিদ্ধান্ত, সময়ক্ষেপে তার মূল্য কোথায়?'... সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, কিছু মেক্সিকোয়, কিছু কাম্বোডিয়ায় যথাকালে যথাস্থানে বলবো। কোনো কোনো পুণ্যকথা শুভকথার গুণই এই যে তার প্রকাশে আনন্দ বাড়ে, অপ্রকাশে বেদনা।

শুধু খ্রীস্টান নয় ভুডুতে পাই পূর্বের নাগ ধর্মে, শৈবাচারে, কারীব-আরাওয়াক মেক্সিকানদের পাখাওলা নাগ এবং গরুড়ের পুজায়। মেক্সিকোর কোয়ালিৎক্যু, কোয়েৎ-জালকোৎস্ এবং মায়া-সভ্যতার কুকুলকান্ য়োরোপের ম্যাজিক, কাব্বালা,—এসীনিজম্ সবই পাওয়া যাচ্ছে ভুডুর জগরঝম্পে। রাডা-তন্ত্র কোঙ্গো তন্ত্র এবং পেত্রো তন্ত্র (রাধা তন্ত্র?—সঙ্গ-তন্ত্র?—প্রেত তন্ত্র) এই তিনটি মুখ্য তন্ত্রে ভুডু তন্ত্র এখন সাধিত হয়। এর মধ্যে পেত্রো-তন্ত্র সর্বাধিক গুপ্য এবং সর্বাধিক নৃশংস। নরবলি প্রায়ই হয়। শিশু বলিই বেশী। কারণ স্পষ্ট। খাদ্য হিসাবে শিশু মাংস কোমলতর। এখন লোকে আশ্বাস দেয়—নরবলি আর হয় না। তবে মাঝে মাঝে সে-সব শিশু হারিয়ে যায় তাদের মা-বাপ কাঁদেও না পর্যন্ত। পুলিসে খবর দেওয়ার কথাই ওঠে না।

একটি কথা না বললে ভুডু কাহিনীর অঙ্গহানি হবে। ভুডু এবং ওয়াঙ্গা দুটো

আলাদা ব্যাপার। ভূডু যদি কুলাচার ও চক্র-তন্ত্র হয়, ওয়াঙ্গা মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণ প্রভৃতি কবচ-মাদুলীর বৃত্তান্ত। প্রথমটার গতি যদি সম্মার্গে হয়, দ্বিতীয়টা উন্মার্গ। প্রথমটা যদি কর্পূর তিলক স্তোত্র হয়, দ্বিতীয়টা অপরাজিতা স্তোত্র। প্রথমটা যদি লোকোত্তর ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদন হয়, দ্বিতীয়টা নিতান্ত লৌকিক, জীবনানন্দের ভূরিভোজনের চরিতার্থতা। লোকে, বিশেষ খ্রীস্টানরা,—ওয়াঙ্গাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। ঘৃণাও করে।

"অথচ হেইতীতে এতো শাদা পর্যটক আসে কেন?" জিজ্ঞাসা করে মার্কাস। "শাদা যারা আসে তাদের মধ্যে আবার মেয়ে কেন বেশী? ঐ সব টোনেলের অন্ধকারে ওয়াঙ্গানদের কাছ থেকে ওরা চাইছে কবচ, তাবিজ, বশীকরণ,—এমন কি সন্তান! ফল পায় বলেই আসে।"

মার্কাসের কণ্ঠে তিক্ত বিদ্রোহ।

[আমি স্মরণ করি ভারতে গোয়া, পুনা, বম্বে ইত্যাদি মহন্ত কেন্দ্রেও তো ভূরি ভূরি শ্বেতাঙ্গিনী আসছেন ঝুড়ি ঝুড়ি ডলার নিয়ে।]

সেই কণ্ঠে আমি প্রথম হেইতীয়ান বিদ্রোহী নেতা মাকান্দালের কণ্ঠ শুনলাম যেন। মাকান্দাল, বুকমান্—দুজনেই এরা হাউঙ্গান ছিলো। এরা যখন সংগ্রামে প্রবেশ করে ফরাসী নিধনে ব্যস্ত তখন 'লোওয়া' এদের দেহে আবিষ্ট হয়েছিলো। অন্তত হেইতীয়ান ধূমোবতী-চামুণ্ডা ঐ তান্তিয়া আমাকে তাই বলেছিলো।

"ঐ যে পাথুরে সব জমাদার মূর্তি দেখছো, ওদের প্রতিষ্ঠা ভূডুতে। যত বিশপ-ফাদাররাই ওদের মূর্তিতে জল ছিটোন না কেন, প্রত্যেক মূর্তির বেদীর তলায় পাবে ভূডুর ক্রিয়াকলাপের চিহ্ন। মাকান্দাল, বুকমান্, তুস্যাঁ, পেতিয়ঁ, রিগো এমন কি ঐ যে মহামান্য দেসালীন, ক্রিস্তফ—প্রত্যেকের নাড়ী বাঁধা ভূডুতে।" তান্তিয়া সোল্লাসে বলে আর পাতায় ঢেলে দেয় ভাত; কাঁকড়া চচ্চড়ি,—লাল শিম-শুঁটির দাল।…নীরবে খায় মার্কাস। আমিও নীরবই। কিন্তু মনে যেন বটুক ভৈরবের গান।

"ভূডু! এ তত্ত্ব যেন 'ওঠ ছুঁড়ি, তোর বে'—বলেই জানা যায়। আমার সাঙ্গাৎ আমাকে গৃহে প্রবেশ করিয়েছিলো, তখন বয়স আমার কত? দশ হবে কি-না। প্রথম দশ পেরুইনি। রক্তে অঙ্গ ভেসে গিয়েছিলো; কিন্তু আমার না হলো ক্ষত, না ক্ষতি। সেই থেকে এক নাগাড়ে সত্তর বছর আমি কত হাউঙ্গানকে আসতে যেতে দেখলাম। আজ আমি ইচ্ছে করলে আছি, ইচ্ছে করলে নেই। এ তত্ত্ব, পঞ্চভূতের তত্ত্ব, প্রকৃতির প্রত্যেক প্রকাশে জীবনতাপের তত্ত্ব। জীবের যা জীবত্ব, শবত্ব বাদ দিয়ে যে শিবত্ব, জড়ত্ব বাদ দিয়ে যে বুদ্ধত্ব, তার সাধনা কে করে?…জড় এই পিণ্ড, দেহ। এই দেহের ভেতর একটা জীবশক্তি কাজ করছে। খাদ্যে, অন্নে যার গতি। খাদ্যের মধ্য দিয়ে, অন্নের মধ্য দিয়ে দেহে, শিরায়, চৈতন্যে যার শক্তি বিকীর্ণ—'প্তী বোঁ-আঁন্স্-এ'—বলি। দেহকে ধারণ করে রেখেছে সেই প্রাণশক্তি। ,সেটারও অন্তরে এক অদেহী, অপ্রাণ, অন্নাতীত বল আছে, যে বল যোগ-প্রত্যক্ষ, যে বল বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে একাত্ম। দেহের আসনে, অন্ন-প্রাণ-শক্তির দোলায় সে ঘুমুচ্ছে আর ঘুমুচ্ছে। কিন্তু ঘুমই যখন ঘোর

ঘুম হয়ে, দেহবোধ, আত্মবোধ, কালবোধের সীমা পেরিয়ে যায়—তখন বার হয় সেই 'গেবা-বো-আঁন্স্-এ' ; উঠে যায় নক্ষত্রলোক ছাড়িয়ে মহাশূন্যের মহাঘূর্ণির মধ্যে। নাচে আর নাচে। দোলে আর দোলে। তার সঙ্গে দোলে যে সে হলো গুণী। সে গুণীর দেহপিণ্ড তার ইচ্ছাতেই ছাড়া যায়। সে দেহপিণ্ডের সৎকার কে কবে? কে করবে? গুণী ছাড়া কে? কে? কে? কে?…

ভীষণ তাশ্তিয়ার মূর্তি। ভাষা ভীষণতর। কিছু বুঝি না। অনেক বুঝি। মার্কাস যেমন বুঝিয়েছিলো নোট নিয়েছি। সব নিয়েছি কী? সব বলতে পেরেছি কী? সে ভীষণা চামুণ্ডার ভাষার রুক্ষ শোভা আমি ধরে রাখি সাধ্য কী!

ভাঁটার মতো ঘুরতে থাকে তাশ্তিয়ার চোখ। হাতে একটা প্যান ছিলো। সেইটা দিয়ে ক্রমাগত পিটুতে থাকে মার্কাসকে। দৌড়ে মার্কাস কুঁড়ের বাইরে চলে যেতে চায়। হ্যামকের কাছাকাছি যেতে যেতেই উঠোনের ধুলোয় পড়ে যায়।

আমি ওকে ধরার জন্য যেই বাইরে গেছি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় তাশ্তিয়া।

এক দমকা ঝড় এসে ধুলোবালি ঝরাপাতা উড়িয়ে ঢেকে দেয় আমাদের।

নতুন টোনেলে নিয়ে এসেছে মার্কাস। সেদিন কাদের দীক্ষা দেওয়া হবে। যে-সে দীক্ষা নয়, পূর্ণাভিষেক। অন্য দ্বীপ থেকে এসেছে। উভয়েই মোলাত্তো। কালো নয়। দ্বীপে দ্বীপে ভুডুর যোগাযোগ। এ টোনেলটা বেশী দূরে নয়। সমুদ্রতীরে বড় বড় গুদাম। তার পাশে ভাঙা নৌকোর গদি। তারপরে বিরাট নারকেল বন। বন পেরিয়েই ব্রেডফ্রুট আর লেবুবাগান। লেবু বাগানের মধ্যে পাতায় ছাওয়া টোনেল। বাদ্যযন্ত্রের বৈদ্যুতিক ছন্দ আমার রক্তে সঙ্গে সঙ্গে মাতন ধরিয়েছে। তাড়াতাড়ি পা ফেলি।

হাসে মার্তিন। 'তোমাকেও ধরেছে!'

আমি শুধু হাসি। লজ্জিত হই না; খুশী হই।

দীক্ষার প্রথম তিন দিন ধরে চার্চে দীক্ষা প্রার্থিনীরা বারংবার কনফেশন্ করেছে। অতঃপর প্রধান হাউঙ্গানের কাছে জীবনের সমস্ত পাপ-অপাপ কীর্তন করেছে। অন্তঃ-শৌচ করার ছদিন সামান্য আহার করেছে। তারপর একান্ত গৃহে বাস ও অন্তঃসমীক্ষা এবং তদ্গতাভিনেশের অধ্যাস তিন দিন: ধ্যান আরও তিন দিন। পনের দিনের এই শেষ ছয়দিনে মুহুর্মুহু স্নান, দেহশুচিতা রক্ষা করা। নির্বাসিন জীবন, উলঙ্গ মন এবং উপেক্ষিত দেহকে সমাবিষ্ট করা। ধীরে ধীরে দেহে আবিষ্ট হয় 'লোওয়া'-'আইজান্ ভেলেকুয়েৎ-এ'। শুচি-দীপ্ত, প্রায়শ্চিত্ত-ক্ষীণ সৌম্য দেবতা। আবিষ্ট দেহ শ্বেতবস্ত্রে ঢেকে শায়িত অবস্থায় মেঝেয় রাখা। সমস্ত দেহ শ্বেতবস্ত্রে জড়ানো। মুখ খোলা। এই প্রথম দেখলাম—সত্যই শ্বেতাঙ্গিনী। দুজনেই। প্রত্যেকের মাথার তলায় এক এক টুকরো পাথর। একই ভাবে চার দিন-রাত শবের মতো পড়ে আছে এরা। চোঙ দিয়ে পাতলা শঠীর জল এদের মুখের মধ্যে কখনও কখনও ঢালা হয়েছে। এদের দেহের বলিই সাধনের প্রতীক; সে বলিদান হয়ে গেছে। এদের দেহের অন্ত্যেষ্টির প্রতীক এদের সর্ব-অঙ্গের কেশ, নখাগ্র, এবং বলির পশুর রোম, ক্ষুর, শিং একটি পাত্রে ঢাকা আছে। এদের আত্মা ঢাকা আছে অন্য পাত্রে। এরা এখন ইচ্ছাহীন আধার; ন্যাস করার যোগ্য

পাত্র। তলোয়ার হাতে দুজন কোল সিপাহী নানা নৃত্যে আরতি করে 'শব'দেহ দুটি। সে নাচ অপূর্ব। ভক্তি, নম্রতা, নিবেদন, আরতি উপচে পড়ছে সে নাচে।

সেই নাচে যোগ দিলো মালা মতো সারি বেঁধে হাউন্সির দল। দুটি বিভিন্ন বৃত্তে ঘুরতে লাগলো। এক বৃত্তের মধ্যে অপর বৃত্ত। কিছু ছন্দে, কিছু নৃত্যে, কিছু তদ্‌গত ভাবনায় কখনও মনে হয়নি অতগুলি দেহ নিরাবরণ; কেবল মাথায় বাঁধা রঙিন উষ্ণীষ। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর তারা নীচু হয়, হাঁটুতে ভর করে বসে; সোজা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, তখন তাদের স্তনাগ্র চূড়ার থরথর স্পন্দনটাই সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়; তারপরে একসঙ্গে সব উলটে পড়ে; নিতম্ব দোলে; ঠোঁট দিয়ে মেঝেয় চুম্বন করে। এরপর যখন তারা আবার উঠে বৃত্তাকারে নাচে, শাদা কপাল, শাদা ঠোঁট অদ্ভুত দেখায়। মেঝেব শাদা গুঁড়ো লেগেছে। এক গাছি মালা নিয়ে, যখন একটা গাউন-পরা দল এলো তখন এরা মালার গাদি পরে জঙ্ঘা বক্ষ আবৃত করলো। অন্য দল এসে সাদা গুঁড়োয় আলপনা দিতে লাগলো।

ধীরে ধীরে বাদ্য থামে। নৃত্যপরায়া হাঁটু গেড়ে বসে। মন্ত্র উচ্চারণ চলতে থাকে। সকলে মাথা ঠেকায় মাটিতে।

"হেলা-হেলা-হেলা—লা মাদলীন মরিতে লে-পেঁদ। ভেনে মঁদু—ভেনে ভেনে মঁ-দু—মঁ-দু সোভিয়ে—ভেনে রেজ্‌না-সঁময়-অসেন্দ্রে দে মঁক্যা,—ভেনে মঁদু ভেনে" ...ফরাসী-আফ্রিকান ক্রিওল ভাষায় মন্ত্রপাঠ চলতে থাকে। এই মন্ত্র ক্রমশ ছন্দোময় হয়ে ওঠে! সামগানের মতো ঋকের পর ঋক। একজন বই থেকে পড়ে। সকলে গম্ভীর হয়ে তা উচ্চারণ করে। ঘণ্টা দুই এই মন্ত্রপাঠ চললো।...ধীরে ধীরে কখন যে এর সঙ্গে ঢোল যোগ দিয়েছে টের পাইনি। মন্ত্র শেষ হবার পর ঢোল চলতেই থাকে। এই মন্ত্র ক্রমশ ছন্দোময় হয়ে ওঠে। সামগানের মতো ঋকের পর ঋক। একজন বই থেকে পড়ে। সকলে গম্ভীর হয়ে তা উচ্চারণ করে। ঘণ্টা দুই এই মন্ত্রপাঠ চললো। ...ধীরে ধীরে, কখন যে এর সঙ্গে ঢোল যোগ দিয়েছে টের পাইনি। মন্ত্র শেষ হবার পর ঢোল চলতেই থাকলো। তখন বোঝা গেলো। ঢোল ক্রমশ উচ্চগ্রামে উঠতে লাগলো। তারপর উদ্দণ্ড নৃত্য। একে একে সকলে সেই 'শব' দুটি বহন করে নাচতে নাচতে নাটমন্দির ছেড়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলো। গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ হলো। কেবল ঢুলিরা ঢোল বাজাচ্ছে। মেঝে খালি।

কোথায় গেলো ওরা ?—এর পর কি ?

ইশারা করলো মার্কাস। "চুপ করো। দেখো। সব বুঝবে। এরপর? এর পর জীবন। জীবনের পূজা!"

চুপ করে রইলাম।

কোণটার অন্ধকার অন্ধকার হয়েই রইলো।

আধঘণ্টার পর ওরা যখন অঙ্গভঙ্গী করতে করতে বার হলো প্রত্যেকের হাতে কোনো না কোনো আরতি-হোম সামগ্রী। বহু তরুণীর মাথায় জীবন্ত মুরগী বাঁধা। তার

ডানা দুটো গালের দু ধার দিয়ে ঝোলানো। মেঝেতে খুঁটোর তিন ধারে তিনটে হবন কুণ্ড হলো। প্রত্যেকটা কুণ্ডে তিনটে করে লোহার ডাঁটি মেঝেয় বিঁধে ত্রিপদী করা হলো। প্রতি ত্রিপদীর ওপর একটা করে কড়া। কড়ায় কি কি সব ঢাললো। কয়েক-জন মহিলা, যাদের মাথায় মুর্গী, তারা পা ছড়িয়ে বসলেন—এর পায়ের পাতা ওর পায়ের পাতায় ঠেকিয়ে গোল হয়ে বসার ফলে পা ফাঁক হলো অনেকটা। কোলের কাছে কিছু শস্য ছড়িয়ে দিয়ে মুর্গীগুলোকে ছেড়ে দিলো দুই জঙ্ঘার মধ্যে। ব্যগ্র হয়ে শব্দ করতে করতে তারা যখন দানা খুঁটে খুঁটে খেতে থাকলো তখন জোর বাদ্য বেজে উঠলো। আনন্দে সকলে করতালি দিতে লাগলো।

দেবতা প্রসন্ন। হোমের আগুন জ্বলে উঠলো। কড়ায় তেল কলকল করছে লাগলো। এবং সকলে যুগপৎ মুর্গীগুলোর জিভ হাত দিয়ে টেনে জিভগুলো কড়াতে ফেলে দিলো। তারপর কুশলী ক্ষিপ্রতায় ঠ্যাং আর ডানাগুলো মুচড়ে ভেঙে দিলো। গলাটা ধরে পাক দিয়ে শূন্যে ঘোরাতে থাকলো পাখীগুলো। গলা ধরে টেনে ছিঁড়ে সেগুলোও কড়ায় ফেলে দিলো। তারপর চটপট পালক ছাড়িয়ে প্রত্যেক অবয়ব ছিঁড়ে যখন তিনটে কড়ায় সব পাখী ছাড়া হলো তখন নিবেদনকারিণীদের সর্ব অঙ্গ এবং মেঝে লালে লাল। অন্ধকার, শিখা, ধোঁয়া, গরম, পালক, চিৎকার পাশব একটা বীভৎসতা ভাসিয়ে দিলো ইতঃপূর্বের সেই শান্ত সংহত পরিবেশ।

মুর্গী। হতে পারতো মানবশিশু।

হতে পারতো ছাগশিশু।

মার্বাসি বলে,—"যে কোনো সময়ে হতে পারে। এ ভুডু!"

শাদা কাপড়ে ঢাকা বিশাল একটা জন্তু ঘরময় ঘোরাঘুরি করছে। পাছে তার একাংশ দেখা যায়, হাউঙ্গিরা ঢাকা কাপড়খানা টেনে মেঝের সঙ্গে এক করে রেখেছে। হঠাৎ কাপড়ের একটা কোণ উঠে গেলো। তখন দেখি দুখানা হাত। দুখানাই বাঁ হাত; একখানা, নীচেরখানা পুরুষালী এবং কালো; অন্যটা, ওপরেরটা মেয়েলী এবং শাদাটে। একজন হাউঙ্গি তাড়াতাড়ি কাপড় টেনে দিলো। কালো হাত ভেতরে ঢুকে গেলো। শাদা হাতটা বার করে নিলো। অর্থ? কালোটার পিঠের ওপর শাদাটা উবু হয়ে আছে। দু হাতে কালোর দু হাত ধরে আছে; পড়ে না যায়।

কিন্তু হাউঙ্গি শাদা হাতখানায় খানিক তেল ঢেলে দিলো। তারপর একটা পাত্রে খানিকটা জল আর আটা ঢেলে, তেল দিয়ে নাড়তে নাড়তে সেটাকে একটা দলা পাকিয়ে নিলো। সেই গরম দলাটা নিজের হাতে তোলার সময়ে হাউঙ্গিটার বিকৃত মুখ দেখে বুঝতে পারি কত গরম। কিন্তু শাদা হাতখানার পাতা মেলে ধরে তার ওপর দলাটা ঠেসে ধরে আঙুলগুলো গুটিয়ে পুরো মুঠো চেপে কাপড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো। কেঁপেছিলো কি সেই কাপড়ের তলায় সেই বর-অঙ্গ? যেন কাঁপলো; যেন স্থির হয়ে গেলো।

নৃত্যপর শুভ্র বস্ত্রাবৃত দানব ঘুরে এলো। অন্য হাতে আটার দলা মুঠোয় চাপানো

হলো। শুভ্রবস্ত্রাবৃত দানব ঢুকে গেলো গর্ভগৃহে। অন্য মিথুন; অন্য শাদা হাত; আবার সেই স্পন্দন; থেমে যাওয়া; গর্ভগৃহে প্রত্যাবর্তন।

তারপরেই নরক ভেঙে পড়লো। বোতলের পর বোতল ভাঙতে লাগলো। মেঝের মদ; শরীরে মদ; মাথায় মদ; পেটে মদ। প্রধানা হাউঞ্চির তখন আর বাহ্যজ্ঞান নেই। অনেকেরই নেই। অনেককেই ভর-এ পেয়েছে। প্রধানার ভঙ্গী রিরংসায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অঙ্গে বাস থাকলেও বোঝা যায় না। কিন্তু এ যে নির্বসনের দল। একজনারই যে কেবল ওই অবস্থা তা নয়; অনেকেই তদ্রূপ। তবে প্রধানার মতো বিকরাল-রিরংসা-মত্তা মহিষমর্দিনী-তান্ডব-সাধনায় আর কেউ নয়। যাকে তাকে জড়াচ্ছে; মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে; উঠছে; অন্যকে; গড়াচ্ছে, উঠছে—অন্যকে। থিয়া তা থৈ নৃত্য চলমান। ক্লান্তি নেই। অবসাদ নেই। নৃত্যে যতিপতন নেই। একে একে ওকে তখন সবাই ঝাপটে ধরে পোশাক পরাচ্ছে। পুরুষের পোশাক। হ্যাট, কোট, প্যান্ট, শার্ট! ওকে ধরাধরি করে গর্ভগৃহে নিয়ে যাবার পরে 'লাওয়া'—ভর করতে লাগলো। কেউ কেউ 'মরে' গেলো। 'বেঁচে' উঠলো নব জীবনে, উদ্দাম যৌবনে।

বাইরে মুর্গী ডাকছে!

ভোর হচ্ছে।

পৃথিবীর আকাশে তখন শুকতারা পূর্ব দিগন্তে দেখা দিয়েছে। "মার্কাস, চলো।"

কেন এত পাষণ্ড উন্মত্ততা? যতই যা হোক রক্তমাংসে মানুষ—

"মানুষ নও শুধু তুমি; তুমি হিন্দু, ব্রাহ্মণ, শক্তি উপাসক!"

"সব! সব! সবার ওপরে প্রথম, প্রধান—আমি মানুষ! জীব। মাংস আমার ধারক, রক্ত আমার পোষক। এ সহ্য করতে পারি না যেন। বীরাচার আমি পারি না।"

"যারা ভদ্র তারা বীর নয়। ভদ্রতাহীন বীর সহ্য করেছে বীর সমাজ। এখন এটা বীর্যহীন ভদ্রতার যুগ। সহিষ্ণুতা যে কি পরিমাণ অপচয়িত হয়েছে বুঝে দেখো।"

মার্কাসের গলায় ঘৃণার সুর। চাপতে পারেনি মার্কাস!

আমি জিজ্ঞাসা করি, "তোমাদের অধ্যাত্ম খুব উচ্চস্তরের। কিন্তু অভ্যাসটা বড় জৈব। এ দুটোয় সঙ্গতি কই?"

"জৈব? কী দেখলে জৈব? এই সব হাউঙ্গা-হাউঞ্চিরা মরে না। দেহত্যাগ করে। 'গোয়স বো আনজে'—আত্মারূপে দেহে আসে যায়। এ অভ্যাস যাদের আয়ত্ত তারা দিন স্থির করে চলে যায়। তান্তিয়ার ইচ্ছে হলে তান্তিয়াও যাবে, তখন তান্তিয়ার শবকে ঢেকে রাখা হবে গাছের তলায়। সেই শবের ওপর হাউঙ্গা হলে হাউঞ্চী, হাউঞ্চী হলে হাউঙ্গা চেপে বসে সাধনা করবে?"

"প্রকাশ্যে?"

"হ্যাঁ!"

"পুলিসে কিছু বলে না?"

"তুমি কি জানো পুলিস অফিসারই হাউঙ্গা নয়?...কিন্তু যখন পুলিস বাধা দিতো কবরের ওপর চলতো সাধনা। এই দেসুলীন্ প্রক্রিয়ার পর ক্ষণভঙ্গুর চীনামাটির পাত্র ভেঙে অমর আত্মার চিরপ্রয়াণ ঘটে। আত্মা গিয়ে উৎক্রমিত হয় লোকান্তরে যেখানে বহু অমর আত্মার সমাবেশ।"

"দহর বিদ্যা বলতো পারস্যে..."

"আরও অনেক বলতো। মরে গেছে পারস্যে, সীরিয়ায়, মিশরে। এখানে মরেনি।"

"এ তত্ত্বের স্বর্গ তা হলে পিতৃলোক।"

"স্বর্গ? Voodoo is impatient of exploration!"

"হ্যাঁ। আমরাও বলি ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিত গুহায়াং—বলি নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।"

"তোমরা তো ভারেল্, সার্ত্র, জীদ, পড়ো! তাই তো ভেবে এতো অনুরক্তি। সার্ত্র, জীদ ছেড়ে চলে যাও প্রাচীনে। বুক অব দি ডেডস্, অথর্ব বেদ তোমাদের অমূল্য তন্ত্র সাগরে। বিরক্ত হও, বিরক্ত। অনীহা। অস্তিত্বের নৈর্ব্যক্তিকতা জীবনের সমাজোত্তর স্বরূপ—এসব যদি স্বীকার না করো, যাও বাড়ি গিয়ে বেদ আওড়াও কেষ্টো ভজো, পুরুতগিরি করো, ঘণ্টা নাড়ো, প্রজাসৃষ্টি করো আর বেদান্তদর্শনের ওপর বক্তৃতা দাও। এ হলাহল পান করতে আসা কেন?...

"...দাস ছিলাম আমরা, দাস! মুক্তি চেয়েছি দুশো বছরের ওপর। মুক্তি খুঁজেছি বোবা প্রার্থনায়, যদিও চার্চে সেজেগুজে যেতাম। জানতাম ঈশ্বর চার্চে নেই। অন্য কোথাও আছে! অরণ্যে রক্তে, উলঙ্গ নারীর শয্যায় ফুল থেকে ফলের স্ফুরণে। আত্মা ছিলো মাংসে বন্দী। গোপনে কাঁদত। সেই কান্নার সুর মড়া চামড়ায় গুমরে ওঠে। ভুডুর ঢোল 'রাম্বা' মানুষের চামড়ায়ই তৈরী হতো। কাঁদতেও জানতো না সে চামড়া। বোবা যে। যারা কোথাও সঙ্গ পায় না তারা নিজেদের মধ্যে সঙ্গ খোঁজে। যাদের পৃথিবী হারিয়ে গেছে তারা পাতালে পৃথিবী খোঁজে। আলো যাদের অস্বীকার করেছে অন্ধকারই তাদের দিন। চেতনায় যারা বন্দী, অবচেতনে তারা মোক্ষ চেয়েছে।.. কী দেখছো?"

"তোমাকে দেখছি মার্কাস!"

"ছাড়ো হাত! হিন্দু! ব্রাহ্মণ!! কুলাঙ্গার! মিথুনে মৈথুন দেখো; নরনারীর জীবন প্রবাহে কামের আর্তির কালো ঢেকে দাও। দেহযজ্ঞে, রতিযজ্ঞে ক্ষুধা, জ্বর, ব্যক্তিক কামনা খোঁজো। পশু হতে ভয় পাও। পশুর নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে মুক্ত দেহ, মুক্ত দেহধর্ম, মুক্ত জীবনপ্রবাহকে স্বীকার করতে ভয় পাও। ভীতু কখনও হিন্দু হয়? ব্রাহ্মণ হয়? ভয় আর তপসিদ্ধি? পাগল! ভণ্ড!! জীদের মেলানী বাস্তিয়ানকে মনে পড়ে? অন্ধকার নির্জন নিঃসঙ্গতা থেকে তাকে আলোয় ভরা হাসপাতালে ধুমধাম করে নিয়ে চাওয়া হলো। শীতের ফুলকে গরমের দেশে নিলো; ট্রপিক্যাল ফুল নিয়ে গেলো লণ্ডনে প্যারীতে। মরে গেলো, ঝরে গেলো। তোমরা আসবে, হেইতী দেখবে; ভুডুর ওপর তত্ত্ব লিখবে! না হিন্দু, হিন্দু বলেই তান্তিয়া তোমাকে প্রবেশ করিয়েছে এই

বুঝেছে। ভাগ্যবান তুমি। অবিমুক্ত নও। 'আমি কিছু নই, তাই আমি সর্বমঙ্গলময়'
—এ তো তোমাদের কবিই গেয়েছেন।..."

মনে পড়ে যায় ঐতরেয়ের বাণী—শত্রং মা পুর আয় সীররক্ষমধঃ শ্যেনো জরসা নিরদীয়ম্।

"কী ভাবছো ?" আবার মার্কাস গর্জায়।

ভাবছি ! শ্যেনের মতো আমি বহু বহু অধোলোক ছিঁড়ে ফুঁড়ে, বহু-বহু লৌহময় কপাট, অন্ধকারের কারাপ্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে এসেছি—বলেছেন শ্রুতি।

কথাই শুধু ! ঐ জন্যে ! সেখানে কথা চলবে না। সেখানে নির্বাক। কথায় পাবে ?

গলা থেকে মন্ত্র বার হয়ঃ যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ! মার্কাস, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

দূরে পাহাড়ে পাহাড়ে একাদশীয় রজঃস্রাব। কন্দরে কন্দরে ভুডুর বাদ্য বাজছে। তাশিঙয়াকে আজ রাখা যায়নি। অনেকক্ষণ চলে গেছে মার্কাস। আমার মনে হয় ঐ বাদ্যভাণ্ড যদি আজ স্তব্ধ হয়ে যায়, যদি কোনো আইন, কোনো শাসনযন্ত্রের উৎপাত ঐ বাদ্যের কণ্ঠরোধ করে দেয়, খান খান হয়ে ভেঙে যাবে হেইতীর পাহাড়। সেই বিষম সর্বনাশের কাছে পেলীর সর্বনাশও কিছু নয়। কঙ্গোয় লুমুম্বা মরেছে; সুদানে, কাটাঙ্গায়, কেনিয়ায়, জিম্বাবোয়েতে, গিনীতে, দাহোমীতে কতো লুমুম্বা আরও মরবে। ওদের সমস্যা সভ্য অসভ্যের নয়। ওদের নিদারুণ সমস্যা ওদের বুকের প্রশ্ন, হৃদয়ের জ্বালা। শাদারা যদি সভ্য হয়, অসভ্য কি ? জীবন যদি পাপ, পুণ্য কি ? দেহের ক্ষুধা যদি আগুন না জ্বালায়, বাসনা পোড়াবো কিসে ? মাংসকে যদি খেয়ে না ফেলি—আত্মার মুক্তি অবাধ হবে কোন্ উপায়ে ?

নয় নয় করতে হয়ে গেলো অনেকদিন। ভরসা আছে বাকসো পাবো। কিন্তু মার্কাসকে প্রশ্ন করার সাহস নেই। বুঝেছি যা হবার আপ্-সে হবে।

মাঝে মাঝে লাইসী পেতিয়'র বিখ্যাত লাইব্রেরিতে যাই। ম্যাজিক, ভুডু, ডাকিনীতন্ত্র সম্বন্ধে বহু বই। নিগ্রো সমস্যা নিয়ে, দাসপ্রথার বিকীরণ এবং সমাপনের ভাঁওতা সম্পর্কে অধীর, সোচ্চার বহু বই।

তখনও পকেটে টাকা আছে। মোটামুটি একটা জাঙিয়া, একটা তোয়ালে, টুথব্রাশ এবং একটি শার্ট আমার নতুন সঞ্চয় ও সম্বল। সেগুলি নাড়াচাড়া করে ভদ্রতা বজায় রাখা গেলেও মাণিব্যাগের তলা দেখা যাচ্ছে।

লাইব্রেরিয়ান মেয়েটির সঙ্গে তখন ভাব হয়ে গিয়েছে। থেলেমা মার্তিনেজ ক্রমশ আমায় পরিচয় করিয়েছেন প্রফেসর পল ভোদুর সঙ্গে। তাঁরই মাধ্যমে লাইব্রেরিতে গোটা দুই লেকচার দিয়ে আমি তখন টু পাইস বানিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে দু-একজনার বাড়িতে পেয়েছি আমন্ত্রণ। ফলে একটা বক্রী পাজামা শার্টও কিনেছি।

কিন্তু সত্যিকার লাভ হয়েছে থেলেমার সঙ্গ। থেলেমাও ভুড়ু পিয়াসিনী। ফলে যাকে বলে আগা-পাশতলা বিমুক্ত, আন্ইন্হিভিটেড্' (!)—অর্থাৎ আদৌ কোনো সঙ্কোচ বা জাড্যে বিব্রত নয় থেলেমার চলন, বলন, ঠাট, ঠমক। প্রথম যৌবনের তাপতপ্ত দেহমন চল্লিশে এসে রসস্নিগ্ধ হলেও প্রত্যহের ঝড়ঝাপটা খেয়ে বেশ বাঁধা চুলের মতো আয়ত্তাধীন সরল ভাষায় ও তখন আমার অনুরাগিণী হয়েও রাগমুক্ত, বান্ধবী হয়েও নির্বন্ধনে স্বাধীনা। থেলেমা যে নিগ্রো তা চোখ বুজেও বোঝা যায়। নিগ্রো মেয়েরা স্বভাবতই এমন সুস্থ সনাজবিন্যাসে স্বচ্ছন্দ।

...কিন্তু ঘন ঘন ডিনারের ডাক আসছিলো। ইচ্ছেও ছিলো একটু 'ওপরতলায়' ঘুরে আসি। ওখানে এক নয় খুব জমকালো পোশাকে যাওয়া যায়। তা ছিলো না। নৈলে—

তাই করলাম। পোর্তো প্রিন্স্-এর ইয়াট ক্লাবে রোববার সকালে আশ্রয় নিতাম, আর সাঁঝের বাতি নড়লে চড়লে ফিরতাম। কাজেই একটা বেদিং টোঙেকেই সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে গেলো। তনু সেন অতনু মেরে গেলো। সেই সদা সঙ্কামান প্লাসের ক্লাসে ক্লাসিক-সুন্দর হয়ে উঠলাম। লেস্-মাত্র টপ্ ঢাকা তরুণী, সুইম-সুটপরা তরুণীর মা, এবং বেদিং-সুটপরা তরুণীর মায়ের শাশুড়ী সবাই রঙিন নৌকোয় চেপে গল্প করতেন। আমি মাছধরা খেলা করতাম, এবং ধরা মাছ জলে ছেড়ে দিতাম। ফলে খুব একটা গান্ধীয়ানী সৎনাম কিনেছিলাম।

গিন্নী এবং তরুণীরা যে মার্কারই হোন না, কর্তারা বেশীর ভাগ মিলিটারি এবং নেভী মার্কা। আমি চাইতাম এদের মুখে হেইতীর কথা শুনে কিছু জানি। মাছ ধরার ছলে শ্যাম-চাচার বুকের ধ্বনি শুনি।...হেইতীর নোংরামী,—শতমুখ, সহস্রমুখ। হেইতীর বাজার অখদ্যে...[ওঃ যা বলেছেন ; -আমি তো সব আনাই সেন্ট টমাস থেকে। আমি সান্তো-দমিঙ্গো।...অতশত বুঝি না, ফ্রেড তো ফ্লাইট নিয়ে যায়। নুইয়র্ক থেকেই সব আনে ঐ যাঃ, ফ্রেড আবার না ভুলে যায়। ফ্রেড, ফ্রেড।...অ্যাঁ ডার্লিং?...আমার এবারকার ফর্দটা একটু বড়, তা বলে কিন্তু...] সেসব বলতে না বলতেই খই ফুটছে।

হেইতীতে সিনেমা হাউজগুলো...সঙ্গে সঙ্গে হ্যাক্ থুঃ-র নদী-নদ বয়ে গেলো। হেইতী সরকার...চাপা হাসি, খোলা হাসি তরঙ্গে তরঙ্গে। কিন্তু যেই বলা "ভুডু"... অমনি যেন লজ্জাবতীকে ছোঁয়া ; কেন্নোকে খোঁচা দেওয়া ; কাঠবেড়ালীর আখরোট খাবার সময়ে একটু হাঁচির শব্দ। ব্যস্, ফাঁকা। ছেলেরা ঝুপ ঝাপ জলে ঝাঁপালো। মেয়েরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো কানের ওপর ঢাকনা লাগানোয়। ভুডু বাক্য কুবাক্য। আলোচনা বিকর্ম। জমাট আড্ডা গলে গিয়ে যেন রোদে মাখা আইসক্রীম।

ফিরে যাবার পালা।

তার আগে 'দ্রষ্টব্য' দেখা দরকার। ফোটোজেনিক বলিহারীগুলোকে শুট্ করা দরকার। কিন্তু মার্কাসকে ও কর্মে বাগানো কিছুতেই গেলো না। আমি থেলেমাকেই সঙ্গে নিলাম। ওর সঙ্গলাভ ছাড়াও বিশেষ লাভ ওর গাড়িখানা। চালায় অসাধারণ ভাবে ভালো।

শহর থেকে বেরুতে না বেরুতে পথে পথে গরু, গাধা, বকরার রাজত্ব। আর রাজত্ব ধুলোর। এক একবার এক একখানা বাস চলে যাচ্ছে। ধুলোয় ধুলোময়। দু ধারে আখগাছ। সবুজ পাতাগুলো ধুলোয় আস্তীর্ণ। মাঝে মাঝে কয়েক ঘর চাষী। গ্রামই বলা যায়। তার পরেই ঊষর ভূমি। নাগকণ্টক বন। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করছে শোরের পাল। মাঝে মাঝে গাছতলায় বসি। থেলেমা স্কেচ বই এনেছে। ছবি আঁকে। আবার এগুই।

বেলা দুপুরে পাহাড়ী জমি দেখা গেলো। তার গায়ে গায়ে প্রসিদ্ধ ক্যাকটাস-সীসল। হেইতী থেকে সীসল যায় আমেরিকায়। মদ্য এবং দড়ির জন্য সীসলের সুনাম প্রচণ্ড। ম্যানিলা-হেম্প আর কিছু নয়, সিসলেরই আঁশ। সীসলের গর্ভভেদী ডাঁটিগুলো উঁচিয়ে আছে। থোকা থোকা ফুল দুলছে বাতাসে।

জঙ্গলের ধার এসে গেলো। থেলেমা বললো—উনিশ শো আঠারোয় যুদ্ধ শেষ হবার পর শার্লমেন্ পেরাল্টের অধিনায়কত্বে হেইতীয়ান গেরিলাবাহিনী আমেরিকী তন্বীকে শাসিয়েছিলো এখানেই। বহুদিন ধরে বহু রক্তক্ষয়ের পর পেরাল্টে ধরা পড়ে। আমেরিকানরা তাকে শাদাদের মেসের দরজায় পেরেক গেঁথে মেরে তবে নিগ্রোদের শিক্ষা দিয়েছিলো।...আমাদের সরকার এটাকে তীর্থ বলে না। কিন্তু এ জঙ্গলের মধ্যে ভুডুর কীর্তনের বহু আখড়া।

সেদিন ব্যাপ হেইতিয়ানে পেঁাছে রাত কাটাবার পরিকল্পনা ধুলায় ধূসরিত হয়ে গেলেও তখনও আশা ছাড়িনি। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যখন একটা প্রচণ্ড ঝড় জল এলো তখন সবে গোন্নাইভে ছেড়েছি। নিকটতম শহর (?) এন্নেরী। এন্নেরী অবধি যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। আশ্রয়ের তালাশে প্রাণ যায়। থেলেমা না হয়ে যদি কোনো থেলে-বাবা হতো, হয়তো আপত্তি হতো না। কিন্তু ভুডুর দেশ; হেইতীর নিগ্রো-কৌলিন্য; সঙ্গে একটা ফিকে রং কুলি!

ভয়ানক দুর্যোগ। অবশেষে একটা চার্চ পাওয়া গেলো। অবোধ পাদ্রী আমাদের জন্য 'একটা'ই বিছানার ব্যবস্থা করলেন। আমি আপত্তি করতে না করতে থেলেমা বললো, থ্যাঙ্ক-য়ু! আমার দিকে চেয়ে বললো, উই শ্যাল ম্যানেজ ডার্লিং! আমি তো থ'। ভুডু-বনে গেলাম।

ঘরে ঢুকেই থেলেমা বলে, পাগল তুমি? যদি ঘুণাক্ষরে টের পেতো তুমি ক্যাথলিক নও...!

কিন্তু থেলেমা, এ যে অসম্ভব!

আমি ভুডুর দেশের মেয়ে! যোগাসনে রাত কাটিয়ে দেবো; অসম্ভব কেন? ভারী ভীতু তো! ওগো, সব ভয়ের সেরা ভয়, প্রকৃতির ভয়। হার মেনেছি গো! হে মহাপ্রকৃতি দাক্ষিণ্য করো।...আমি চলে যাই তোমার মোটরে।

হেসে হাত ঘুরিয়ে ল্যাজেরীপরা সুন্দরী বলে, আঁ-রিভোয়া! চলে গেলাম।

সকালে ঘুমন্ত আমাকে পাদ্রী দেখেছে।

আমি যখন উঠেছি তার মধ্যেই পাদ্রীকে থেলেমা কাদার লাপ্পী বানিয়ে ছেড়েছে।

পাদ্রী আমাকে প্রায় নমস্কার করে বলে, ভারতের বিখ্যাত যোগী আপনি। আপনাকে কষ্ট দিলাম। তখন বলেননি কেন?

আমি সঙ্গে সঙ্গে শাঁসে জলে ফলপ্রসূ মহন্তী হাসি হেসে বলি সূর্যাস্তের পর আমি মৌন থাকি। ফলে পাদ্রী ভালো খাওয়ালো। ভিজিটর্স বুকে নাম লিখিয়ে চ্যারিটি বক্সে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গলিয়ে সিটাডেল তথা সাঁ-সুচীর দুর্গ প্রাসাদ দেখতে গেলাম। এন্নেরী, প্লেজাঁ, লিহে পর পর শহর। কিন্তু এ তল্লাটটা অন্য তল্লাট। পোর্তো প্রিন্স যদি বিশৃঙ্খলার রাজধানী হয়, এ সব হলো বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। কেবল খচ্চর আর গাধার ওপর চড়ে মানুষজন চলেছে যে যার মনে। পথ ঘাট বলতে কিস্যু নেই। মোটর চলে চলে ধুলোরই পথ। মাঝে মাঝে কৃষক বধূ বালতি থেকে জল ঢালছে তার ক্ষেতের গাছগুলোর গোড়ায়। হাড়ভাঙা খাটুনি যাকে বলে। জল সেঁচার কোনো ব্যবস্থা নেই।

পাহাড়, পাহাড়ী পথ—কিন্তু সবার বড় কথা, ক্রমশ ধুলো কমছে। অতঃপর প্রায় হাজার ফুট ওপরে সমতলে ভূমি। একপাশে হেইতীর নিম্নভূমি, অন্য ধারে পাহাড় আরও উপরে উঠেছে। ঐ পাহাড়ই আমাদের লক্ষ্য।

পাহাড়ের গোড়ায়ই পেয়ে গেলাম পাতা ছাওয়া কুঁড়ে; আনারস, নেবু, কলা। উপরন্তু দুধ। ক্ষিদে পেয়েছিলো, শীত শীত করছিলো। সারাদিন মেঘলা গেছে। পাহাড়ের ওপরে এসেছি। উত্তর সমুদ্রের বাতাস ঠায় ধাক্কা খাচ্ছে। খাদ্যগুলো পেয়ে বর্তে গেলাম।

হুডার্সফীল্ডের বাজারে দেসালীনের মূর্তি জমকালো চেহারায় চেয়ে আছে ক্যাথিড্রালের দিকে।

তার পাশে একটি প্রস্তর ফলক। এই ফলকে দেশের মহান্ বীরদের নাম উৎকীর্ণ: মাকান্দাল, লোকোশ্বে, ওজে, বুকমান। এখানে ফরাসী সরকার গিলোটিন এবং ব্লকের ওপর শত শত নিগ্রোকে বলি দিয়েছে। দেখতে গেলাম 'সান্তা-মারিয়া', কলম্বাসের ফ্ল্যাগ-শিপ যেখানে ডুবেছিল। এই সেই উত্তর সমুদ্রের তীর। হেইতীর ইতিহাস যেখানে সংঘাতে সংঘাতে বিচিত্র চিত্র এঁকেছে। এ তীরে এসে কেবল ইতিহাসই মনে পড়ে। মনে পড়ে ঐ দূরের ধোঁয়ার মতো যা দেখা যায় ওটাই হয়তো তর্তুগা। বয়-কাইম্যানের জঙ্গলে শূকরের রক্ত মেখে নিগ্রোবীরেরা ফরাসী ধ্বংসের শপথ গ্রহণ করে। পাহাড়ের তলায় জলা। ঐ জলায় নেপোলিয়নের সৈন্যরা বিনাযুদ্ধেই শুধু পীতজ্বরে শেষ হয়ে গেছে। দূরে ক্যাপ হেতিয়েন্। ক্যাপ হেতিয়েন্‌কে বীর ক্রিস্তফ নিজের হাতে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো যাতে ফরাসী সৈন্য একটি দানা খাদ্য না পায়। এই পাহাড়ে, এ জঙ্গলে সে তার দলবল নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলো। রোশাম্বো এই জঙ্গলে ব্লাডহাউন্ড লেলিয়ে পলাতক নিগ্রো বিদ্রোহীদের ধরতো। এখানেই কাছাকাছি নেপোলিয়ন ভগ্নী পলিনের প্রাসাদ ছিলো। সেই প্রাসাদে পতি-লেক্লেরকের মৃত্যু-শোক উদযাপিত করেছে পলিন্ ইংরেজ জেনারেল হাম্বার্টের নরম বিছানায়। সেই কুখ্যাত দিবসরজনীর প্রেমলীলার প্রচণ্ডতা পারীর জোসেফীনকে বিরক্ত করেছিলো, নেপোলিয়নকে

ক্ষেপিয়ে দিয়েছিলো।…শেষকালে কিনা একটা ইংরেজ জেনারেল? ছি! ছি!! কৌলীন্যে বেধেছিলো নেপোলিয়'র।

এর পরেই পাহাড় চড়াই।

আগে তাই শহরে গিয়ে একটা ভালো থাকার ব্যবস্থা করা উচিত; থেলেমার মত, সেদিনটা ক্যাপ হেতিয়ে'তে কাটানো। পরের দিন নবোদ্যমে সাঁ-সূচীতে যাওয়া।

আমি পথি নারী বিবর্জিতায় সুখ পাই না। বরং পথি নারী বিশেষ কাজে লাগে। ম্যানেজারি করায় খুব পোক্ত এরা। আমি যতক্ষণ বাজার দেখতে থাকি ততক্ষণ 'পেনসিয় আঁদ্রে'তে তোফা দুই ঘর বাগিয়ে খাবারের অর্ডার দিয়ে গাড়ি গ্যারেজস্থ করার ব্যবস্থা করে থেলেমা আমাকে একবারে তর্ করে দিলো। আরও তর্-তরো হলুম যখন বাথ-এর মধ্যে আধা গরম জলে সটান পড়ে থাকতে পেলুম। তারপর স্রেফ তরো-তাজা!

গা দিয়ে যা মাটি বেরুলো সংগ্রহ করে রাখতে পারলে দ্বিতীয় গোবর্ধন পাহাড় হতে পারতো। নিদেন একখানা বাড়ি।

সে সন্ধ্যায় খেয়েছিলুম গো-গ্রাসে। স্পষ্ট বলেছিলুম থেলেমাকে সিনেমায় একা যাও সুন্দরী। আমি এখন নিদ্রে দোবো। আজ আমি বিলকুল 'রাজা'।

থেলেমা গিয়েছিলো কোনো টোনেলে। ফিবে চুপি চুপি আমার ঘরে এসে আমার জামা-পাজামা নিয়ে গেছে। হোটেলের বিশেষ ব্যবস্থা করে ধুইয়ে হট প্রেস করিয়ে রেখে দিয়ে তবে শুতে গেছে!

সকালে স্নানান্তে প্যান্ট কোট পরতে গিয়ে 'কেয়াবাৎ!' এ আবার কী থেলেমা।

একগাল হেসে থেলেমা বলেছিলো ভুড়ু গো, ভুড়ু!

থেলেমার কোঁকড়ানো চুলগুলো ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চুলের তলা দিয়ে নীল একটা রিবন বাঁধা। গাঢ় নীল ব্লাউসটার ওপর তিন কোণা করে একটা ব্রীডিং ম্যাদ্রাস্-এর বেড়।

থেলেমা সলজ্জ খুশীতে দুলে উঠে বলে, দেখতে হবে সাঁ-সুচীর দুর্গ। মনে আছে। চোখ দুটোকে একটু ছুটি দিয়ে দিন মশাই।

সত্যিই আমার চোখ শিশুর দৃষ্টির স্পষ্টতায় আটক পড়ে গেছিলো।

বললাম, সে দুর্গ জরাজীর্ণ। পাহারা নৈলেও চলে। এ দুর্গে পাহারাদার না বসালে লুঠ হয়ে যাবে।

পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেলো। লুঠ যখন হয়নি তখন বোঝাই যায় লুঠের মজে কিছু নেই। চলো, চলো কাব্য ছাড়ো। পৃথিবীতে নামো।

গাড়ি থামিয়ে ওপরে ওঠার পথ। প্রথমটায় অবিনশ্বর স্যাঁৎসেতে জঙ্গল। অন্ধকার। খানিক চড়াইয়ের পর হঠাৎ জঙ্গল থেমে গেছে। সামনে খাড়া পাহাড় রোদে ঝলমল। তার প্রান্তে বহু ওপরে বিশাল দুর্গ। জয়পুরের পথের ওপর থেকে দেখা আম্বের দুর্গ, গোয়ালেয়র দুর্গ, এমন কি চিতোর দুর্গও এর কাছাকাছি যায় না।

যাদের নাম করলাম তারা সবই তো মধ্যযুগীয় ব্যাপার। কিন্তু ব্যাসটাইল যখন ভেঙেছে, ট্রাফালগার যুদ্ধ যখন শেষ, সুয়েজ হয়-হয়, ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ আসন্ন—তখন, তখনকার সৃষ্টি এই পিরামিডীয় পাথরের চাংড়ায় গড়া, এত বড় ভয়ঙ্কর দানবিক দুর্গ—এ কী করে সম্ভব? তুঙ্গভদ্রা তীরে বিজয় নগর, হাম্পীর দুর্গ কেবল গোল পাথরের চাংড়া; পুরীর মন্দিরের সবচেয়ে বড় পাথরখানা এখানকার সবচেয়ে ছোট পাথর। অথচ মানুষ বয়ে তুলেছে। কিন্তু দেখে যেন আতঙ্ক জাগে।

ভেতরে ঠাণ্ডা। পাথরের দ্যাল দশ ফুট গভীর। প্রাচীরের গায়ে গায়ে গেঁথে তোলা সিঁড়ির পর সিঁড়ি। এখান থেকে ঘোরা তাস্ত। সিঁড়ি যাচ্ছে—যাচ্ছে। প্রাচীরের মাথায় মাথায় অজস্র কামান অযত্নে পড়ে আছে। ফাটলে ফাটলে শেকড়। তারপর সাপের মতো দেয়ালের পেঁচ ঘেঁষে ঘেঁষে কুঠরী, ঘর, তোষাখানা, ঘোড়শাল; —যেন ফতেপুর সিক্রীর জীবন্মৃত দেহভার। তারপরে সুবিস্তীর্ণ চত্বর। গড়ের মাঠ বলবো না; তবে গড়ের মাঠে কুঞ্জকাওয়াজের জায়গাটার চেয়ে, এডিনবরা দুর্গের সামনের চত্বরের চেয়ে, দিল্লীর জুমা মসজিদের বা ফতেপুর সিক্রীর চিস্তি-কবরের চত্বরের চেয়ে অনেক বড় একটা পাথর বেছানো কুচের জায়গা। যেন কেউ আকাশে চড়ার মধ্য পথে ফরাস বিছিয়েছে। মাঝে মাঝে মেঘের ঢেউ পাশ কাটিয়ে যায়। উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রের দিকটা খোলা। নীচে তাকালে গা শিরশির করে। এই খোলা ছাদ পেরিয়েই কুচ-ব্যস্ত শৃঙ্খলা নিয়মিত সৈন্যদল মহাকালের খর্পরে পা রেখেছিলো; মহাশূন্য থেকে মহা-গহ্বরে চিরকালের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলো। প্রমাণ করেছিলো আঁরী ক্রিস্তফের সৈন্য-বাহিনীর তদ্‌গত নিয়মানুবর্তিতা!

একশো পঁয়ষট্টিখানা দরজা দেওয়া প্রাসাদখানায় ক্রিস্তফ নিজে থাকতেন। এ ছাড়া প্রাসাদে প্রাসাদে ছয়লাপ। আড়াই হাজার ফুটের খাড়া খাড়াইয়ের ওপর এই দুর্গ-রচনা করে ক্রিস্তফ নিজেকে দুর্গম করতে চেয়েছিলো!

এই রাবণ-মহিষাসুরটি কিন্তু রাবণ-মহিষাসুরের মতোই দৈব-অত্যাচার থেকে অনার্য সভ্যতাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলো। নিগ্রোদের ওপর জুলুম হয়তো অনেক করেছে ক্রিস্তফ, কিন্তু দাসত্বের দুরপনীয় গ্লানি থেকে উত্তরপুরুষকে পরম-মুক্তি দেবার প্রয়াস ক্রিস্তফের শাসক-জীবনকে অমর করে রেখেছে। যে ক্যাপহেইতিএ'-তে বালক ক্রিস্তফ পান্থশালায় বাসন মাজতো, সেই ক্যাপ হেইতিএ'-কে ক্রিস্তফ নিশ্চিহ্ন করে জ্বালিয়ে দিয়ে নেপোলিয়নিক বাহিনীকে জব্দ করে দিয়েছিলো।

ভুডু ভালোবাসতো না ক্রিস্তফ; দাসদের ধর্ম! ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার করতো নিজেই নিগ্রো বিশপ সৃষ্টি করে। অশিক্ষা ক্রিস্তফের দু-চোখের বালাই ছিলো। ক্যাপ-হেইতিএ অ্যাকাডেমীতে বাইরে থেকে সেরা সেরা শিক্ষাবিদ জড়ো করেছিলেন; প্রিন্টিং প্রেস আনিয়ে বই ছাপাতেন; গ্রামে গ্রামে স্কুল খুলেছিলেন; আমেরিকান গবর্নেস আনিয়ে নিজের বহু সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন! নিজেও ক্রিস্তফ সুশিক্ষিত হতে পেরেছিলেন। ছবি আঁকা, গান-বাজনা, সুন্দর স্থাপত্য—এসবও ক্রিস্তফের সুশিক্ষার অন্তর্গত ছিলো।

দলে দলে কামান। কামানের গায়ে বড় বড় 'H'—Henry Christophe মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু আকাশ থেকে বীজ উড়ে পড়ে। ফাটলের গায়ে তার প্রাণ সঞ্চার হয়। ফুল ফুটে আছে কামানের আশেপাশে। থিসল্, ড্যান্ডিলয়েন, করবী, জবা, নীল নীল পর্পটির ফুল; রোঁয়া-তোলা বেগনী ক্ষুদে কদম্ব ফুটে আছে রাশি রাশি লজ্জাবতীর সারা অঙ্গে। ডিউক অব মণ্টেগুর কাছ থেকে জিতে নেওয়া কামান ফরাসীদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে ক্রিস্তফ। তার দু-চারটে পড়ে আছে; ব্রিটিশ চিহ্ন বহন করছে; বহন করছে মণ্টেগুদের ঈগল মুদ্রা।

ভারতবর্ষে যখন দুপ্লে ঠেঙাচ্ছে ইংরেজদের তখন ক্যারাবিয়ানেও ফরাসীরা ঠেঙাচ্ছে ঐ ইংরেজদেরই।

উত্তরে তর্তুগা'র স্থির নীল নুব্জরেখা কম্পিত দিগন্তের সরলতাকে বলয়িত করে পুরাকালের বুকানীয়দের ভয়ঙ্কর আড্ডার ইশারা দিচ্ছে।...আর দেখা যাচ্ছে এই দুর্গের বহু নীচে সাঁ-সুচীর প্রাসাদ! 'সিতাদেল' এবং সাঁ-সুচী, এর যে কোনো একটা কোনো রাবণ বীরের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি-চিহ্ন হতে পারতো। আমরা ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি নামছি। ঘোড়ায় চড়ে যাবো।

ঘোড়ায় চড়ার আগে একমুঠো জবা ফুল এনে থেলেমা ঘষতে লাগলো আমার কালো জুতোয়। সত্যিই বড্ড নোংরা জুতো; কিন্তু তবু ধুলো মোছার জন্য ফুল। যেন পাপবোধ হয়। তামসী জবা পুষ্প—তামসী-মাতৃকার পুজোর অঙ্গ। না না! বাধা দেওয়া সত্ত্বেও থেলেমা নিজেই ঘষতে লাগলো, "মজা দেখো না!"

কী মজা!

সত্যিই তাই। একটু পরেই চকচকে পালিশ জুতো! এ আবার কি?

"তাই ফরাসীরা এ ফুলের নাম দিয়েছিলো শু-ব্ল্যাক (choublac)!"

সাঁ-সুচীর মতো অতবড় দুর্গ-প্রাসাদ দেখিনি। গোটা তিনেক ফতেপুর সিক্রীর ভেতরে অম্বরের প্রাসাদের কারিগরী।

থাম, গম্বুজ আর মুরদের অনবদ্য জালিদার কাজ। সাঁ-কুদের গ্রাণ্ড-স্টেয়ার কেস সত্যিই রোমাণ্টিক বিচক্ষণতার সঙ্গে ঘুরিয়ে, বাঁকিয়ে, উঠিয়ে, নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শোনা যায় ফরাসী দেশ থেকে কারিগর আনিয়ে নক্সা করিয়েছিলো ক্রিস্তফ। নিজেই সে নক্সার তত্ত্বাবধান করেছিলো। যদি কেউ কখনও বলে এর চেয়েও উচ্চস্তরের প্রাসাদ তামাম পৃথিবীতে কোথাও আছে তা হলে নক্সানবীশের গর্দান যাবে বলে, গর্দানসহ লোকটিকে চিরকালের জন্য সাঁ-সুচীতেই সম্মানিত বন্দী হিসেবে স্থান দেওয়া হয়েছিলো। যাতে আর কোনো প্রাসাদ রচনায় সে হাত দিতে না পারে। সে অবসরই সে আর পায়নি।

বিরাট সাঁ-সুচী প্রাসাদের অলিন্দে নাটকীয় দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল রাজসভা বসতো। ইংরেজ নৌ-সেনাপতি, বিশিষ্ট নাগরিকদের পরম সমাদরণীয় অতিথি হিসেবে অভ্যর্থনা জানিয়ে ক্রিস্তফ তার বিজাতীয় ফরাসী বিদ্বেষ বুদ্ধিকে প্রসন্ন করে রাখতো। তার রাজসভায় রাজন্য, সম্ভ্রান্ত মনসবদাররা থাকতেন; রানী থাকতেন; রাজপুত্র এবং

রাজকন্যারা থাকতেন। সে রাজসভার বর্ণন গাইড নানা বর্ণে চিত্রে সমুজ্জ্বল করে বর্ণন করে। হেইতীতেও চারণ কবি আছে।

কিন্তু রাবণের লঙ্কাও অবসিত হয়েছিলো। তুস্যাঁর অন্তিম দিনগুলো ছিলো বিষাদে অশ্রুময়; ক্রিস্তফের শেষ দিন তেমনি বিয়োগান্তিক, মর্মস্পর্শী। ম্যাকবেথের শেষ অঙ্ক।

রাজধানীতে বিদ্রোহ। ক্রিস্তফ শয্যাগত। কঠিন হৃদরোগ। বার বার কথা ওঠে ক্রিস্তফ মারা গেছে। বার বার শয্যা ছেড়ে ঘোড়ায় চড়ে ক্রিস্তফ কুচ পরিচালনা করে প্রমাণ করে সে জীবিত। রাজ্যলোলুপ সর্দারেরা ক্রিস্তফের বেঁচে থাকা বরদাস্ত করতে পারে না। মরণকে অস্বীকৃতি দিয়ে সর্দারদের ফাঁকি দেবার ফন্দী যার, তাকে আর বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই। সর্দাররা হানা দিলো সাঁ-সুচীতে। সৈন্যদল সর্দারদের সঙ্গে যোগ দিলো।...যোগ দিলো না ক্রিস্তফের নিজস্ব বাহিনী প্যালেস গার্ডস। তাদের চোখে ক্রিস্তফ দেবতা, মা-বাপ।

শয্যা ছেড়ে উঠলেন ক্রিস্তফ। তাড়াতাড়ি রাজপোশাক পরিয়ে দিতে বললেন রাণীকে। রাজপোশাক পরে ঘোড়ায় চড়তে যাবেন আবার স্ট্রোক। প্যারালিসিস। বাম অঙ্গ আড়ষ্ট।

কাতর ক্রিস্তফ, জগদ্দল-মহিষাসুর ক্রিস্তফ কাতর চোখে তাকালেন ইংরেজ ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার নিরুপায়। শেষ অবধি ভুডু হাউঙ্গান। "আমাকে একবার ঘোড়ায় চড়ার শক্তি দাও। ঐ অলিন্দে সৈন্যদের সুমুখে দাঁড়াতে দাও। শুধু আমাকে দেখলেই ওরা পালিয়ে যাবে।"

হাউঙ্গান কী সব তেল মালিশ করে। শেষ পর্যন্ত যা হোক দাঁড় করিয়ে দিলো তখনকার মতো।

শাদা ধবধবে সাটিনের পোশাকের ওপর সোনার জরীতে কাজ করা ক্লোক পরে চিরকালের ক্রিস্তফ গিয়ে দাঁড়ালেন রাজসভায়। রাজসভা স্তব্ধ। ক্রিস্তফ, মহারাজাধিরাজ সম্রাট ক্রিস্তফ মরেননি। সবাই বিস্মিত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে।..ক্রিস্তফ ন্যাংচাচ্ছে। বাঁ হাতটা অসাড় ঝুলে আছে। গালটা যেন ঝুলে পড়েছে।...এ কোন্ ক্রিস্তফ?

হাঁ-রে-রে-রে-রে-রে!! বিদ্রোহীদের ধ্বনি!! ক্রিস্তফ নিপাত যাও!!

এগিয়ে গেলো ক্রিস্তফ তার প্রিয় শাদা ঘোড়ার দিকে। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের কাছেই দুমড়ে পড়ে গেলো। লোকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেলো।...শয্যায়? নাঃ! "আমাকে সিংহাসনে বসাও!"

হা-রে-রে-রে-রে-রে!! বিদ্রোহীদের ঠেকাচ্ছে প্যালেস গার্ডস। পায়ের ধারে রানী দাঁড়িয়ে। ক্রিস্তফের সোনার পিস্তলে ভরা রুপোর গুলি। নিজের মুখে সেই পিস্তলের নাল ভরে গুলি চালালেন। রানী স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। বিদ্রোহীরা ঢুকলো। রানীকে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সহসা পিছিয়েও গেলো। অবিনশ্বর মহিমার সুমুখে পশুশক্তি একবার থমকে দাঁড়াবেই।

সঙ্গে সঙ্গে রানীর আদেশে কবর দেওয়া হলো ক্রিস্তফকে প্রাসাদের মধ্যেই।

মুলাতো বয়ার প্রেসিডেন্ট হলো। পরের দিন রানী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রাসাদ

ত্যাগ করে যাচ্ছেন। সৈন্যাধ্যক্ষ এসে শান্তভাবে তলোয়ার বার করে একমাত্র রাজপুত্রের গলা কেটে ফেললো। রানী বাকী মেয়ে কয়টিকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি পপ্‌হ্যামের শরণাপন্ন হলেন।

সেই দরিদ্র পরিবারটি য়োরোপের নগরে নগরে পরিক্রমা সেরে অবশেষে ইতালীতে হারিয়ে যায়। প্যারিসে ক্রিস্তফের শেষ বংশধর প্রিন্স ফার্দিনান্দ ফ্রাঙ্কো-জর্মন যুদ্ধের অল্প আগে কঠিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে হেরে যায়। একটা রেস্তরাঁর বাইরে তার মৃতদেহ যখন পাওয়া গেলো তখন লোকে বললো লোকটা আবর্জনার মধ্যে খাদ্য খুঁজছিলো হয়তো !! হঠাৎ রাজার বংশধর !!—অথচ প্যারিসে তখন তৃতীয় নেপোলিয়ঁ রাজত্ব করছে। হঠাৎ রাজার সংজ্ঞা কি ?

অলিন্দ পার হই। সিঁড়ি পার হই। গাইড নিয়ে চলেছে। ঝিরি ঝিরি ঝর্ণা বইছে প্রাসাদের সর্বত্র। সর্বত্র কুল-কুল শব্দ। "ক্রিস্তফের কান্না"— !

আমি বলি—"কখ্‌খনো না ! ক্রিস্তফের আত্মা জ্বলবে ; কাঁদবে না !"

এমনি মরেছিলো, ঐ হেইতীতেই, সম্রাট প্রথম জেম্‌স, জিয়াঁ-জ্যাঁ-দেসালীন ! তিনিও যখন তাঁর রক্ষী সেনা পরিবৃত হয়ে সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়ালেন, তখন কে চেঁচালো, "রোকো !"

সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীদের বেয়নেট দেসালীনের বুকের দিকে লক্ষ্য !

বিশ্বাসঘাতকতা !

তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে সামনের দু-চারজনকে ঘা-কতক দিতেই অভ্যস্ত ভয়ে সকলে যেন পিছিয়ে গেলো। পরক্ষণেই এক লাফে তিনি তাঁর ঘোড়ার দিকে এগুলেন। কে গুলি মারলো। ঘোড়াটা পড়ে গেলো। দেসালীনও ঘোড়ার সঙ্গে আছড়ে পড়লেন।

শার্লতীন্ তার প্রিয় সঙ্গী। অঙ্গরক্ষী। নিজের দেহ দিয়ে তাঁকে ঢাকলো। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হলো বুলেটের।

"এঁরা এঁদের সময়ে নৃশংস ছিলেন ? ছিলেন কি ? এঁরা রাজ্যলোলুপতায় বিড়ম্বিত কি ?—এদের লক্ষ্য ছিলো আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নিগ্রোদের কপাল থেকে দাসত্বের কলঙ্ক মুছে দেওয়া। নিগ্রোকে দু পায়ে শক্ত করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। বীর্যবলে নিগ্রোকে স্বাধীন করা। শাদাদের অস্ত্রেই শাদাদের ঘায়েল করা। ...নৈলে সমসাময়িক য়োরোপে তো তখন মুকুট আর মুণ্ড মুহুর্মুহু গড়াগড়ি খাচ্ছে। তারা ছিলো ক্ষমতাগৃধ্নু,—রাজ্যলোলুপ...এবং তারাই তো ইতিহাস লিখেছে... কাজেই..."

বলছিলো থেলেমা।

দুশো মাইল পথ ফেরা। আমরা সন্ধ্যার আগে আগেই 'গনাইভে' পৌঁছুতে পারতাম। কিন্তু গনাইভে থেকে মাইল চার-পাঁচ এগিয়ে গেলে একটা 'টানেল'। সেখানে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে থেলেমা একটি সুপ্রসিদ্ধা হাউঙ্গীর সঙ্গে। মাদাম

ফোরে। সুন্দরী ছিলেন এককালে। নিপুণ হাতে দোরের গোড়ায় আল্পনা দিচ্ছেন। দেখলেই মনে হয় গুণী। চোখ দুটি ভাব-তন্ময়।

মাদাম ফোরে আমার নাম ইতোমধ্যে শুনেছেন। থেলেমাও সহজ হয়ে গেলো। আমাদের উনি তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়ে দিয়ে বললেন, সারারাত ড্রাইভ করতে হলেও কোরো। তাড়াতাড়ি পোর্ট অব-প্রিন্স পৌঁছে যেও। সকাল সকাল, কেমন?

কেন?

হাসেন তাঁর নিমীলিত নয়নে মাদাম ফোরে।

সেই সাবধান বাণী শোনার পর ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিলো না। পোর্ট অব্ প্রিন্স্-এ বারবেলায় পেঁছে আমি ক্লান্ত। কিন্তু থেলেমা জোর করে নিয়ে গেলো আর্ট গ্যালারীতে। রেস্তরাঁটি ভালো। ভালো খেতে দেয়।

মেক্সিকান আর্টের মতো হেতিয়ান আর্টের নামও ভুবন জোড়া। প্রাইমারী কলারের এমন সরল উপযোগ আসামান্য। টেকনিকে ভ্যান গক্-কে মনে করিয়ে দিলেও এ আর্ট স্বতন্ত্র। রেখা বিন্যাস দৃঢ়, অটুট, গভীর। ব্যঞ্জনায় গদ্যে লেখা ইতিহাসের দৃঢ়তা। পারির য়ুনেস্কো প্রদর্শনীতে হেতিয়ান আর্ট যেন বিপ্লব এনে দিয়েছিলো আর্ট মহালে। তখন সব ভীমাজুর্ন নাম ফুটে উঠলো আর্ট এপিকে : ফিলোসে গোগীন্, এ্যান্‌গুরো গগে, বিগো, বেনোয়া, তুর্ণিয়ে, দানিয়ে, লেওন্তাস—এক আকাশ নক্ষত্র।

কী ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, সরকারী ইমারত, স্কুল কলেজের দ্যাল ফ্রেস্কো, টালি, মোজাইক, সুররিয়ালিষ্টিক ভাবনায় কড়ি, শামুখ, রঙ্গীন নুড়ি সাজানো কাজ। হেতী রংয়ে রংয়ে মাতাল।

হেক্টর হিপোলিতে। শান্ত মানুষ। নন্দলালের মতো পিঁড়ে হয়ে বসে মাটির ওপর পাট্টা বা কাগজ পেতে আঁকেন। মিশেল আছে কিছু বা আফ্রিকা, কিছু মেক্সিকো। কথিকা, ভুডু, ইর্জুলী এবং ঘন ঘন মৎস্যকন্যা। যুক্তরাষ্ট্রে মডার্ন আর্ট ম্যুজিয়ম মাত্রেই হেতীয়ান আর্টের সশ্রদ্ধ স্মরণ আছে।

থেলেমা নিজের বাড়ি এনে তুলেছে। কিছু লোভ, কিছু সুবিধে, কিছু ওকে তৃপ্ত দেবার সদিচ্ছা। চলেও যেতে পারি না। তুমুল বিক্রমে ঝড় জল আছাড়ি পিছাড়ি হয়ে নেমেছে। তান্তিয়ার আস্তানা কাঠ, পাতা, খড়। কোথায় উড়ে গেছে। সে পথে এখন যাবেই বা কে? থেলেমাই এখন ভরসা।...ভয়ও।

বাড়িতে ছোট ভাই আর বুড়ী মাসী। আমাকে ভায়ের সঙ্গে শুতে দিলো। কোনোমতেই আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। অথচ অরাজী হলে ভাইটকে হয়তো কণ্ট পেতে হবে। আমি যে পড়ার ভান করবো তাও সম্ভব নয়। ঝড়ের ফলে আলো নেই। একটু গা এলালাম।

যখন বুঝলাম সকলে শয্যাগত, তখনই বাইরে এলাম। নীচে শহর থেকে একটা শব্দ আসছে। কেউ ঘুমুতে পারছে না। শহর জলে-ঝড়ে থৈ-থৈ। ক্যাস্ল হেইতী হোটেলের লাল-শাদা নিওনের লাল এবং শাদা দুটোই অন্ধকার। নৈলে দূরের ঐ পাম-

গাছগুলো এখন রাঙা হয়ে দপ্‌দপ্‌ করতো। কোথাও বাজছে মাদল। কোনো টোনেলে চলছে ভুডু ক্রিয়া। ঝড়ে জলেও ও বন্ধ থাকে না।

আরও খানিক নেমে যাই। ঠাণ্ডা বাতাস। আকাশ তখন জ্যোৎস্নায় ভরা। কোথায় ঝড়? শুধু পাহাড়ী পথটার ওপর রাশি রাশি পাতা, ভাঙা ডাল।...পরিশ্রান্ত আমি, তবু এই ভালো। এক বিছানায়, কে থেলেমা, তার ভায়ের সঙ্গে শুয়ে থাকা!

সুমুখে অথৈ পারাবারের বুক রুপোর তরঙ্গে অধীর। ঢেউয়ের আক্রোশ কমেনি। পশ্চিম আকাশে চাঁদের বড় অংশটা তখনও মেঘে ঢাকা পড়ছে, বার হচ্ছে।

আরও নামি। একটা ছান্দসিক বাদন। পা ফেলার শব্দ। ভিলা-ক্রিওলের নাইট ক্লাবে ষোড়শ-নিগ্রো-মিথুন বাম্বোশের রাসনৃত্যে ব্যস্ত। বাম্বোশে ভুডু নৃত্যের মতো ধার্মিক নয়; আনন্দময় নৃত্য। অত্যন্ত যৌন-আবেদন।

মার্তিনীক মনে পড়ে যায়!

মার্তিনীকে আজও লোকে যায়। এন্‌তার মেয়ে পেতে বে-এখ্‌তার মৌজ লুটতে। ওরা তাই ওই অসভ্য নাচগুলো নাচে।...অন্য বন্দরে লাল আলো জ্বালে বিপদ সংকেত জানাতে। মার্তিনীকের সম্পদই লাল আলো। ক্যারিবিয়ানে লাল আলোর পাড়া ছিলো তিনটে। মার্তিনীক, সেণ্ট টমাস এবং কুবা। ফীডেল ক্যাস্ট্রো কুবার লাল আলো নিবিয়ে দিয়েছে রক্তের বার্লতি ঢেলে। সে লাল পাড়া উঠে গেছে সেণ্ট টমাসে। আজ যাও। সেণ্ট টমাস আগা-পাশ-তলা আমেরিকান ধনীকতায় টগবগ করছে। সেখানেও তামাম ক্যারিবিয়ানে যত রকম শাদা অসভ্য নাচ আছে তার থরে থরে নমুনা পাবে।

তার পরেই বলা নেই কওয়া নেই ঘণ্টায় ৮০-৯০ মাইল বেগে নামলো প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। থ' হয়ে গেছি ঠিকই; তবু যেন কোথায় তৃপ্তি। বিপুল ঝড়ে অথৈ বৃষ্টিতে আমার ভেতরের মহারুদ্র আনন্দে নেচে ওঠে। মুহূর্তে পৃথিবী জলময়। সমুদ্রের ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে রাজপথের ওপর। বাতি নিবে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমি পথে নামলাম।

রু দ্য মিরাকল্‌ রু বন্‌ ফয়ের অন্ধকার পথে ছায়ার মতো মানুষ ঘুরছে। আলো আর টর্চে ভরে গেছে অন্ধকার। পথে জল দাঁড়িয়ে। রু-দ্য-রিভল্যুসিঁয় দিয়ে খরবেগে নদী বইছে। যে যা পারে বাঁচাচ্ছে। আশ্চর্য, লুঠ হচ্ছে না। চেঁচামেচি নেই। সমুদ্রের ধারে রু-দ্য-কি! সাইলা! বিখ্যাত দোকান। দোকানের সামনে ফরাসী পোর্চ। পোর্চের তলায় একটা নৌকা বাঁধা। আমি নৌকোটায় চেপে বসি।

জলের ঢেউয়ে মানুষলোকের সামান্য আলো; দূরে দেবলোকে অজস্র আলো। ...হু হু বাতাস বয়ে যাচ্ছে বনলোকের মধ্য দিয়ে। দূর থেকে মাদলের শব্দ। মাঝে মাঝে ওপরে পাহাড়ী পথে মোটরের চাকার শব্দ; মোটরের আলো তলোয়ারের ফলার মতো হঠাৎ কেটে দিচ্ছে অন্ধকারের নিরেট মাংস।

নাইট ক্লাব অব্যাহত জাগ্রত!

কিন্তু পারি না। হেরে যাই। ঝড় নয়, জল নয়, অজানার এক বিহ্বল ভয়।

ডাঙ্গস্‌ মারে বুকে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আসি পরিচিত নৌকায়। ঝড় তার অধিকার সাব্যস্ত করে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে শহরটাকে।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নৌকোয় শুয়েছি। জল সরে গেছে। নৌকো ডাঙায়।…চোখ চাইতেই শাদা রং। রাত শেষ হয়। ন্যাশন্যাল প্যালেসের সুমুখে হেইতীর গণজাগরণের দেবতাদের পাষাণ মূর্তি। ফাদার বেশকোমের গির্জার দিকে পা বাড়াই। ওখানে পাবো মার্তিনকে!

মার্তিন নেই। সেই আর্চটার তলায় পা ছড়িয়ে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ি। বড় ক্লান্তি। উত্তম ক্লান্তি।

ভোরের ঘণ্টা বাজছে। কানে শব্দ গেছে। উঠিনি। সকালের আরাধনায় লোকজন এসেছে; চলে গেছে; উঠিনি।

হঠাৎ মার্তিন এসে ঠেলে তুললো।

আজ তার পরনে ছেঁড়া পাজামার আধখানা নেই। গা খালি। লম্বা দাড়ি চুল ঝাঁকড়ে পড়েছে। সারা গা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে।

অদ্ভুত হাসছে। হাতে এক বাটি পরিজ। দুটো চামচ গোঁজা। একটা ডিশ-হীন কাপ, একটা আকারবিহীন এনামেলের গ্লাস।

ওঠো! খাও!!

তুমি কোত্থেকে। চান করলে নাকি তুমি?

গোটা শহরই স্নান সেরে উঠছে সবে। রাত ভোর পথের কুকুর শোরগুলোকে ডাঙায় তুলেছি। তুমি তো নৌকোয় ঘুমুচ্ছিলে। তার পর কোথায় গেলে?

মার্তিন!! ওর অনেক কাজ!! সারা শহরে একটা তাণ্ডব হয়ে গেছে কাল রাতে। ধুলো নেই। কাদাও নেই। ঝকঝকে রোদে নীরবে লোকেরা আবার গোছগাছ করে বসছে।

যেন এটাই নিয়ম।

মুাজিয়ম দেখে লোকে। ঘাঁটে ইতিহাস। কলম্বাসের 'সাণ্টা মারিয়া' হেইতীর রীফে বেধে ফেঁসে গিয়েছিলো। তার নোঙরটা রাখা আছে মুাজিয়মে। তাও দেখে।…দেখায় দেসালীনের মাউসোলিয়ম; পেতীয়ঁর মাউসোলিয়ম; দেখে বেসকোম্‌-এর গির্জার রোমানেস্ক স্থাপত্য শিল্প। আয়রন মার্কেটের নিত্য নৈমিত্তিক হৈ চৈ আজ স্তব্ধ। আমি দেখি জনগণের মনে মার্তিনের প্রভাব। সেই শিরা-বহুল শীর্ণ হাত, সেই রোমবহুল বক্ষস্থল, সেই মাংসহীন পিঠ, সেই রক্তহীন ঝকঝকে চামড়া, যেন আগুনের জ্যোতিরূপ। জীবন্ত তেজের মতো পরোপকারায় আত্মবিভূতি দেখাচ্ছে।…আমিও লজ্জার মাথা খেয়ে কাজে লেগে গেছি।

…একটা সুবিধে। ঝড়ের আগের সম্পত্তি এবং ঝড়ের পরের বিপত্তি দুটোতেই একরূপতা। কেউ খোঁজ করছে না মার্তিনের নগ্নত্ব, আমার ভাঙা নৌকোয় রাত্রিবাস। মার্তিনের ভাষায়—সবারই এক দশা গেছে কাল রাতে। কে কার খোঁজ করে?

বেলা দুটো যখন তখন আয়রন মার্কেট থেকে বার হলো মার্তিন। বড় পাড়ায় চলি।

ট্রুম্যান বুলেভার্দের ওপর ওয়াটার ফ্রণ্টে ন্যাশন্যাল একজিবিশন গ্রাউণ্ডের ওপর বিরাট বাজারের কোনো চিহ্ন নেই। হেইতিয়ান মিলিটারিরা ব্যস্ত বড় বড় ঝড়ে-পড়া গাছ কেটে তা থেকেজীবন্ত বিজলী তারগুলোকে ছাড়ানোয়। চারধারে বিজ্ঞপ্তি : প্রবেশ নিষেধ।

মার্তিন বলে, তা হোক। যেতে হবে। চলো।

ও গিয়ে সোজা খানাঘরে ঢুকে দুটো প্লেট বার করে নিজেই নিয়ে নেয় ত্যাসো-ভি-দিন্দে আর রুটি। দোকানী একটু চেয়ে দেখে মার্তিনকে। চোখে চোখে প্রণাম নিবেদন করে। আমরা বসতেই দু কাপ কফি আর কফির পট পাঠিয়ে দেয়।

মার্তিন যেন জনগণের দেবতা। যে খেতে দেয় যেন ধন্য হয়ে যায়।

বেরুতেই থেলেমা, এবং মার্কাস!

এই যে !!...কাল রাতে শোওনি।

শুয়েছি...

পালালে কখন ?

পারলাম কৈ ?

মার্তিনকে পেলে কোথায় ?

পেয়েছি ? পেয়েছি কি ?

এবার ওরা সবাই হেসে ফেলে।

মার্কাস বললো, আজ সন্ধ্যেয় জাহাজ। তুমি ভুলে গেছো বুঝি? তান্তিয়া তোমাকে একটা জিনিস পাঠিয়েছে। লাইব্রেরিতে রেখে এসেছি।...

কিন্তু...

না, তান্তিয়া বলেছে জাহাজে দেখা হবে। তোমাকে আর কষ্ট করে এখন পাহাড়ে চড়তে হবে না।

আমার গাড়িও জবাব দিয়েছে, বলে থেলেমা। শুডু বিশ্বাস করো না করো মাদাম ফোরেকে বিশ্বাস করে ভালো করেছিলে।

লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি আমার ব্যাগ !!

এ কোথায় পেলে মার্কাস্ !!

আমার অজ্ঞাত। তান্তিয়া কেবল হাতে দিয়ে বললো, বাজারে বাতাশারিয়া আর মার্তিন আছে। তার হাতে দিবি ; বলবি আজ জাহাজ!

আমি ভেবেছিলুম জিজ্ঞাসা করবো তান্তিয়াকে মনের একটি কথা...একটি...।

তান্তিয়া আসবে বলেছিলো।

এলো না!

জাহাজ যখন চলতে আরম্ভ করলো তখন দেখি—থেলেমা আর মার্কাসের মাঝখানে তান্তিয়া। হাত নাড়ছে। ব্লীডীং মাদ্রাস খুলে নাচাচ্ছে।

মার্তিন, ব্যস্তবাগীশ মার্তিন, দাঁড়িয়ে নেই। তার ঋজু হ্রস্ব দেহ পথের সীমায় ক্রমশ মিশে যাচ্ছে।

সেণ্ট দোমিনিকান রিপাব্লিক

কিছুদিন আগেও নাম ছিলো ত্রুহিলো !!

নৈলে সেণ্ট দমিনিকা !! সান্দোমিঙ্গো !

সেই হেইতীরই পূর্বাংশ ! হিস্পানিওয়ালা নামে কেটে সান্তো দোমিঙ্গো নাম ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে রিপাব্লিক ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাখা হয়। নৈলে সান্দোমিঙ্গো হিস্পানিওলার প্রধান নগরী ছিলো। সে নগরী আজও আছে। মাঝে নাম হয়েছিলো থুইদাদং ত্রুহিলো। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে জেনেরালিসিমো রাফায়েল লিওনিদাস ত্রুহিলো মোলিনা আমেরিকানদের হাত থেকে হিস্পানিওলার অর্থাৎ সান্দোমিঙ্গোর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। এ জাতীয় "লীডার মেড্ টু অর্ডার" যুক্তরাষ্ট্রের টেলারিং ডিপার্টমেণ্টে আকচার হয়ে এসেছে। আমেরিকান ডলার দলে-মোথে স্বাধীন মল্যাতো-দেশ সান্দোমিঙ্গোকে আমেরিকার পদলেহী এক ঝকঝকা তকতকা স্বর্গ করে ফেললো।...যেমন সেণ্ট টমাস, পোর্তোরিকো, পানামা। হন্দুরাশে, পানামায়, নিকারাগুয়ায়, চিলিতে, ক্যুবায় বিপ্লব হয়েছে; কিছু সার্থক, কিছু অসার্থক। কিন্তু লিওনার্দো ত্রুহিলো মোলিনা এই স্বর্গরাজ্যে বিপ্লব তো হতে দেনই-নি, বরং বড়ো বড়ো ইমারতে ইমারতে ঢেকে ফেলেছিলেন দেশের আসল জীর্ণ ক্ষীণ রূপ। ছোট্ট জায়গায় অতগুলো বড়ো হোটেল ত্রুহিলোর মতো কোথাও দেখিনি। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকা এখানে "ইণ্টারন্যাশন্যাল পীস এণ্ড প্রগ্রেস ফেয়ার" করায়। সেই ১২৫ একর জমির ওপরে গড়ে-ওঠা ম্যাজিক শহর নয়া সান্দোমিঙ্গোর (নয়াদিল্লীর মতো) ত্রুহিলো নগরী। শান-শৌকতে তাক লাগানেওয়ালা আমেরিকার শপ্-উইণ্ডো। এভেনিদা ইণ্ডিপেণ্ডেন্সিয়ার দু ধারে জ্যাকারাণ্ডা এবং পামের সারি। থিয়েটার, ক্যাসিনো, সরকারি দপ্তরের ইমারৎ-গুলোর সার, বড়ো বড়ো হোটেল, পার্ক, ইয়াট ক্লাব, সুইমীং পুল—সব, সব, এক কাঠ্ঠা এই স্বর্গে। পার্ক রাম্ফিস কেবল বাচ্চাদের পার্ক। যেন ডিসনী-ল্যাণ্ডের এক মেটে সংস্করণ। কী পণ্ডিত নেহরু, কী বেন-বেলা, কী এন্‌ক্রুমা—দেশের শিশুদের জন্য ডিসনী ল্যাণ্ডের মতো পার্ক করার জন্য মেতে উঠেছিলেন। কাছাকাছি পশুশালা, বাচ্চাদের জন্য নানা পশুবাহিত গাড়ী; কচ্ছপ, উট, জিরাফ, ল্লামা, টাট্টু, উটপাখী—সবাই গাড়ী টানছে! বাচ্চা ট্রেন। বাচ্চারা এখানে খেলায় মত্ত। সুব্যবস্থা। এরই ধারে বট্যানিক্যাল গার্ডেন। ধাপে ধাপে উঠে যাও। ক্রমশ ট্রপিকল থেকে টেম্পারেট দুনিয়ার গাছ। অবশেষে নাড়ী কুণ্ডলীর মতো গুহা; গুহার প্রাচীরে প্রাক্-য়োরোপীয় (অ)সভ্যতার ছবি !...সবই এক ত্রুহিলোর জীবনে সাধিত।

ত্রুহিলোর অপর নাম ছিলো এল্-বেনিক্যাক্‌তর্। অথাৎ দেশবন্ধু, দেশাত্মা,

দেশপ্রেম নয়—স্রেফ 'কৃপানিধান'! সারা দেশের দীন-দুনিয়ার মালিকই নন্ শুধু, প্রত্যেকের অন্নের মালিক!

সত্যি সত্যি ভাবতে অবাক লাগে এই 'কৃপানিধান'-খানা কায়সা মাল ছিলেন। ব্যাংক, রেলওয়ে, সমগ্র ইণ্টার্নাল ও এক্সটার্নাল ট্রেড, বড়ো বড়ো দোকান, ডিপার্টমেণ্টাল শপের সারি, পোস্ট টেলিগ্রাফ, বাস এবং ট্যাক্সি, ফ্যাক্টরির পর ফ্যাক্টরি—সব-সব-সব লিওনার্দো ত্রুহিলোর ব্যক্তিগত, অভাবে জ্ঞাতি-কুটুম্ব-গত সম্পত্তি। গোটা দেশটার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ক্যুবায় ছিলো বাতিস্তা, স্পেনে ফ্রাঙ্কো; পর্তুগালে সালাজার; আর্জেণ্টিনায় হুয়ান দোমিঙ্গো পেরন। এমনই খুঁটি বসানো আছে ব্যাংককে, লাওসে, ফিলিপিনে, ফরমোসায়। তবে লিওনার্দো ত্রুহিলো ছিলেন 'মাচা'র 'মাচা' লাউমাচা। ১৯৬১-তে ধাক্কা খেয়ে ধপাস্। তবু ত্রুহিলো নামটা জাঁকের নাম। আমরা গেছিলাম ধপাস যুগের পর পরই ১৯৬২-তে; তখনও ত্রুহিলোর নামেই সব থরহরি।

সে যাই হোক। ট্রপিকের ত্রাতা, নব-ওয়াশিংটন 'ত্রুহিলো'। সারা থিউদাদ ত্রুহিলোময়। ঘরে ঘরে ছবি, ঘাটে ঘাটে, পথে পথে মূর্তি। ত্রুহিলো, ট্রপিকের ওয়াশিংটন। একটি মনুমেণ্ট, ত্রুহিলো-হাল,- দেখবার মতো। স্পর্ধিত শিল্প।

১৮৬৫ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত সান্দোমিঙ্গোর থিয়েটারে পুতুলনাচ চলেছে। নিত্য নব প্রেসিডেণ্ট Baez এবং Santana উল্টে পাল্টে প্রেসিডেণ্ট। Baez যুক্তরাষ্ট্রের পোঁ। ১৮৬৫ তে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের করকমলে সান্দোমিঙ্গোর শাসনভার তুলে দেবার প্রস্তাব আনলেন। প্রার্থনা জানালেন সান্দোমিঙ্গোকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্র করা হোক। দুনিয়াকে দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সেটা 'না!'—বচনে প্রত্যাখ্যান করলেন!!

সেই ১৮৮২ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত পুনশ্চ ভীষণ দ্রুত বিপ্লব, বিপ্লবের পর বিপ্লব। বদমায়েস জনতাও ছাড়বে না পিছু নিতে; মহদাশয় যুক্তরাষ্ট্রও কোন্ প্রাণে এদের অনাথ করে ফেলে যায়। সে এক বিষম সংকট। চার্চে চার্চে 'সবকো সম্মতি দে ভগবান' ধুন চললো।

১৯১৬ সান্দোমিঙ্গোর পরিত্রাণায়, সান্দোমিঙ্গোর দুষ্কৃতিদের বিনাশায় যুক্তরাষ্ট্র 'অবতার'রূপে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর নাম হলো—'ইউনাইটেড স্টেটস্ মিলিটারি গবর্নমেণ্ট অব সান্দোমিঙ্গো'!...১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। তখন সান্দোমিঙ্গোর অর্থনীতিকে আষ্টেপিষ্টে হনুমান-বাঁধনে কাৎ করেছে রাবনী সভা যুক্তরাষ্ট্র। মিলিটারি গবর্নমেণ্ট বিদায় হলেন। জনগণের মানস-ছবি রেভারেণ্ড ভাৎক্কোয়েৎ প্রেসিডেণ্ট।

কিন্তু রেভারেণ্ড দিয়ে বেনের চলে? তা হলে আর ভারতে গান্ধীকে, সাইপ্রাসে মাকারিওস্‌কে এতো নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে কেন? ১৯৩০-এই ভাৎক্কোয়েৎ বিতাড়িত!...বহাল হলেন জেনারেল লিওনিদাস ত্রুহিলো-মলিনা।

ত্রিশ বছরে ত্রুহিলো সান্দোমিঙ্গোর হাল বদলে দিলো। কেবলমাত্র সমুদ্রঘেঁষা নগরগুলো এবং পথঘাট ইমারৎ দেখে তাক লাগিয়ে দিয়ে বাজার মাৎ করেছে ত্রুহিলো।

...কতো উন্নতি! রাস্তাঘাট ছিমছাম। আকাশ ছোঁয়া ইমারৎ!! তা-বড়ো তা-বড়ো হোটেল। সুইচ টেপো, আলো; চেন টানো, জল; বাজার ভর্তি ক্যামেরা,

ট্রান্‌জিস্টার, টি-ভি, ওয়াশিং-মেশিন। এয়ার কনডিশনড বাড়ি। আমেরিকান গাড়ি। উন্নতির পরাকাষ্ঠা। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ছয়লাপ।...সবই আমেরিকান এবং ক্যানাডার ব্যাঙ্ক?...হোক না। ধার দিচ্ছে, নাও। আর কি চাই? ত্রুহিলো গোটাকতক খুন করেছে?—লোকেদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রেখেছে?—দেশ থেকে তাড়িয়েছে?—সব রকমের প্রতিপক্ষকে সব রকমে ভিটে-মাটি-চাঁটিয়ে ছেড়েছে?—দু হাতে লুটেছে, লুটছে দেহের যাবতীয় সম্পত্তি?—আর কি বলবে? আচ্ছা নেমকহারাম, বজ্জাত, ঠোঁটকাটা লোক তো! নিশ্চয় কম্যুনিস্ট! কোন্ ডিক্টেটর এতো ঝামেলা পোয়াবে খালি হাতে? ডিক্টেটর না হলে চটপট দেশের উন্নতি কী করে হবে শুনি? কম্যুনিজ্‌ম্ দিয়ে? ...ভীমরতি হলো নাকি?

তুমি বাহবা না দিলে না দাও। ত্রুহিলোর কথা একবার জিজ্ঞাসা করো তো ওর পরিবারের জনুয়াড়ীতম চনুয়াড়ীকে, ফোরুড়তম পিরুকড়কে, জিজ্ঞাসা করো তো ওর বদান্যতায় লবো-কলোবরো লটোবরোদের, জিজ্ঞাসা করো তো বড়ো বড়ো কনট্রাক্টরদের, জিজ্ঞাসা করো তো পাদ্রীদের, জেনারেলদের, ওর য়ুনিভার্সিটির গুরুদের, সরি, গুরুদের! একবাক্যে ওরা 'জয় ত্রুহিলা' না বলে তো—আমার কান কেটে আবার সেলাই করে দিও।

ত্রুহিলা ইতিহাসে প্রমাণ করে দিলো চুটিয়ে রাহাজানী, ডাকাতি, চুরি করে যাও। সর্বরকম অনাচার, অত্যাচার বে-শরম হয়ে করে যাও,—কিন্তু সঙ্গে রাখো যুক্তরাষ্ট্রকে, খাটতে দাও যুক্তরাষ্ট্রের টাকা,—তুমি তোমার দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পেঁছে দেবে। বাঁশ দিয়ে হলেও দেবে।

চরম শিখরে পেঁছবার পরের পদক্ষেপে কী হবে তা কেউ ভাবে না!!

সান্দোমিঙ্গোর জনসাধারণ অসভ্য!

বেইমান!!

১৯৬১ মে মাস, ৩১শে! ট্রান্‌জিস্টার রেডিওতে গায়ানায় বসে শুনেছি ত্রুহিলোকে ৩০ তারিখে একদল গুণ্ডা কোতোল করেছে।

কিন্তু কে করেছে, কারা করেছে, কেন করেছে—কিসসু শুনতে পারিনি। মাঝে মাঝে ত্রুহিলোর রেডিও ধরা যায়। মাঝে মাঝে যায় না। বি-বি-সি বলছে শহরে শহরে গোলমাল; টোকিও বলছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সান্দোমিঙ্গোতেই শান্তি বিরাজমান, নু্য-ইয়র্ক বলছে ত্রুহিলো ঘাতকরা ধরা পড়েছে—তারা কম্যুনিস্ট; প্যারিস বলছে, ত্রুহিলো হার্টফেল করে মারা গেছে; কেউ কখখনো মারেনি। আবার খানিক ভাঁওতাবাজী করে রক্তক্ষয় করানোর আম্রীকী মতলব। ক্যুবা থেকে ক্যাস্ট্রো যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাই আমেরিকানরা...ইত্যাদি ইত্যাদি...ত্রুহিলা খতম। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা যুগ খতম। সান্দোমিঙ্গোর লোকেরা ত্রিশ বছর ধরে জানে ত্রাণ-কর্তা ত্রুহিলোকে। তাকে বাদ দিয়ে সান্দোমিঙ্গো, খুইদাদ-ত্রুহিলো তো নিরর্থক। ত্রিশ বছর বয়সী ছেলেমেয়েও জানে সান্দোমিঙ্গো মানে ত্রুহিলো, ত্রুহিলো মানে সান্দোমিঙ্গো। তাদের ছেলেমেয়েরাও তাই। গোটা একটা বংশকে বংশে ত্রুহিলো এক অভ্যস্ত নাম। মানুষ মনেও করতে পারে না ত্রুহিলো-হীন আকাশের রং কেমন ছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে ত্রুহিলোর পুত্রকে ডাকা হলো। সে তখন হলিউডের নাইট ক্লাবে। "সান্দোমিঙ্গোর শাসনকর্তা ?…ওতে আমার কাজ নেই।' অহো, বিশুদ্ধ বিবিক্ত সন্ন্যাস! হবে না? ত্রুহিলোস্য পুত্র যে।

হেসে বলেছিলো রিপোর্টার—"কয়েক কোটি টাকা, অঢেল স্বাস্থ্য, কিছু নাইট ক্লাব এবং লস্ এঞ্জেলেস্ কিংবা প্যারিসে বাস,—এ ছেড়ে প্রেসিডেন্সী? ছোঃ। ছাগল না পাঁঠা?"

অতঃপর তস্য ভ্রাতা। ত্রাণকর্তা ত্রুহিলোর ভ্রাতা!

শেষ অবধি সেই মানবপুত্রই এলেন।

তখনই লাগলো আসল লড়াই।

এতো যে সান্দোমিঙ্গোর অঙ্গুষ্ঠবুদ্ধিজাত কদলীকায়ত্ব এর জন্য ত্রিবর্গকে দায়ী করেন পণ্ডিতেরা। প্রথমটা ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ কুখ্যাত 'হারিকেন!' H B pencil-এ আঁকা ছবিতে যদি ঘণ্টা চারেক রাবার ঘষা যায়; দ্রৌপদীর শাড়ির ওপর দু ঘণ্টা যদি সালফিউরিক অ্যাসিড ছাড়া যায়; বট্-ঠাকুর্দার মাথার পাকা চুল কাঁচাতে গিয়ে 'খানদানী' কলপ'-এর বদলি প্রমাদবশত যদি কেউ চার ঘণ্টা ধরে চুল তোলার লোশন মালিশ করে—তার যা অবস্থা হবে, তামাম রাজধানীর সেই অবস্থা একটি কালবোশেখের পর। লোকে বলেছিলো ত্রুহিলোর 'প্রেসিডেন্সী'-তে খুশী প্রকৃতি নিজে তাকে এই ভেট পাঠিয়েছিলেন। ভেট? কেন?—কারণ এই প্রথম বর্গের পর দ্বিতীয় বর্গ; অর্থাৎ মহামান্য, বদান্য যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তদান। অঢেল টাকায় ঢেকে দিলো। কুবাতে লড়ায়ে তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ হয়েছিলো। শান্তির পর গৌরবের, এবং—সস্তার। আমেরিকা ত্রুহিলো-শাসিত ডলার-হ্যাচিং ফ্যাক্টরি। তৃতীয় বর্গটি হলো ত্রুহিলোর কাগজী-কেরামতী। কাগজে পরিসংখ্যান দাঁড়াচ্ছে: ত্রিশ বছরে ত্রুহিলো সান্তোদমিঙ্গোকে দিয়েছে—৫000 বিদ্যালয় (প্রাথমিক), ১২000 বয়স্ক-শিক্ষায়তন-ব্যবস্থা। অশিক্ষা বেতাড়িত। এবং দেশের ঋণ একেবারে খতম। ত্রুহিলোর ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে ধারে; খাটাও খাও। ত্রুহিলোর টি-ভি, রেডিও, সংবাদপত্র খবর দিচ্ছে; জ্ঞান বাড়াও। ত্রুহিলোর ফরমাসী বই পড়ো,—পণ্ডিত হও।

কারণ ডোমিনিকানরা দারুণ বিদ্রোহী জাত। ১৮৪৪ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে ৪৩ বার প্রেসিডেণ্ট পাল্টেছে এরা; ৫৬ বার বিদ্রোহ করেছে। ৩৪ বছর ত্রুহিলো কাঁকড়ার মতো কামড়ে থাকলেও Trinitaria-র দলকে শুষতে পারেনি। অন্তর্দ্রোহ চলেইছিলো।

১৯৬০-এ জাহাজে একজন ত্রুহিলো বিদ্রোহীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার কথা যথাস্থানে বলবো। আপাতত সান্দোমিঙ্গোর কথা বলা যাক।

জাহাজ সান্দোমিঙ্গোর ঘাটে নোঙর ফেললো। পুত্র-কন্যারা তখন ডেঙায় যাবার জন্য ছট্ফট। আমি খুইদাদ ত্রুহিলোর ঘাটের পুলিসের দপ্তরে পাসপোর্ট জমা রেখে নামলুম। 'জেনারেল দ্য তুরিসো' টুরিস্টব্যুরোর অফিস। আর কিছু না হোক, 'গোপনে' 'অজান্তে' 'নবাগতের' ফোটো নেওয়া শেষ।

"কী চান্ ?"—স্পানিশ মেয়ে ইংরিজী বলে। আধো আধো শোনায়। মিষ্টি ? —তা হলে একেই বলে অমৃত-গরল। কারণ বিরক্ত, তাচ্ছিল্য।

"একটু খবরা-খবর।"

"টুরিস্ট ?"

"হ্যাঁ।"

"ইন্ ট্রান্‌জিট্ ?"

বললাম বটে হ্যাঁ, কিন্তু বুঝলাম কৌলীন্যে নেমে গেলাম অনেক পৈঠা।

ওপরে নোটিশ পড়েছেন ?

ওপরে চাইতেই স্মরণে এলো—ফোটো নেবার এই বিধি। আমি তাকাবো। আমার ফোটো নেওয়া হয়ে যাবে।

নোটিশ সাধারণ। অবাঞ্ছনীয় কেতাব পত্র···ইত্যাদি।

মনে পড়ে একবার মাঝরাতে মস্কো পৌঁছেছি। প্লেন থেকে নেমে সামান্য পথ হেঁটে ছাদ ঢাকা পথ। শক্ত পা-পেছলানো বরফে ঢাকা পথ। মৃদু কণ্ঠে পরিদর্শিকা বললেন, সামলে চলবেন।

কফি খেয়ে লাউঞ্জে ঘুরছি। টি-ভি-তে পল্‌কা নাচ দেখছি। বিখ্যাত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নাচছে।

বইয়ের দোকান ভর্তি বই। নাড়ছি চাড়ছি।

দোকানদার নেই।

একজন উর্দীপরা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করি পরিতাপের বিষয়—কিনতে পারবো না। লোক নেই।

মহিলাটি বললেন—এ বই বেচার জন্য নয়। ইন্‌ট্রান্‌জিট্ পর্যটক অতিথিদের—যাত্রীদের মনোমত যাঁর যা ইচ্ছে নিতে পারেন। তাঁদের জন্যই। আপনি নেবেন! নিন।

প্রায় বিশ্বাস হয় না।

হিস্ট্রী অব ইউ. এস. এস. আর. বইখানা আমি বিনামূল্যে মস্কো থেকে সেবার সংগ্রহ করি।

উনি আয়রণ কার্টেন।

ইনি ডেমক্রাটিক রিপাব্লিক। ডিক্টেটর যাঁর প্রেসিডেণ্ট।

গোরা আমার খোঁজে তখন জাহাজঘাটার সিঁড়িগুলো পার হয়েছে। গোরার মা কনিষ্ঠা কন্যা আত্রেয়ীর হাত ধরে সিঁড়ি উঠছেন। পাশেই স্পানিশকালের গড়া বিশাল দুর্গের দ্যাল, সমুদ্রের ধারে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তীর্ণ। দ্যালের পূব দিকে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে চলেছে ওজামা নদী। হিস্পানিওয়ালা দ্বীপে বহু নদী। সারা ক্যারাবিয়ানে এতো পর্বতসঙ্কুল, নদীসঙ্কুল এবং অরণ্যানি-সমৃদ্ধ দ্বীপ আর নেই। তবে ঐ পর্যন্ত। অরণ্য ও কৃষি ছাড়া সান্দোমিঙ্গোয় আর বিশেষ কিছু নেই। খনিজ পদার্থের নিতান্ত অভাব। আমেরিকান যন্ত্রপাতি ফিট করে আমেরিকান টাকা লাগাবার মস্ত মোকা।

কোকো, কফি, তামাক—এবং চিনিই এর ৬৯% বহির্বাণিজ্যের অংশ, এবং ৬২%-ই কেবল চিনি; তাও মাত্র খাঁড় চিনি; আমেরিকাই সবটা হড়প করে নেয়; তারপর তাকে শাদা-দানাদার করে, লজেঞ্জস্ করে, সুগ্যার কিউব করে রাম-কানাই কামায়। যাকে বলে সফাচট্ হজামত্।

কর্ডিরেলা সেন্ট্রল পাহাড়ের চূড়া দশ হাজার ফুট ডিঙিয়ে গেছে। পাহাড় পূব-পশ্চিমে।

আমরা নেমেছি দক্ষিণ দিকে। বে-দা-ওকোয়ার পাশে থুদাদ বে-তে। দ্বীপের পূবে বোম্বেটে-খ্যাত মোনা প্যাসেজ, পশ্চিমে কুবা-সমর-কুখ্যাত উইণ্ড ওয়ার্ড প্যাসেজ। কুবা এবং হিস্পানিওলার মাঝে একশো মাইল সমুদ্র ব্যবধান।

দুর্গের পাশে সিমেণ্ট কংক্রীটের ধাপ। ধাপের মাথায় সেকালীন আর্চ। আমি দূরে পুরোনো গাছ ঢাকা ছাদ মতো একটা জায়গা লক্ষ্য করে উঠেছি। যতদূর মনে হয় ঐখানে প্রথম কলম্বাস হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলো। ঐখানে কলম্বাসের নামে একটা পুরোনো গির্জাও আছে। ১৯৩০-এর সেই হারিকেন সত্ত্বেও ষোড়শ শতাব্দীর স্পানিশ কীর্তিমত্তার যে দু-চারটি পরিচয় আজও বিদ্যমান—সান্তা-মারিয়া ক্যাথিড্রাল তার অন্যতম।

আমি ওপরে উঠে আসতে আসতে গোরাও এসে পড়ে।

লীলা আতুকে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারধার দেখছি। নতুন পৃথিবী; নতুন সভ্যতা; নতুন মানুষ। ঘন ছায়া-ঢাকা পথ; স্যাঁৎসেঁতে শ্যাওলাধরা দ্যাল, গোল এবং চৌকো পার্কের ওপারে সারি সারি দোকান, আগাগোড়া শাদা মানুষ, ঢিলে ঢিলে জামা পাজামা সত্ত্বেও ধনাঢ্যতা চুয়ে পড়ে; ভাষা অজ্ঞাত, অথচ মধুর।

ক্যাথিড্রাল থেকে স্তবস্তুতি ভেসে আসছে। সামনে ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন পার্কের মাঝখানে ক্রিস্টোফর কলম্বাসের মূর্তি। তার পাশে শাদা পাথরের সার্কোফেগাস চিহ্নিত করে রেখেছে কলম্বাসের মরদেহের অন্তিম শায়ন। তাঁর ইচ্ছাতেই তাঁকে এখানে সমাহিত করা হয়। হিস্পানিওলাকে তিনি ভালোবাসতেন, ভালোবাসতেন এই উদ্দাম ঝড়সঙ্কুল দক্ষিণ সমুদ্র; যদিও হিস্পানিওলার ভালো বন্দরগুলো উত্তরে। সান্দোমিঙ্গোর তিনভাগ লোকই কর্ডিলেরা সেন্ট্রালের আশী মাইল বিস্তৃতির উত্তরের সামান্য অংশে থাকে। চাষেরও তিনভাগই উত্তরে। তবু দক্ষিণই তাঁর প্রিয় ছিলো।

আমরা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকে যখন চার্চের সর্ব-শেষ বেঞ্চিগুলোতে বসলুম দেখলুম সমগ্র চার্চের বিরাট হল ভরে আছে য়ুনিফর্ম-পরা স্কুলের ছাত্রদল। ছাত্রী নেই। বেশীর ভাগ শাদা। পরে জেনেছিলাম কাগজে কলমে প্রাইমারি শিক্ষা আবশ্যিক, মধ্য এবং উচ্চশিক্ষাও 'ফ্রী'—কিন্তু সত্যিকার শিক্ষার প্রসার শাদাদের মধ্যেই বিস্তীর্ণ। কালোরা পড়ে ভালো, না-পড়ে, সেটা আরও ভালো।

বিদেশী পর্যটকরা যায় দক্ষিণের শহরগুলোতেই। আসল সান্দোমিঙ্গোরা বাস করে পাহাড় ডিঙিয়ে সান্তিয়াগোর আশেপাশে মোকা, লা-ভেগা, কানস্টান্জা,

সাঁঙ্গোয়ান্, জারারোকোয়া—এই সব ছোটো ছোটো শহরের মাঝে মাঝে গাঁয়ে অকথ্য দারিদ্র্য।

উত্তরের কেম্ সামানা থেকে দক্ষিণে থুইদাদ ব্রুহিলো পর্যন্ত ভাগ করেছে পাহাড়। এই পাহাড়ের পূর্বে মোনা প্যাসেজের ওপর কেপ এঙ্গানো পর্যন্ত ঝকঝকে তকতকে পোশাকী সান্দোমিঙ্গো। তারও মধ্যে থুইদাদ ব্রুহিলো মহা আড়ম্বরে সজ্জিতা নগরী। প্রাচুর্য—প্রাচুর্য বলতে যা কিছু সবই এই দোকাদারী মতে সাজানো প্রত্যক্ষ গবাক্ষের নট-লীলা।

ও সব বাদ দিয়ে অন্যত্র গতিবিধি পর্যটকদের পক্ষে ভয়াবহ। কেউ বড়ো গা করে না। সে বিষয়ে হেইতী পর্যটকদের শ্রীক্ষেত্র। ডক্টর দুভালিয়েও ডলারখেকো হাঙ্গর ডিক্‌টেটর। কিন্তু দুভালিয়ে জানে 'সর্বাঙ্গে ঘা ; মলম লাগাবো কোথায় ?'…ব্রুহিলো তা নয়। লিওনার্দ-ব্রুহিলো সূক্ষ্ম ওস্তাদ—অমায়িক খচ্চর—ডাঙ্গস-ডাকাত ;—বিদেশীর কাছে দেশ, মার মাংস বেচে যে চর্বি আপন দেহে জমাচ্ছে সেটা ঢেকে রাখছে ধর্ম, নীতি, প্রগতি, ডেমক্র্যাসী, শিক্ষা-শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির বহুপ্রচারিত রাংতায়।..

মজার খেলা-তামাশা !

যে দেখে সে বোঝে ; যে বোঝে সে ট্যারা হয় ; যে ট্যারা হয় না, তার চোখ নেই।

চোখ নেই, বরং ভালো। কিন্তু বোবা হয়ে না থাকলে ফায়ারিং স্কোয়াড আছেই।

আমি সামনে কচি কচি মুখগুলো দেখছি। য়ুনিফর্ম দেখছি—আর মনে বহু কথা ভেসে যাচ্ছে। লীলা পাশে মাথায় কাপড় দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসেছে আমার দেখাদেখি, ভাবছে দেবস্থানে আমার পতিদেবের ভারী প্রীতি !

অথচ আমি দেখছি যাবতীয় ছেলেগুলোর দৃষ্টি আর সম্মুখের দীর্ঘায়িত মণি-মাণিক্য-খচিত ক্রুশে নেই, ক্রুশের তলায় জ্বালানো স্বর্ণ এবং রোপ্য বাতিদানে পোঁতা বহু মোমবাতির শিখার পানে নেই ; জরি এবং জুয়েলে ভরতি পোশাকে মোড়া দেব পূজারীদের নানাবিধ হাত পা নাড়ার প্রতিও নেই। চোরের মতো, চুরির তৃপ্তি মাখানো তরুণ-তরলতায় দীপ্ত সেই জোড়া জোড়া চোখ বারবার চেয়েছিলো শাড়িপরা, সিঁদুর ফোটায় ভূষিত অদ্ভুত শান্ত একটা স্ত্রীর দিকে, যেটার আমেজ স্পানিশ-বোধে যেন একটা অন্য জাতের তৃপ্তি। সকলের চোখে একই জিজ্ঞাসা ! এরা কারা ? 'কুতো হ বৈ ইমাঃ প্রজাঃ ?'

রেনেসাঁ-যুগের শিল্পকলার চিহ্ন স্থাপত্যে। ১৫২৩-এ আরম্ভ করা হয়। সম্পূর্ণ হতে লাগে বিশ বছর। সান্তা-মারিয়া-লা-মেনর চার্চ এ ভূমণ্ডলের বিখ্যাত চার্চ। মাদীরায় এমনি এক অপূর্ব চার্চ দেখেছিলাম। সেখানে কেউ ছিলো না। পাহাড়ের মাথায় একটি চার্চ। ওপরের নীল-কাঁচ-ঢাকা জানলা দিয়ে প্রদীপ্ত সূর্যরশ্মি এসে পড়েছে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর চরণে। বাকি সব অন্ধকার। বড়ো বড়ো দুই মোমবাতি জ্বলছে দু-ধারে। এক কোণে কালো পোশাক পরে বসে বসে কাঁদছে এক বিধুরা ? পুত্র নেই ? স্বামী গেছে ?

…এখানে কাঁদছে না কেউ। গান হচ্ছে। অন্ধকার নয়, আলোয় ভেসে গেছে

পাথরের মেঝে। খালি নয়; ঘর ভর্তি ছেলে; সামনের দিকে সাধারণ উপাসক-উপাসিকারা।…এখানে গাম্ভীর্য নেই, ঐশ্বর্য। বিষাদ নেই; বিলাস। এখানে একা যীশু ক্রুশবিদ্ধ নয়; শিশু যীশু মায়ের কোলে। যে কাজ ত্রিচিনপল্লীর রাজ দরবারের থামের কারিগরীতে দেখেছিলুম সেই চুন-সুরকির কাজ থামে। মুরিশ্‌ পাম শিল্পকেই স্প্যানিশ রয়াল-পামে পরিণতি দেওয়া হয়। সেই রয়াল পাম-প্রতিফলিত স্তম্ভের পর স্তম্ভ। বেদীটা রুপোয় ঢাকা। সান্দোমিঙ্গোর ভূগর্ভে এককালে রুপো ছিলো। সেই রুপোয় গড়া এই বেদী।

ম্যুরিলোর তৈরী ম্যাডোনা, সেলিনীর তৈরী হাতে বাজানো ঘণ্টার মালা,—বহু বহু রত্ন-মণি-মাণিক্য সমৃদ্ধ এই গির্জা আমেরিক-ভূখণ্ডের প্রথম ক্যাথীড্রাল। য়োরোপেও এতো সমৃদ্ধ ক্যাথীড্রাল অল্পই আছে।

বাইরে এলাম। পোশাক পরা একটি দল সামনের পার্কে ঝলমল করছে। বাসের অপেক্ষা। গাড়ির অপেক্ষা। ক্যাথীড্রালের পাশে পথগুলো সেকেলে। এখানে গাড়ি আসতে দিলেও দাঁড়াতে দেয় না। তাই গাড়ি-বান্‌ বৃহৎ-জনেরাও দাঁড়িয়ে আছেন গাড়ির প্রত্যাশায়। টিমিস্‌ স্টুডিও গিফট্‌ শপ্‌-এ ভীড়। কিন্তু থ্যুদাদ ত্রুহিলোতে জিনিস-পত্র ভারি মাগ্‌গী। আমি তাড়াতাড়ি চাইছি বাচ্চাদের খাইয়ে নিয়ে শহর দেখতে বার হই।

রাস্তায় খানিক হাঁটা আমার অভ্যেস। যেন দেশ দেখার অবশ্য করণীয় অঙ্গ। সব্জী-ফলের বাজারেও যাবো। ওখানে না গেলে ১০% দিশী-দেশ দেখা হয় না। ঐ যে বেলা এগারোটা বারো'টায় ঝুড়ি-ডালার ফাঁকে রাখা খাদ্য বার করবে; ঐ যে কে রুমালে বেঁধে আনবে দুপুরের খাদ্য; ঐ যে কে একজন মৌকামতো খাবার বেচতে আসবে; ঐ মিনিট কয়েকের জন্য বেচায় ঢিলে পড়ে যাবে; মানুষগুলো যন্ত্রতা ছেড়ে মানুষতায়, জীবতায় ব্যস্ত থাকবে, ওবই মাধ্যমে আমি দেখতে পাবো দেশের প্রকৃত অবিচার-অনাচার, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক—ধর্ম বিচারের ছাব।

কিন্তু সে পরে যাবো। জাহাজে চড়ার আগে কিছু ফল পাকুড় কিনে নিতে হবে। জাহাজের খাদ্যে টাটকা রসের অভাব থেকেই যায়।

মোড়ের মাথায় ঝকঝকে একটা সরাইখানা। গোরা বাগিয়েছে এক নিগ্রো বন্ধু! আতু-ও সঙ্গে। যথারীতি নিরুদ্বিগ্না শান্ত লীলা একটা টেবিলে এক বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে নিয়ে বসলো। আমি পেয়েছি মুচি। ওর সঙ্গে গল্প আমাকে করতেই হবে। ভাষা? যে বলতে চায় সব ভাষায় বলতে পারে। মানুষের ভাষা, চোখে, হাসিতে, হৃদয়ে।

গোরাকে বললুম, যা ইচ্ছে অর্ডার করে আমাদের ভালো করে খাইয়ে দাও তো দেখি।

গায়কোয়াড বরোদাই বা কে, গোরাই বা কে। সেই নিগ্রো বন্ধুর সাহায্যে এবং ভাষার অভাবে আবদ্ধ হওয়ায় ওরা উপদ্রব মাচালো; দোকানী হেসে গড়াগড়ি খেলো; আমরা কী খেলাম মনে নেই।

কিন্তু মুচি আমেরিকান ইংরিজী জানে। আমেরিকান 'কামিয়ে' ওর বুদ্ধি চাঁচাছোলা। এদের আপনারা সর্বদাই দেখতে পাবেন চৌরঙ্গীর রঙ্গধামের ইতি উতি। আমি ওর কাছে অনেক কিছু আশা করছিলাম; আমি দিলাম এক ডলার। ভেবেছিলাম আমিই কামাবো। মনে হলো যেন ও-ই আমাকে—যাক্ গে! অবশেষে ট্যাক্সি করলাম।

রফা হলো তিন ডলার। ও একটা ঘন্টা কয়েকের পাক খাইয়ে জাহাজ ঘাটে এনে ফেলবে।

এবং তারপর থেকেই লাগলো মজা।

মুচিটা প্রথমেই বলেছিলো ভাষা জানি নে!

সেটা বুঝে নিয়েছিলাম।

কাজেই কথা বলতে কষ্ট হয়নি।

টি-৯৩৮৮ প্রথমেই বলেছে—জানি!

Know English.

Yes—No. Inglese No.

এই **Know**-টি যে **No** এ আবিষ্কার করতে করতে আমাদের তিন ঘন্টা। এ তিন ঘন্টায় ও আমাদের **Avenida** ওয়াশিংটনে নিয়ে গিয়ে নয়া ব্রুহিলোর ডাঙ্গস্ ডাঙ্গস্ ইমারৎগুলো দেখালো। গোরার ক্যামেরা তখনও চলছে চীনের এ্যাটম-বম এক্সপেরিমেন্টের বেগে। **Parque Ramfis**-এ গোরা ল্লামার গাড়ি চেপেছে; আমরাও নানা জীব-জন্তু দেখেছি। সাজানো একটা **Zoo**!! চমৎকার সাজানো। ন্যাশনাল প্যালেস, য়ুনিভার্সিটি সিটি সবই দেখাচ্ছে। আমরা নামছি, দেখছি উঠছি। সবই ঠিক। কিন্তু সেই মদীয় গোরার মাতুল ক্রমাগত বলচে 'পেসিডেন্স'! অথবা 'রেসিডেন্স'!! ব্যস।

গোরা—হোয়াট ইজ দ্যাট?

টি-৯৩৮৮—পেসিডেন্স?

গোরা—**What Presidence?**

টি-৯৩৮৮ (কড়া চোখে চেয়ে—ভাবখানা 'কে হে চ্যাংড়া, কর্তার ওপরে কথা কও'?)—পেসিডেন্স!

গোরা—**And what's that?**

টি-৯৩৮৮ (ঠোঁটে হাসি বিনীত) রেসিডেন্স!!

এই চলেছে ক্রমাগত।

অতঃপর আর হাসতেও পারছিলাম না।

একটা জল খাবার ফাউন্টেন।

আত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলো, ওটা কি?

গোরা বিজ্ঞের মতো বললো, পেসিডেন্স।

তৎক্ষণাৎ টি-৯৩৮৮ 'করেক্ট' করে বললো 'রেসিডেন্স!'

আমরা রেসিডেন্স-জল খেলুম! টি-৯৩৮৮-এর চোখ ছানাবড়া। পথের জল

খায় ? এরা কোন দেশের মাল ! পকেট-ফকেট সামলালো ও। বিশেষ করে সিগারেট লাইটারটা।

…আমার আজও সন্দেহ জীবনে প্রথম সপরিবার একজন ভদ্র (?) লোককে হাত ধুয়ে জল খেতে দেখে ও সন্দেহ করেছে আমরা শাড়ি জামা পরা উট নাকি! ওদের দেশে পানীয়—চিরকাল জানে ওরা বিয়ার, না হোক কোকা-কোলা।

তাই ও জিজ্ঞাসা করলো—Afrique Franchais ? ফরাসী আফ্রিকার মাল নাকি ?

আমরা যখন বললাম—ইণ্ডিয়ান, হিন্দু !!!

ও চোখ মটকে হেসে বললে,—যাঃ !! তারা যে সভ্য হয় এ কে না জানে !

এর পরে কিছু আর বলা যায় না।

আলকাজার একটা দর্শনীয় জায়গা।

আমার দিব্য মনে আছে…ফ্লরেন্স নয়,—নেপ্‌লস্‌। রোম থেকে আমরা পম্পের ধ্বংস দেখে ফিরছি। নেমেছি নেপ্‌লসে। সঙ্গে রোমের বন্ধু-বান্ধবী; ওদের বাড়িতেই সপরিবারে আমি অতিথি। সন্ধ্যের আগে মেয়েদের বিশেষ করে অসুবিধা হতে থাকলো। সুবিধা-মতো একটা খানা-ঘর পাওয়াও দরকার। দুটোই একজায়গায় হওয়া ভালো। নেপ্‌লস ক্যাথীড্রালের সামনে পেল্লায় ফৈলাও করা এক পিয়াৎসা। তারপরে ধুম-ধাড়াক্কা এক অট্টালিকা। বড়ো বড়ো থাম। ক্যা-বাৎ বারান্দা। ওপরে লোহার জালী আর কাঁচে ঢাকা এক বিজলী-জ্বলন ছাদ। তার মধ্যে নানান্‌ দোকান।…ওরই একটায় খানাঘর।

আলকাজার দেখে আমার প্রথমটায় অমনি মনে হয়েছিলো। মুরিশ্‌ ভাষায় অলকাজার ভাঙলে অল্‌-ক্‌জার; ক্‌-জার, কাইজার, জার, সীজর,—সবই দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত সম্রাটের তক্‌মা। অল্‌কজার সেই সম্রাটের প্রাসাদ। মুর-স্পেনে রাজপ্রাসাদকে অলক্‌জার বলা হতো।

কলম্বাস তনয় দীগো কলম্বাস যখন সেভীলের রাজপুত্রীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করে সান্তো দমিঙ্গোতে রাজকার্য চালাতে আসেন তখন সেই রাজকন্যার খিদমৎগারীর জন্যও বটে—আবার নতুন দুনিয়ায় স্পানিশ থাক্‌ ঢাক বাজিয়ে প্রমাণ করবার জন্যও বটে—এ প্রাসাদ গড়া হয়। ১৯৩০-এর দুর্বিপাকে এ প্রাসাদের সমূহ ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও প্রাসাদটিকে পুনশ্চ মেরামত করা হয়; তার পূর্ব খ্যাতিকে উজ্জ্বলতর করে জমিয়ে বসানো হয়। ফলে, সান্দোমিঙ্গোতে আল্‌কাজার দর্শন একটি MUST। ১৫১০-এর প্রাসাদের কায়াকল্প হয় ১৯৫৭-তে। প্রণামী দেন পর্যটকেরা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মহিমময় স্পেনের সেই গরিমা-গর্বিত রূপটিকে নিখুঁৎভাবে আল্‌কাজারে সঞ্জীবিত করে রাখার জন্য অর্থবান লিওনার্দো ত্রুহিল্লো বহু অর্থ ব্যয় করেন। বিশ্বের সমস্ত বিপণী আপনি তল্লাস করে কলম্বীয় এবং প্রাক্‌ কলম্বীয় স্পেনের তথা হিস্পানিওয়ালার শিল্পবস্তু, ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি একত্র করে ৬০০ বছর আগের জীবনকে

প্রাণবন্ত করে তোলার এ নিদর্শন অতুলনীয়। প্যারিসের ম্যুজিয়ম অব ম্যানও (গ্রুকাদেরো) হার মানে। এমন কলম্বীয় ম্যুজিয়ম যে কোনো দেশের শ্লাঘার বস্তু। ...আমাদের দেশে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরখানা নিয়মানুবর্তিক 'গোঁসাই'-ঘর হয়ে উঠেছে। বড্ড বেশী 'পুজো' চেপেছে প্রাণময় ঘরখানায়। তেমনি সবরমতীর আশ্রম; নেতাজীর ঘর এবং সর্বাধিক পরিতাপের বিষয় উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের ঘর কখানা। ...যখন যখনই আমি বিদেশে বিদেশে এই সব যতন-শিল্প দেখি, কিছুতেই মনে না করে পারি না অস্মদ্দেশীয় যতন-যাতনার নবদ্বীপী এবং বৃন্দাবন সংস্করণ (শংকরণ??)।

পোস্টাফিসের অপর দিকে দীগো কলম্বাস থাকতেন দি হাউস অব দ্য কর্দ-এ। ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে আল্‌কাজার তখন নির্মায়মান। নতুন পৃথিবীতে এতো পুরোনো ইমারৎ আর নেই। হঠাৎ কী করে যেন এটা বেঁচে গেছিলো ড্রেক, আগুন এবং হ্যারিকেন সত্ত্বেও। ড্রেক যখন ব্লকের পর ব্লক বাড়ি পোড়াচ্ছেন আর দাম হাঁকছেন, নিষ্কৃতি চাও —রূপী লও!—তখন বিভ্রান্ত, আর্তজনেরা তাদের যথাসর্বস্ব উজার করে দিয়েছিলো ড্রেকের পায়ে এই বাড়িখানাতেই।

ফেরার সময় এলো। এজামা নদীর তীরে বড়ো বাজার। নদীর পাড় উঁচু, তাই বাজারটা উঁচু জমিতে। বাজারের ওপারে সোজা এসে নাও লাগে। দেশের তরি-তরকারী, মাছ, ফল বাজারে এসে ওঠে। বাজার ভর্তি নানাবিধ ফল। খুব ফল কিনলাম। আত্রেয়ী এবং গোরা কিনলো লোভ জাগানো বেতের টুপী। বাজার ভরতি বেত, বাঁশ, শরকাঠি, সোরেলের দড়ির বোনা-কাজ। ঝুড়ি, টুপী, চ্যাটাই, আলনা, বাক্স, আলমারি, চেয়ার। চমৎকার শিল্প-সঙ্গত কাজ।

আমরা শুধু বিদেশী নই। মহা-বিদেশী। পোশাকে আশাকে নবতা। এশিয়ার গন্ধে মো-মো। যাবতীয় দোকানীরা, বিশেষত মেয়েরা আমাদের দেখে। ছাড়া পাওয়া শিম্পাঞ্জি কিংবা একেবারেই আদিবাসীদের আমরা যেমন উন্নাসিক-প্রমোদে দেখি।

ব্যাপারটা আমরা সবাই উপভোগ করছি।

লীলার তো গা-হাত-পা টিপে-টিপে দেখছে যে এটা চলন্ত বোঁচকা, না পা-অবধি ঝোলানো ঢাকা-ঢুকো কাপড়ের মধ্যে কোনো সলিড মালও আছে। কিন্তু ওর বড়ো বড়ো চকচকে চোখ, ওর মুখের বিহ্বল হাসি আর ওর কপালের ঝকঝকে সিঁদুরে ফোঁটার আলোর সম্মুখে ওদের টর্চ জ্বলানো দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

রেলিং ঘেরা একটা গাছের গুঁড়ি। নামার পথে। নদীর তীরে। "কোলাম্বাস সীবা"—শিমুল গাছের গুঁড়িটাই আছে শুধু। এই গুঁড়িটায় কলম্বাস তাঁর জাহাজখানা বেঁধেছিলেন! গাছ ভেঙে গেছে ঝড়ে। গুঁড়িটা রয়ে গেছে। (অক্ষয় বট!.. অক্ষয় শিমুল!...কেবল ঠুঁটো গুঁড়ির পুজো করেই তৃপ্তি! আত্মানন্দ, না আত্মম্ভরানন্দ?)

ফলের গাদি নিয়ে মহোৎসাহে ফিরি। টি-৯৩৮৮-কে দিতে হবে তিন ডলার! ঠিক করেছি দেবো পাঁচ। খুশী হয়েছি। তখনও ওদেশের মুদ্রা চার-পাঁচ আরো ছিলো। খরচ করে ফেলার জন্যই বেশী করেই ফল কিনলাম।

...কিন্তু জাহাজঘাটায় নেমে ফ্যাসাদ!

পাঁচ ডলার পেয়ে টি-৯৩৮৮ তো মহা খাপ্পা! এবং বহুত কিছু বলতে লাগলো। আমিও চোখ কপালে করে বলি—আমার মার্জিত বাংলা। হে মদীয় পুত্রের চতুষ্পদনুলো মাতুল! বললে তিন (আঙুল দেখাচ্ছি); দিলেম পাঁচ (এক হাতের সব আঙুল); তবু হলো না? সবার যাহে তৃপ্তি হলো, তোমার তাহে হলো না?

সে কখন 'তিন ডলার' বলতে গিয়ে স্পানিশে 'প্রতি-ঘণ্টা' জুড়েছে কে জানে! আমার ন'ডলার দিতে আপত্তি নেই। কিন্তু সব যে শেষ করে দিলুম 'ফলায় স্বাহা' বলে। আমি বলি, আচ্ছা জাহাজে যাই; টাকা এনে দিই!

আমাদের অপরূপ দেখে ব্রুহিলো-দুনিয়ার পুণ্যাত্মারা বিশ্বাস করবে কেন? হাত থেকে ছিনিয়ে কেড়ে নিলো ক্যামেরাটা।

আমিও ভাবি ক্যামেরা রেখে জাহাজে উঠি, আর ইতোমধ্যে ও পালাক আর কি!

এদিকে জাহাজের ঘণ্টা বেজেছে। জাহাজ পুলিস এবং ডাঙা পুলিসের নাকস্য অগ্রে এ কুরুক্ষেত্র চলছে। আমি তখন গোরাকে জমা রাখি। এবং সপরিবার এবং স-ক্যামেরা জাহাজে ঢুকি।

গোরা ভাবলো, ক্যা বাৎ রে!

গোরার মা ভাবলেন, ক্যা বাপ রে!

ক্যামেরা দামী হলো একমাত্র পুত্রের চেয়ে?

হঠাৎ ভাবাবেগ এমনিই করে।

গোরাকে নিয়ে ব্রুহিলো-তনয় ভাগবে না। এবং না নিয়ে জাহাজও ছাড়বে না।... ক্যামেরার জন্য জাহাজ দাঁড়াতো না ধ্রুব।

গোরা আজও সে কথা মনে করলে বলে—"জীবনের চরমতম মুহূর্ত। বাবা ছেড়ে গেলেন এক ক্যামেরার পরিবর্তে। মা বাবার পিছু পিছু অদৃশ্য। জাহাজের সিঁড়ি উঠে যাচ্ছে। হাত ধরে যে সখা দাঁড়িয়ে সে তার মাতৃভাষায় চেঁচাচ্ছে। এবম্বিধ ব্যবস্থা 'মানুষে' করতে পারে—দেখে ভেবে পুলিস এবং নাবিক মহল ট্যারা! হৃদয়হীন, মমতাহীন ঐ বাবা-মায়ের জন্যই আমার নিরাশ্রয় মন অভিমানে উথলে উঠছে—সে এক বিষম সময়। মনে করতেও চাই না।..."

কিন্তু টাকা দিলাম। পুলিস টাকা নিয়ে গোরাকে ছাড়িয়ে এনে দিলো।

সান্দোমিঙ্গো থেকে কিছু কিছু যাত্রী উঠেছিলো। তার মধ্যে একটি বছর চব্বিশের সাইরীয়ন যুবা; বিবাহ করেছে এক জর্মন কন্যাকে। কন্যাটি তো ফ্লার্টের চূড়ান্ত। তিন তুড়িতে এশিয়ান যুবককে এক পাশে সরিয়ে সরাসরি যে কোনো য়োরোপীয়ানের সঙ্গে হাবুডুবু থৈ থৈ।

যুবাটি ফ্লার্ট নয়। যুবারা ফ্লার্ট হয় না, ফ্ল্যাট্ হয়। ইলায়াস কিন্তু কথা বলার জন্য আঁকুপাঁকু ..

...তারপর যখন কথা বলতে থাকলো সে অনর্গল।

আমি বললাম: এতো কথা তো বলছো;—অথচ এ দুদিন যে একেবারে অবাক, হতবাক! তোমার ঘরনীও তো অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে উচ্ছল।

···বহুকাল কথা বলতে পারেনি ইলায়েস মাইকেল লামা। বেথ্‌লেহেম-এর বাসিন্দা। (ওর হাতের লেখা—আমার ডায়েরীতে—BETHLEHEM.) H. K. of Jordan—H. K. মানে Head Quarter—Q-কে K করা ওর আরব এবং স্প্যানিশ ভাষায় ঠোকর লাগার ফল। মনে মনে ভাবি Israel-এর সঙ্গে Jordan-এর লড়াইও এই ঠোকর নিয়েই।

রাফায়েল লিওনিদাস ত্রুহিলোর দেশে ইলায়েস অনুবাদক হয়ে গিয়েছিলো। তারপর ক্রমাগত অফিসে অফিসে ঘুরেছে। কোথাও বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি। "ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কোথাও স্থায়ী না করাই ত্রুহিলোর পলিসী!" কট্টর জবর ডিক্টেটর।···চার্চ এবং স্টেট দুটোরই সর্বেসর্বা। তারই কাছে শুনি বিদ্রোহ ধোঁয়াচ্ছে। দেশ থেকে ওরা পুরুষকে পাসপোর্ট দেয়। মেয়েকে দেয় না। শাদার মেয়েকে দেয়। পুরুষ গেলে লেবার-দুর্ঘটনা কমবে। Coloured মেয়ে গেলে শাদার সংখ্যা বাড়বে। একটা শাদা মেয়ে চলে যাওয়া মানে এক ঝাঁক শাদা ভবিষ্যৎ চলে যাওয়া···অনেক ভেবেচিন্তে 'রেস্‌-তত্ত্ব ছড়িয়েছিলো হিটলার; সুখপ্রসবিনীদের পুরস্কৃত করেছিলো মুসোলিনী; স্প্যানিশ পাসপোর্ট সম্বন্ধে ছুৎ্‌চিবাঈগ্রস্ত ফ্রাঙ্কো! ত্রুহিলো মানে হিটলার, মুসোলিনী, ফ্রাঙ্কোর সমন্বয়···

"···বলবো-না-কেন? মাসে একশো পঞ্চাশ ডলার মাইনে, খাতায় উঠলো। দেশের স্টাণ্ডার্ড অব লিভিং দারুণ। কিন্তু হোটেল খরচ বাবদ মাসে ৫ ডলার যাবে। বেশীর ভাগ হোটেল ত্রুহিলোর। বিদেশীর পাসপোর্ট নিয়ে যারা আছে তারা বিশেষ বিশেষ হোটেলে থাকে। শ্রমিক? হপ্তায় বারো ডলার—দৈনিক বারো ঘণ্টা কাজ। এবং বার্ষিক ন্যূনতম দেয় ট্যাক্স সাত ডলার! বিনা ট্যাক্সে কেউ নেই···হবে! বিদ্রোহ হবে···বৌ? হ্যাঁ বৌ!! কিন্তু বার হতে পারছিলাম না। জর্মন মেয়েটাকে বিয়ে করার ফলে বেরুতে পারি।...বিদেশীরা ওখানে থাকে, চায় না। জীরা জর্মন মেয়ে! কিন্তু ঐ রকম! এখন অবশ্য চঞ্চল দেখছেন! কতোকাল পরে ও মন খুলে মিশতে পারছে। নৈলে গোপনে গোপনে ফোটো, টেপ রেকর্ডিং-এ তো ত্রুহিলো-মলিনার রাজত্বে চলতোই।...না, না, জীরা আমার মনোহারিণী। কোনোমতে ও ইতালী পেঁাছেই জর্মনীতে যাবে। তারপর ও ওর পথে···আমি আমার। আমাদের কাজ হাসিল দেখবেন···এক বছর লাগবে না। এক বছর লাগবে না। আমরা খেটেছি···"

Wolfgang Heck, Hassen, West Germany-র লোক। সেও তখন সান্দোমিঙ্গো থেকে পলায়মান।

এর ঠিক এক বছরের মাথায়ই সান্দোমিঙ্গোতে বিপ্লব। ত্রুহিলো নিধন। আমেরিকানরা পথে পথে সঙ্গীন নিয়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীন সান্দোমিঙ্গোতে আমেরিকান সম্পত্তি ব্যবসায় ও নাগরিকদের রক্ষা করতে লাগলো।

ক্লাইভও ব্রিটিশ সম্পত্তি রক্ষার জন্যই পলাশীতে সিরাজের সর্বনাশ করেছিলো।

ক্যুরাসাও

কোথাও কোনো একটা গোল হয়েছিলো।

ত্রিনিদাদে যখন জাহাজে চড়লুম চক্ষু ছানাবড়া।

আমি খোলের গর্ভে, চতুর্থ তালার যে ঘরটা পেলুম তা ৯ ফুট × ৭ ফুট। একটা একটা দ্যালে দুটো করে বাঙ্ক।

আমি প্রমাদ গণি।

একেবারে ঠিক করে ফেলি ও ঘরে থাকবো না। যা করে ডেক।

ডেকও যেন কপালে সয় না। রাতে ১১টার পর ডেকে শোয়া নিষেধ। নীচের তালার মাল নীচের তলায়। আমি ডেকের এক কোণে মাস্তুলের তলায় আমার কম্বলখানা পেতে খাটো হয়ে শুয়েছি।

প্রথম রাতে আমাকে ডাকতেই আমি 'দুঃখিত' বলে আসন গুটিয়ে বসে রইলুম। আবার খালাসীটা ফিরে এসে বললো, "নীচে যান; শোবেন না? আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত করলুম।"

আমি বলি—ইতালিয়নরা ইংরিজী শিখলেও কেমন মিষ্টি হয়ে যায়।"

"আপনি ইতালী গেছেন?"

এবং তারপর সে পরম সৌখ্য।

ফলে পরের রাত থেকে সপরিবার ডেকেই শুয়েছি!

গোরারা ঘুমুচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে বইছে। আতু-কে জড়িয়ে নিয়ে লীলাও ঘুমুচ্ছে। সারা ডেকটা খালি। আমি জেগেই বুঝতে পারি জাহাজটা যেন থেমে আছে। ইঞ্জিনের শব্দও নেই।

ব্যাপার কি?

ধড়মড়িয়ে উঠি।

এবং উঠতেই সে এক অপরূপ! তেমন দৃশ্য আগে তো দেখিইনি; কখনো দেখবো বলেও আশা করিনি।

সারি সারি আলো জ্বলছে। দূরে। অথচ দূরে নয়। জাহাজ দাঁড়িয়ে সমুদ্রের মাঝে। তীরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল জল। জলের শব্দ পাচ্ছি। আর কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এবং দূরে যা দেখা যাচ্ছে আলো; আলোর পর আলো: আলোর মালা; অন্ধকারের বুকে আলোর মালা দীপান্বিতা।

প্রথম সেই আমার ক্যুরাসাও-এর সঙ্গে শুকতারার লগ্নে দেখা। 'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে' বসে থাকা যবদ্বীপ নয়। আমার পূর্বপুরুষরা কেউ এখানে

উপনিবেশ স্থাপন করেনি। এটা কৃষ্টির দেশ নয়। শিল্পেরও নয়। খনিজ সম্পত্তির দেশ। কুবেরের দেশ; লক্ষ্মী দেশও নয়। সরস্বতীরও নয়।...হায় লক্ষ্মী এখানে কুবেরের দাসী হয়ে গেছেন। লক্ষ্মী যে মানুষের কপালে শ্রী এবং ঐশ্বর্যের তিলক পরাতে হাত বাড়িয়েছিলেন, সেই মানুষ উল্টে তাকেই ধনের এবং ভূরি-ভোজ্যের দাসী করে দিয়েছে!

ক্যুরাসাও তেলের দেশ—পেট্রল নগরী।

সমগ্র ক্যারাবিয়ানে এতো বিরাট অয়েল রিফাইনারি নেই। আজও তা ক্রমবর্ধমান।

কৃষ্টির দেশ নয়; বৃষ্টিরও নয়।

এডেনের মতো ক্যুরাসাওয়েরও প্রধান সমস্যা এবং চিরকালের সমস্যা—জল।

Water water all around

Nor any drop to drink!

A B C islands! Dutch Antilles!!

ওলোন্দাজদের পাশ্চাত্য-সাম্রাজ্যের তিনটি স্বর্গ—**A = Aruba**; এবং **B = Bonaire** এবং **C = Curacao.**

এ্যরুবা, বোনেয়ে এবং ক্যুরাসাও! উত্তর ক্যারাবিয়ানে আছে সাঁ-মার্তিনের অংশ; ইয়ুস্তাশিয়ুস্ এবং সাবা। ৭০-প এবং ১০-উ অক্ষাংশের উত্তর পশ্চিম কোণটুকু জুড়ে গালফ্ তবে ভেনেজুয়েলারই একটা অংশ ঢুকে গেছে ভেতরে। মারাকাইবো শহরটা: ইস্তানবুলের মতো একটা সরু প্রণালীর ওপর। তার দক্ষিণে মারাকাইবো হ্রদ। হ্রদটা সমুদ্রের জল, সরু একটা প্রণালীর মধ্য দিয়ে ঢুকে এসেছে ভেনেজুয়েলার পেটের ভেতরে। ৭৫ মাইল × ১১৫ মাইল বিস্তীর্ণ ম্যারাকাইবো হ্রদটা তেলে ভর্তি। হ্রদের ধারে ধারে তেলের খনি। হ্রদের মধ্যে চোঙ চালিয়ে তেল বার করা হয়। ফলে ভেনেজুয়েলার এতো তেল যে তাকে রিফাইন করা দায়। ভালো বন্দর কাছাকাছি নেই বলে এই তেল রপ্তানির বড় অসুবিধা। তেলবাহী জাহাজের বিশেষ গড়নের জন্য উত্তম বন্দরগাহ্ না থাকলে চলে না। কাজেই,—ম্যারাকাইবো হ্রদের এবং প্রায় বে-অব-ভেনেজুয়েলার মুখ-জুড়েই আছে এই দ্বীপ ক'টি। আরুবা, বোনেয়ে, ক্যুরাসাও দ্বীপগুলোর সুন্দর বন্দর। উইলহেলম্স্টাড্ চমৎকার বন্দর। বিশেষত ডাচেদের ডাইক-বাঁধার কৃতিত্বের ফলে ক্যুরাসাওয়ের প্রধানা নগরী (একমাত্র নগরীই) উইলহেলম্স্টাড একখানা ছবির মতো শহর। যেন অতিকায় ছোটো ছেলেরা রঙীন কার্ড আর রাংতা দিয়ে গড়ে তুলেছে রংদার একটা শহর। তাতে না আছে মনুষ্য বসতির নোংরামি; জীবনায়নের পদচিহ্ন, সংসারের অবশ্য আঙ্গিক হিসেবে নোংরামি, ছিন্নভিন্নতা;—না আছে কৃষ্টি, ইতিহাস, প্রাচীনতার এতোটুকু ছাপ। আনকোরা নতুন পৃথিবী, নতুন শহর। রং, রং আর রং। রগরগে নীল জল, সমুদ্রের জল খাঁড়ি কেটে দ্বীপের এপার ওপার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারই মধ্যে পৃথিবীর বড়ো বড়ো জাহাজ আশ্রয় নিচ্ছে। এধার দিয়ে ঢুকছে, অন্য ধার দিয়ে বার হচ্ছে।

রগরগে নীল জল, খাঁড়ি কেটে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; মস্ত পুল। তার পাশে

নন্দন কাননের মতো বিশাল কলেবর পরমরমণীয় হোটেল। জু; মুজিয়াম, পার্ক! সেই নীলের বুকে শাদা ঝকঝকে পুল বাঁধা। পুল কেটে যায়; সরে যায়; জাহাজ বেরিয়ে যায়। পুলের এপাশ-ওপাশ হাতের তেলোর মতো পরিচ্ছন্ন, নেপোলিয়নের কপালের মতো চওড়া পথ। পথের ধারে ধারে হলুদ, লাল, নীল প্রাইমারি রংয়ের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঝলসায় সারি সারি ডাচ্-বাড়ি। বাগানে বাগানে রংদার সূর্যমুখী, আরও রংদার জবা-করবী। পৈনসেটিয়ার পাখা ছড়ানো রগরগা খরতরো লাল। তিতুর চেয়ে বড়ো বড়ো পোয়টুলাকার রগরগে রং।

আমরা ভোর ভোর সকালে একটু আধটু চা-পান পর্ব সেরে বেরুলাম। ক্যুরাসাও দ্বীপ। ছোটো দ্বীপ। তার শহর উইলহেলমস্টাড্—ডাচ্ এণ্টিলিসের প্রধানা নারী। বেশী বড়ো নয়। কাজেই বললুম কী হবে ট্যাক্সিতে? হেঁটে চলো সব।

ট্যাক্সির পথ পাহাড় ঘুরে। পাহাড়ের গায়ে পৈতের মতো পথ। দেখেই বুঝতে পারি পাগদণ্ডীটা টুক করে ঝাঁপিয়ে পড়বে শহরের বুকে। ঐ পাগদণ্ডীর পথেই পড়বে খানদানী মজদুরদের পাড়া। ঐ পাড়াতেই প্রাণ। যান-বাহনের পথে জাঁক আছে; উঁচু নাক আছে; প্রাণের ঝাঁক নেই।

বলেইছি তো জলহীন দেশ এটা। বৃষ্টি কালেভাদ্র হয়। লোকে মনে করে বলে "সেই সেবারে যখন বৃষ্টি হয়েছিলো..." পথঘাট রুক্ষ, শুকনো। বাড়ির কার্নিশ, জানলার শার্শী-গরাদ, বাড়ির ছাদ সবই ধুলোয় ধুসর।

সমস্যা আছে!

পরপর বাড়িগুলো ঘুমুচ্ছে যেন। যেন জন-মনিষ্যি নেই। ঠিক যেমন সেকালে নয়াদিল্লীর কোয়ার্টার্স-পাড়াগুলোর অবস্থা ছিলো এগারোটা বেলায়। বাবুরা সব কেরানীখানায়। পুলিসে-চোখ রাখে যাতে 'হকার'রা না বিরক্ত করে 'যক্ষপুরীর' মুতকল্পতা। বোঝা যায়, এদের বাবুরাও সব তেলে-ক্ষেতে তেল-চাষের ঘানি টানতে গেছে।...এ তেল এদের নয়। ১০০%ই 'শেল' কোম্পানীর। কবে কোন্ যুগে লণ্ডনে ছিলো এক 'জ্যু'-ব্যবসায়ী। কড়ি শামুক রঙ্গীন শঙ্খ দিয়ে ঘর সাজানোর দস্তুর ছিলো এডোয়ার্ডিয়ন যুগে। সেই 'জ্যু' লণ্ডনে 'শেল' আমদানী করতেন সুদূর পূর্ব সমুদ্র থেকে—ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ থেকে। ইতোমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিজে তেল আবিষ্কৃত হয়। সেই নোংরা তেল পিপেয় করে চালান আসে বটারড্যামে,—আমস্টার্ড্যামে। জ্যু-মহোদয় শূন্য পিপে চালান দিতেন লণ্ডন থেকে বাতাভিয়ায়; এবং আমদানী করতেন বাতাভিয়া থেকে Shells। তাঁর কোম্পানীর নামই ছিলো SHELL; এবং শেলের, অর্থাৎ ঝিনুকের ছাপই ছিলো কোম্পানীর তকমা।...পরে জ্যু সেই ব্যবসায়ের দৌলতে, মানে পিপে সাপ্লাই ব্যবসার দৌলতে ডাচ-কোম্পানীর তেলের শেয়ার কেনেন। ইংরেজে ডাচে মিলে তেল কোম্পানী হলো; কিন্তু সেই SHELL তকমা রয়েই গেলো। আজ তাই থেকে বর্মা-শেল, শেল—সারা পৃথিবীব্যাপী ডাচ-ইংরেজ ব্যবসায়—তেলের ব্যবসায়।

ত্রিনিদাদে Shell কোম্পানী আছে; ডাচেদের ক্যুরাসাওয়ে শেল কোম্পানী আছে। এই সিদনে ছোট্টো দ্বীপ বোনেয়েতে, বোনেয়ের আশে-পাশে সমুদ্রে তেল আবিষ্কৃত

হলো। ব্যস্‌; বোনেয়ের তেলে শেল কোম্পানী লাল হয়ে গেলো। ক্যুরাসাওতে যে অয়েল রিফাইনারী আছে গোটা ক্যারিবিয়ানে সেটাই আজও সেরার সেরা। ম্যারাকাইবো হ্রদের তেল এবং বোনেয়ের তেল মিলে এতো বেশি যে ক্যুরারাও, বোনেয়ে, আরুবা —এই তিনটে অতি দরিদ্র, নচ্ছার শুকনো দ্বীপ আজ মানুষের ভীড়ে থমথম, গমগম।

পৃথিবীতে এই একটি দ্বীপই আছে যেখানে মানুষ জাহাজে করে জলের চালান আনিয়ে তবে বসবাস করে।

সহজ উপায়। রিফাইনারি থেকে তেল নিতে যে সব জাহাজ আসে তারা জলে ভর্তি হয়ে আসে, তেলে ভর্তি হয়ে ফেরে।

এটা অবশ্য পানীয় জলের বেলাতেই। ক্যুরাসাও নগরাধীশের নগরপালিকার এতো সমৃদ্ধি যে সমুদ্রের জল রিফাইন করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহ করেন, বাসন ধোয়া, চান করা থেকে নিয়ে, যাবতীয় গৃহকর্ম এবং কৃষির জন্যও। কেবল মনুষ্য পানীয় জলটি বাইরের। ক্যুরাসাওতে জলের খরচ বিদ্যুৎ বা গ্যাসের চেয়ে আটগুণ বেশী।

তবু মানুষ বাগান করে। জল মহার্ঘ বলেই বাগান করাটা টাকাত্বের নিদর্শন। যতো সমৃদ্ধ পরিবার ততো তার বাগান!

কিন্তু যে পাড়া দিয়ে চলেছি তার পাঁচিল ছোটো ছোটো। বাড়ির সামনে এক নয় রুক্ষ, নয়তো এক ফালি শুকনো মাটি। সেই রুক্ষ মাটির ব্যর্থতা সত্ত্বেও একটা অপরাজিতা লতা কেরানীপাড়ার বহু প্রসবিনী অঙ্গনার মতো নীরব কৃশ ধৈর্যে একটু একটু করে শীর্ণ আঙুলে আশ্রয় খুঁজে আকাশের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে। করবীর গোলাপী ফুলগুলোর রং তবু দেখা যায়। আজকের ফোটা ফুল বেশী চকচকে; কিন্তু সবুজ পাতাগুলো ধুলোয় ধূসর। এন্তার দেখা যাচ্ছে ক্যাকটাস, কাঁটাগাছ।

পাহাড় থেকে ঢলের মুখে হঠাৎ একটা খোলা দরজার পাশ দিয়ে দেখলুম যেন মোরাদাবাদ কিংবা নাগীনার একখানা ঘর।...ফিরে ওদিকেই যাচ্ছি দেখে ছেলে-মেয়েসহ লীলা থেমে যায়।

আমি শান্তভাবে গিয়ে বলি, "অস্‌-সলাম আলেয়্‌কুম্‌!"

মহিলাটি বেরিয়ে এসে বলেন, আলেয়কুম্‌ অস্‌-সলাম্‌। আপনারা সুরিনামের! ...বী-জীর?...ত্রিনিদাদ?...? ..তবে কোথাকার।"

হেসে বলি গন্ধ শোঁকো। আলিগড়, জুনাগড়, ফতেগড়, মুর্শিদাবাদ, মেটিয়াবুর্জ —যা বলো।

ইন্ডিয়া? হিন্দোস্তান!

বাবা, জল খাবো!

পানী পিয়েগী বেটী!

আতু জল চেয়েছে। ভদ্রমহিলা যেন বর্তে গেলেন।

আমরা জগৎ জুড়ে (মানে সেই ছোট্টো ঘরখানা জুড়ে) বসলুম।

কোথায় নেই ভারত তাই ভাবছি।

নাঃ; এখানে আমরা মাত্র দশ-বারো ঘর। সবাই তো হিন্দু নই। তাই অন্তত

ভারতীয়ই বিয়ে করতে চাই। যে যা ইচ্ছে ধর্ম মানুক। ধর্ম তো আমার, আপনার, যার যা। ধর্ম বদলালে লোকসান নেই।···যে কোনো একটা মানলেই, মেনে চললেই, ঠিক ঠিক মতো, একটাই জায়গায় সবাই পৌঁছুবো। কিন্তু···আসল জাত রক্তে।

রীতিমতো ইউজেনিক্স্ বিধৃত কথা বলছেন মিসেস গুলাবদীন। বড়ো ছেলে ক্যাথলিক ; বিয়ে করেছে হিন্দু মেয়ে ; সে মেয়ে তার পুজোআর্চা করে। আমার ছেলে আপত্তি তো করেই না ; যোগান দেয় পুজোয়।

ওদের ছেলেমেয়ে।

যে যার ইচ্ছে ধর্ম মানবে ! নির্বিকার উত্তর দেন মিসেস গুলাবদীন।

ভালোই, প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্মের মিষ্টতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে, উগ্রতাকে চেপে রেখে।

তাই তো হয়েছে। সকলেই ধর্মালু। কেউ উগ্র সত্যিই নয়। কিন্তু বিয়ে নিয়েও যেমন বিপদ, পুরুত নিয়েও তেমনি।···

আপনারা দুজনেই···

হ্যাঁ, আমরা দুজনেই মুসলমান। কিন্তু বিয়ে করতে গিয়েই আমাদের বিপদ। বাইরের দ্বীপ থেকে বিয়ে করে আনার সঙ্গতি তো সবার নেই। ত্রিনিদাদ, সুরিনামের হিন্দু মেয়ে বরং মানিয়ে নেয়। মুসলমান বা ক্রীশ্চান এলেই গোঁড়ামীতে ভোগে।

হাসি পায়। অজানতে মিসেস গুলাবদীন বলছেন ধর্মে গোঁড়ামী একটা উৎকট ব্যাধি।

···আমরা বেশীর ভাগ জড়ো হয়েছি ছোটো ছোটো দ্বীপ থেকে।

কেন ? মানে সে সব দেশ ছাড়লেন কেন ?

ছাড়তে হয়। গ্রীনেদা, সেণ্ট লুশা, এমন কি জ্যামায়কায় হিন্দোস্তানী পরিবার তো খুব কম। কাজেই ওরা সব একে একে এই সব দিকে চলে আসছে। ডাচ-দ্বীপগুলোর চাকরি, পয়সা, শান্তি সবই ভালো।

একটি ছেলে বই হাতে করে এলো। ও সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়ে। স্কুলে যাবার সময় হয়েছে।

আমি ওর সঙ্গে ডাচ শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতে থাকি ; শ্রীমতী মিসেস গুলাবদীনের সঙ্গে সংসারী কথায় ডুব মারলেন। গোরা এবং আতু বাইরে পথে শ্রীমতী গুলাবদীনের দুই বাচ্চার সঙ্গে খেলা করতে থাকে।

পরোটা আর হালুয়ার সঙ্গে চা না খেয়ে নড়া গেলো না। খেয়েও যে নড়তে বেশ সুবিধা হচ্ছিলো তা নয়। কিন্তু আমাকে তখন যেতেই হবে। পকেটে তহবিল চাই। ব্যাঙ্কে গিয়ে ডলার ভাঙিয়ে গিলডার করতে হবে।

কেনেথ মহমদ্-দীন আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলো ব্যাঙ্কে।—এবং ওকে একটা ছুরি কিনে দিলাম প্রায় জোর করে। মহমদ্-দীন স্কুলে চলে গেলো।

ও জানে না ওর মা আমাকে একটি পুত্রবধু যোগাড় করে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছে।

Brionplein সমুদ্রের খাঁড়ির উত্তর দক্ষিণ ব্যাপী তীর, খাঁড়ির পশ্চিম দিকে। EMMA Bridge-এর পশ্চিম মুখ পার করে Pater Eeuwensweg বড় রাস্তা। তার ওপরে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের সামনে দোকান ভর্তি সামগ্রী, উজ্জ্বল ধনাঢ্যতার নিদর্শন।

Brionplein-এর Brion এখনকার মহাত্মা গান্ধী না হোন, নেলসন তো বটেই। Emma Bridge-এর মুখে মস্ত স্কয়ারের মধ্যে তাঁর ব্রোঞ্জ-মূর্তি।

Pedro Louis Brion ক্যুরাসাও-এর ছেলে। ইংরেজের গলার কাঁটা; জুতোয় মাথা তোলা পেরেক। তেইশ বছর বয়সেই ইংরেজদের (১৮০৫) এমন ঠেঙান ঠেঙিয়েছিলেন, Brion-এর নাম শুনলে নেল্‌সন-ড্রেকের জ্ঞাতিভায়েরা কাঁপতেন। সীমঁ বলিভার যখন ভেনেজুয়েলা এবং কোলাম্বিয়াতে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা মেলে ধরেন তখন এই Brion ছিলেন কলম্বিয়ার নৌ-সেনাপতি। ১৮১৫-তে কলম্বিয়া যখন স্বাধীনতার লড়াই ফতে করলো তখন জয় বলিভারের সঙ্গে লোকে জয় ব্রায়ান্‌ও বললো। এখানে ব্রোঞ্জ মূর্তি! কেন?—কারণ, Brion ক্যুরাসাওয়ের 'ছেলে'। ব্রায়ানের সমাধি আছে ভেনেজুয়েলার রাজধানী ক্যারাক্যাসে। তাও এক গল্প। Brion মারা গেছলেন ক্যুরাসাওতে; তাঁর সমাধিও ছিলো তত্র। কিন্তু ক্যুরাসাওতে যখন ন্যাশন্যাল প্যান্থিয়ঁ হলো, সেই প্যান্থিয়ঁতে সমাহিত করার জন্য ভেনেজুয়েলা সরকার সেই পূত দেহ ভিক্ষা করলেন। তখন তো আর লীগ অব নেশন্‌স বা ইউ. এন. ও. ছিল না। কাজেই সরকারে সরকারে সরাসরি শত্রুতার মতো সরাসরি ভাবও চলতো। দেশের রাজদূতদের কাজকর্ম ছিলো। কারামাত্‌ দেখাবার সুবিধে ছিলো।

...এখনকার কথা হলে মহাব্যাপার হতো। কিন্তু ডাচ সরকার স্বাধীন ভেনেজুয়েলার সেই দাবি মেনে নেন। দেহ সেখানে। ব্রোঞ্জের মূর্তি এখানে।...এরও পরে কথা আছে। স্বয়ং বলিভার স্বীকার করেছেন যে কলম্বিয়ার সুখ সমৃদ্ধির জন্য কলম্বিয়া কখনও ব্রায়ানের ঋণ ভুলবে না। জানি না ভূমণ্ডলে এমন কোনো রাজনৈতিক বীর আছেন কি না যাঁর বিদ্রোহী নেতৃত্ব একইকালে তিন তিনটে দেশকে স্বাধীনতা দিয়েছে।

...মূর্তির কথার সঙ্গে সেরে ফেলা যাক আর এক মূর্তির। ব্রোঞ্জের সেটাও, এবং ক্যুরাসাও-তেই। ক্যারাবিয়ানে এই ক্যুরাসাও একটি দ্বীপ যা কোলাম্বাস আবিষ্কার করেননি; করেছিলেন Alonso de Ojeda (১৪৯৯)। ১৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে ডাচেরা অধিকার করে এ দ্বীপ; স্রেফ খেদিয়ে দিলো তামাম্‌ স্পেনিয়ার্ড, দিশী মাল, এবং দো-আঁশলা ব্যাপার সেই ভেনেজুয়েলাতে। Peter Stuyvesant দোর্দণ্ড রাজ-প্রতিনিধি। সাঁ-মার্তিন বিজয় করতে গিয়ে তিনি একখানা ঠ্যাং খোয়ানোর পরেও কাঠের ঠ্যাং নিয়ে গোটাকয় আরও লড়াই জিতেছিলেন।

ক্যুরাসাও যে তৈল-সমৃদ্ধির মেদে অতিস্থূল, সে তার বাজারে গেলেই মালুম। দুনিয়ার যাবৎ চোখা বাছা বাছা সওগাত এই একটি স্থানে এককাট্টা। হবে না বা কেন? ক্যুরাসাও-কে ফ্রী-পোর্ট হতে দেবার কবুলিয়ত পাট্টা দেওয়া হয়নি বটে। কিন্তু শুল্কের হার নাম করতে শতকরা তিন! কেবল তামাক এবং মদ্য চড়া শুল্কে বিক্রী হয়। পাথুরে, বেলোয়াড়ী, অজন্মা, বৃষ্টিহীন, নাগ-ফণী-মনসা-কাটা বুকে ধরা এই ধূমাবতীটি

সেজে আছেন—যেন কমলা-সিদ্ধবিদ্যা। অপরূপ সুন্দরী। বড়ো বড়ো পথ, বিরাট বিরাট দপ্তর, বিচারালয়, সরকারি অফিস। বিরাট ডাকঘরের সামনে ফেলাও পিয়াৎসা। উইলহেলম্ পুলের ধার দিয়ে De Ruyter Kedde একটা জাঁদরেল রাস্তা।

এক পাশটা কেবল নহর। সেই নহরে সারি সারি বোট—রঙীন বোট। রঙীন-রঙীন পাল। রংদার ক্যানভাসের ছাদ। বোটগুলো গায়ে গা ঠেকিয়ে জলে ভাসছে। প্রথমটায় ভাবা গেছিলো দোকান। কিন্তু যখন তাজা তাজা ফলমূল দেখে এগুলাম তখনই লক্ষ্য হলো, দোকান নয়, নৌকো। নৌকো-দোকান। মাংস, মাছ থেকে নিয়ে তামাম একটি বাজার। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, নতুন বাজারের সবই পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে না কাদার প্যাচ্‌প্যাচ; নোংরা বাঁচানোর দায়, দরদস্তুরীর হাড়িকাঠ, ওজন দেখার হুজ্জতি, পাওয়া যাবে না নোংরামী, হট্টের-গোল, এবং আদি ও অকৃত্রিম বাজারু-গন্ধ!! ঝরঝরে সকাল, ঝকমকে তাজা জিনিস, চকচকে পয়সা ফেলে কিনে ঝলমল্ মন নিয়ে ভারতর করে পথ হাঁটা। ফুর্তির ঠেলায় একটা দোকানে ঢুকে স্রেফ আইসক্রীম খাওয়া গেলো।

এতো শূন্যে জায়গায় এত চমৎকার ফলন! মানুষ! মানুষ!! সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা চিরকল্যাণময়ী, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্নের দেশে তুমি বছরের পর বছর ফতোয়া জারি করছো 'মৈ ভুখা হুঁ!' আর তৈলগর্ভ মহাকালিক ধূমাবতী দেশে দেখেছি থৈ থৈ করছে খাবার। একটুও টিনের বা ফ্রোজন্ ব্যাপার নয়;—স্রেফ তাজা! বসুমতীর বক্ষে আর্জোনো চাষীর স্বপ্ন-সোনা।

সরকার যখন মানুষের হয়, মানুষেরা যখন সরকারের হাড়ের পাশা খেলায় অন্নবস্ত্র-হরণ করে না—তখনই অপরূপের ছোঁয়া লাগে।

Hurenstraat, Breedestraat, Madurostraat ছোট্টো ক্যুরাসাওয়ের চৌরঙ্গী, রাধাবাজার, নিউ-মার্কেট এবং ধর্মতলা স্ট্রীটের মিলিত সংস্করণ। মনু থেকে মহাভারত, তোকিও থেকে তিম্বাক্তো, এয়ার ইণ্ডিয়া মহারাজের কার্পেট থেকে তাজমহল হোটেলের ভরপেট—যা চাও তাই। সব পাওয়া যাবে এখানে। হংকং, এদেন, হামবুর্গ কোথাও দৌড়ুতে হবে না।

...কাজেই আমি, থুড়ি, আমরা দৌড়ে পার। নৈলে পকেট পারাৎ পার হয়ে যায়। দিলদারের দেশে দিলদার হয়ে, পাউণ্ডের দেশে হাউণ্ড হতে হবে; এবং টাকার দেশে যেতে যেতে বেবাক হবে ফাঁকা।

ওরা আবার হেথা অর্ডার দিলেও, হোথা অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে, মাল সরবরাহ করে। প্যাক্ করে উত্তম। এবং শুনলে পেত্যয় করা কঠিন, ঘড়ি-ক্যামেরা-ট্রানজিস্টার থেকে নিয়ে হীরে, সোনা, পশমী-কোট পর্যন্ত একেবারে সঠিক বস্তুটি দিয়ে তবে ছাড়ে।

ক্যুরাসাওয়ের সমৃদ্ধি তেলে। তেলের শহর অন্যধারে। সে যেন আমেরিকার এক ফালি। হাজার দুই আম্রিকী পরিবার। শেলের কারখানায় লোক খাটছে পনেরো থেকে সতেরো হাজার। সে-কালে এখানে শ্রমিক যোগাড় করা দায় ছিলো। সাবা, সাঁ-মার্তিন

থেকে শ্রমিক এলো। কিন্তু মেয়েরা আসেনি। ফলে বিষম সামাজিক পরিস্থিতি। তার কথা পূর্বাহ্নে সারা-অধ্যায়ে নিবেদন করা গেছে। সাবা, সাঁ-মার্তিনে গেলে বুড়ো, গুঁড়ো আর নারীর দল দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ—নেই। তেমনি এই তৈল-পুরীতে তামাম কৃষ্ণপক্ষীয় আকাশে শ্রীমুখ-চন্দ্রের অভাব। শুক্ল-পক্ষীয়েরা সকলেই সস্ত্রীক বাস করেন। আরুবার তেলের কারখানা গেলে মনে হয় যেন কেবল পুরুষের দেশ—কিম্পুরুষবর্ষ। খাস ক্যুরাসাওয়েতে অবশ্য বহু ইহুদীর বাস। সম্প্রতি ইস্রায়েলের উৎপত্তি, নিষ্পত্তি, এবং পতিপত্তির পর কিছু ইহুদী পিতৃভূমিতে চলে গেছেন। তথাপি স্বীকার করতেই হয় যে তামাম দুনিবায় ক্যুরাসাওয়ের মতো ভদ্র আরম্ভ, প্রগতি পরিণতি অল্প উপনিবেশেরই ইতিহাস। ডাচ, ইহুদী এবং দ্বিতীয় চার্লস ও জেমসের নিপীড়ন নিগৃহীত ননকর্ফর্মিস্টরা ক্যুরাসাওয়ের বাণিজ্য-শিল্পসমৃদ্ধির আদি জনক। ক্যুরাসাও এ বিষয়ে ভদ্র ও সুস্থ দেশ। অনেক ব্যাপারে জেনেভার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই গেছিও বহুবার।

তেল দিয়েছে টাকা। নিয়েছে পারিবারিক স্থিতি বোধ। নিয়েছে আকাশের ভাগ। চিমনিতে চিমনিতে ছয়লাপ। দিবারাত্র মশাল জ্বলছেই—জ্বলছেই। নিয়েছে বাতাসের সহজ স্বাভাবিক গুণ—অর্থাৎ গন্ধ !! সে যে কী গন্ধ !! সে যে কী গন্ধ ! উৎকট !! লোকেরা বলে 'যেন রশুনের গন্ধ'! উইলহেলমস্ট্রাটের বাজারু পাব-এ মদ খেতে খেতে রসিকজন বাধা দিয়ে বলে—'টাকার গন্ধ।' বাতাস যখন পুব থেকে পশ্চিমে—শহর বেঁচে যায়। কিন্তু হতভাগা বাতাস যখন বসন্তকালীন মদান্ধতায় পশ্চিম থেকে পুবে বয়—ওঃ, সে এক নরক। বছরে দু-তিন সপ্তাহের মতো এ নরকবাস গ্রাহ্য। তখন বলে—"গন্ধটা গেছে। দুর্গন্ধটাই যা সামান্য বেড়েছে!"

কিন্তু গন্ধ-দুর্গন্ধ তো কথার মারপ্যাঁচ। থৈ থৈ করছে টাকা। গোল্‌ফ্, মোটর লঞ্চ, বাগান, ড্রাইভ ইন্, টুকটুকে লাল ইঁটের বাড়ি তুলতুলে ঘাসের লনের মাথায়; শ্বশুরবাড়ির জেল্লায় ভরা হাসপাতাল; দিগম্বরী-ক্লাব; টপ-লেস্ ক্লাবের বটম-লেস আমোদ-প্রমোদ—একেবারে এমন আমেরিকান যে আমেরিকানরাও এসে প্রিমিটিভ্-তার লজ্জায় অপ্রতিভ হয়! ক্যুরাসাওয়ের দীনতম ব্যক্তির মাসিক আয় ৪৫০ ডলার (১৯৫০) !!

ক্যুরাসাওয়েতে স্ট্রবেরি গোঁজা আইসক্রীম—ক্রীমে ফেলা পীচ এবং চেরি, টসটসে আঙুরের গোছা এবং তুঁত ফল খেতে খেতে মনেও হয় না গরমের দিনে রেল লাইনের পাশে বসে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে ভারতীয় শ্রমিক 'ভুজুয়া'র লাঞ্চ খায়।

ভারতবর্ষেও তেল বেরিয়েছে।

সুড়ঙ্গ পথে তেল-লক্ষ্মী আসছেন; সুড়ঙ্গপথেই তেল-লক্ষ্মী গিয়ে কৃষ্ণ-বাজারে মিশে যাবেন। ভারতবর্ষের বর্তমান ভবিষ্যৎ যে তিমিরে সেই তিমিরে। আকাশ কালো; বাতাস কালো; বাজার কালো; ভাগ্য কালো; ভোটের, পার্লামেন্টের, শাসন-ব্যবস্থার, ব্যবসা-বাণিজ্যের কালোয় ভূষিত হয়ে মুখে কালি মেখে আমরা বাবা ভূতনাথের চেলা বনে ব-ব-বম্ ব-ব-বম্ করেছি, করছি, করবো। জয় রামধুন !!

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত